মনোজ বসু

মনোজ বসু

চীন দেখে এলাম

দ্বিতীয় পর্ব

বেঙ্গল পাবলিশার্স * কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬২
প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড,
কলিকাতা-১৩
প্রচ্ছদপট শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক, প্রচ্ছদপট ও ছবি মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইন্ডার্স

তিন টাকা আট আনা

AMRITA BAZAR PATRIKA (3. 9. 55)

It is not often that you come across a book that can keep you absorbed from the beginning to the end. "Chin Dekhe Elam" by Sri Manoj Basu is one of such rarities. The first volume which was reviewed in these columns has already turned out to be one of our best sellers. The volume under review is a sequel and has everything that should make it equally outstanding. India's contact with China had commenced from a remote past. This contact has been essentially cultural and religious. We have always been interested in the arts, crafts and the philosophies of China. So were the Chinese interested in ours. Indian and Chinese travellers of the ancient times had been great intellectuals who have left their names in history. Unfortunately during the last couple of centuries political involvements in both India and China had obstructed our cultural intercourse. Eventually both the countries, each in its own way, became engaged in a struggle for political emancipation. By this time our memories of each other had become obscure but were not entirely forgotten. Today, after both the countries have established themselves in a position where economics and politics are no longer impediments to cultural contacts, we find an encouraging revival of mutual interest in each other's culture and civilisation. Once again we find intellectuals and leaders of thought visiting each other's territory and exchanging ideas. One of such pilgrims has been Sri Manoj Basu, an eminent literary personality of Bengal today. The present volume is a precious record of this pilgrimage. Sri Basu has eyes to see and he has seen China, not the China of international rivalries, but the China of people's pleasures and happiness, and funs and festivals. He has seen a China seething with nationwide intellectual effort, inspired by the proud heritage of its glorious past. Whatever he has seen he has noted down with meticulous care and

the outcome has been the present volume which is for the reader a rich experience of immense enjoyment. He has portrayed characters with a vividness that is difficult to erase from one's memory, characters so typically Chinese and yet with something universal in them eloquent with familiarity. Not only the people he met where-ever he went but also his fellow pilgrims have provided him with rich material for absorbing anecdotes and sparkling sympathetic humour. In every line you feel the warmth of the author's friendliness. The most attractive element in Manoj Babu's writing is the brilliantly simple informality of his style and in this book he is at his best. As you go through the book you feel as if you are being taken around with him, put in contact with lively men and women and children and being told things that are interesting while no less instructive. You don't read Manoj Basu. You just have him talking to you all the time while you quietly listen to him and laugh and feel immensely amused. By the time you have put the book down you feel like one back from a very interesting and instructive tour during which you have seen places and people, the memories of which you like to cherish and preserve in your heart. By this time you also find that you have learnt more about the country and the people, their history and their culture, their efforts to eradicate economic and social evils than what you might ever hope to learn from volumes of printed matter. This book is an achievement that would enrich the contemporary literature in any language anywhere. Travellers like Huen Tsang and Fa Hien have left invaluable material for historians, rich in literary content. It would hardly be an over statement to say that Sri Manoj Basu's travelogue will provide interesting material for the students of the future while entertaining the readers of today.

১। সম্বর্ধনা

২। সাংহাই সান ইয়াৎ-সেনের বাড়িতে

দ্বিতীয় পর্ব

(২০)

তাজ্জব দেখুন। পিকিন-হোটেলে গান্ধি-জয়ন্তী। রাত আছে তখনো —প্রখর শীত। কলে গরম জল আসে নি। তা হোক—ততক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে থাকলে হবে না। হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ওরই মধ্যে নেয়ে ধুয়ে নিচে ছুটেছি।

গুটিকয়েক মানুষ—আয়োজন নগণ্য। গান্ধিজীর ছোট ছবি—দরিদ্র অর্ধনগ্ন ভারতের কঠিন ত্যাগ আর সুদৃঢ় সংকল্প চিত্রায়িত ঐ নরমূর্তিতে। সত্তর বছরের ক্ষীণদেহ নগ্নপাদ খদ্দরধারী রবিশংকর মহারাজ গোটাচারেক বাক্যে করজোড়ে গান্ধিজীর কাছে প্রেরণা ভিক্ষা করলেন। সাইত্রিশটা দেশের তিন শো আটাত্তর জন প্রতিনিধি ও দর্শক আজ থেকে আমরা একঘরে একটা ছাতের নিচে শান্তি-সম্মেলনে বসব—একশো-ষাট কোটি মানুষের মুখপাত্র হয়ে। তাবৎ ভুবন নিঃশব্দ বাক্যে বুঝি আকুতি জানাচ্ছে—দেখো তোমরা, মানুষের রক্ত আর যেন না ঝরে মাটির উপর, কলঙ্কের পাঁক গায়ে আর মাখতে না হয়!

মিনিট দশেকেই অনুষ্ঠান শেষ। আন্তর্জাতিক বিরাট সম্মেলন—তারই এই অতি-ক্ষুদ্র ভূমিকা। ক্ষুদ্র হলেও সামান্য নয়। নতুন পৃথিবীতে গান্ধিজীর মতো জীবন দিয়ে কে লড়েছেন শান্তির জন্য? ছবির একদিকে চতুর্নারায়ণ মালবীয়—ভূপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব দেওয়ান, ইদানীং পার্লামেন্টের এক কংগ্রেসি মেম্বার। অন্য দিকে গোপালন—ইনিও পার্লামেন্টের মেম্বার, কমিউনিস্ট দলের নেতা। পার্লামেন্টে মুখোমুখি মুখ উঁচিয়ে থাকেন, বাগে পেলে কেউ কাউকে ছাড়েন না। আজকে দেখুন, নিস্তব্ধ পরম শান্ত তাঁরা—অতি-মধুর এক প্রত্যাশা অনুরণিত তাঁদের এবং সকলের মনে মনে।

ঘরে ঘরে শান্তি-সম্মেলনের কাগজপত্র এসে পড়ল—সবুজ ফাইল, সোনালি কপোত-আঁকা চমৎকার পকেট-বই, প্যাড-পেন্সিল, অভ্রের খাপের ভিতর নম্বর-সমন্বিত ডেলিগেট-কার্ড। ছোট-বড় কত সভাসমিতি দেখেছি এর আগে, কিন্তু এর সঙ্গে তুলনা চলে না। আয়োজনের নমুনা দেখে ইতিমধ্যেই মেজাজ

চড়ে উঠছে। নিখিল বিশ্বভুবনের মালিক যেন আমরাই...না, দুষ্ট লোকের চক্রান্ত আর মেনে নেওয়া হবে না, আমরা পৌনে চারশ' বিচারক এজলাসে গিয়ে বসছি এবার, ক'দিন ধরে সাক্ষিসাবুদ নিয়ে রণদৈত্যের নির্বাসন-দণ্ড বিধান করব মর্ত্যলোক থেকে।

বিকাল তিনটায় সম্মেলন শুরু। ইয়ং ও তার চেলাচামুণ্ডারা তাড়িয়ে-তুড়িয়ে সকলকে লনে এনে জড় করেছে। গজরাচ্ছে সারবন্দি বাস—মানুষগুলো উদরস্থ করেই দেবে ছুট। কার্তিককে ভোলেন নি. নিশ্চয়—বিড়-বিড় করে বকতে বকতে সে দ্রুত পাদচারণা করছে গঙ্গাস্নান অন্তে বুড়োমানুষের স্তোত্র পড়তে পড়তে পথ চলার মতো।

ব্যাপার কি হে ?

নম্বরটা রপ্ত করে নিচ্ছি। ডেলিগেট-কার্ড, ধরুন, খোওয়া গেল। নম্বর ঠিক থাকলে তবু অনেকখানি সুরাহা। নইলে যা শোনা যাচ্ছে—সে তো এক সমুদ্রবিশেষ।

কনফারেন্স-হল। পরশু এইখানে সরকারি ভোজ হয়েছিল। ভোল বদলে ফেলেছে একটা দিনের মধ্যে। প্লাটফরমের পিছনে শিল্পী পিকাসোর বিরাট পারাবত, পারাবতের দু-পাশে সাইত্রিশটা দেশের পতাকা—এ সব সেদিন ছিল, আজও আছে। আজকের বাড়তি, প্লাটফরমের উপর তিন-সারি চেয়ার সভাপতি মশায়দের। একটি দু'টি নন, গুনতিতে তেষট্টি হলেন তাঁরা। কোনও দেশ বড় বাদ নেই। পয়লা দিনের কাজকর্মের জন্য পাঁচ জন বাছাই হলেন—সান ইয়াৎ-সেনের বিধবা সুং চিং-লিং, ডক্টর কিচলু, পাকিস্তানের মিঞা ইফতিকারউদ্দিন, জাপানের হিরোসি মিনামি আর কোস্টারিকার এডুয়ার্ডো মোরা ভালভার্দে।

আসন নিলেন সভাপতিরা। টবে সাজানো অজস্র চারা, তারই ফাঁকে ফাঁকে বসেছেন। আর, ফুল—ফুলে ফুলে কি অপরূপ সাজিয়েছে ! হঠাৎ মনে হবে, কুসুমোদ্যানে আরামসে ও'রা জমিয়ে বসে আছেন।

বক্তৃতার জায়গাটা কিছু এগিয়ে। চারটে মাইক এদিকে-ওদিকে। সিকি-খানা শব্দও হারিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। বক্তার ডান দিকে কাচের কুজোয় জল ও গেলাস। দুই কোণে সিনেমেটোগ্রাফ-যন্ত্র উদ্যত—যেন বৃহৎ দুটো কামান পেতে রেখেছে। রঙিন সিনেমা-ছবি তোলার বন্দোবস্ত। সেই কামানের মুখ

মাঝে-মাঝে ঘুরছে আসরের দিকে—দপ করে জোরালো আলোগুলো জ্বলে উঠছে, আমাদের ইতরজনদেরও অর্ধেক হাত ইঞ্চি-দুয়েক মুখ কর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাচ্ছে ছবিতে।

নিচেয় আমাদের আসরেরও একটু বর্ণনা দিই। পরশুর ভোজ-সভার সেই টানা-টানা টেবিল নেই। তার বদলে প্রতি জনের আলাদা চেয়ার-টেবিল। এক এক দেশের মানুষ এক একটা দিকে। ভারতীয় আমরা দলে ভারী সকলের চেয়ে—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে উনষাট। মাঝখানে পাঁচ-ছয়টা সারি নিয়ে আমাদের জায়গা। অশোকচক্র-লাঞ্ছিত পতাকা সাঁটা রয়েছে সেখানে—রোমক হরপে 'ইণ্ডিয়া' লেখা। দলের মধ্যে যত্রতত্র বসে পড়বেন, সে জো নেই—ডেলিগেট-নম্বর ওয়ারি জায়গার ব্যবস্থা। চলাচলের পথ এক দিকে—কার্তিক এবং অন্য এক মহাশয়, দেখলাম, উসখুস করছেন ঐ পথের কিনারে বসবার জন্য; জায়গা বদলাবদলির বিশেষ প্রকার তদ্বির করছেন। ব্যাপার বুঝলেন? ছবি উঠবে ভাল, ফাঁকার মধ্যে ওঁদের আলাদা ভাবে চেনা যাবে। দেশে ফিরে সেই সব ছবি দেখিয়ে জাঁক করবেন, আমরা কি দরের মানুষ বোঝ!

কার্তিক এবং সেই ব্যক্তি—ফোটো তোলার ব্যাপারে আশ্চর্য প্রতিভা ওঁদের। কেমন যেন গন্ধ শুঁকে টের পান, কখন কোন দিকে ক্যামেরার মুখ ঘুরবে। সেখানে ঠিক জেঁকে বসে আছেন। কনফারেন্স-হলের পিছন দিককার মাঠেও বিরাম সময়ে ইনি-উনি ছবি তুলতেন। ছবি তোলবার সময়টা ঠাহর পান নি—কিন্তু ছবি হয়ে গেলে ঠিক দেখতে পাবেন, সকলের মাঝখানে সর্বপ্রধান জায়গা নিয়ে ওঁরা দুটি দাঁড়িয়ে। বিক্রির জন্য এইরকম অনেক ছবি থাকত হোটেলের নিচের তলায়; এ-দোকানে ও-দোকানে পথের ধারেও টাঙিয়ে রাখত। ওঁরা দু-জনে আঙুল দিয়ে দেখাতেন, এই যে আমি,—ঐ যে আমি...। কিচলু দলপতি—কিন্তু সে ভদ্রলোক কোথায় চাপা পড়ে থাকতেন ঐ যুগলের দাপটে।

যাক গে, পয়লা দিনের কথায় আসি আবার। সভাপতি মশায়রা তো জেঁকে বসলেন প্লাটফরমের কুঞ্জবনে। বাজনা বেজে উঠল—কোন অলক্ষ্য লোক থেকে সুগম্ভীর মন্দ্র।. পিছন-দরজা গেল খুলে। উল্লাসের কলধ্বনি—জোয়ারের ঢেউ যেন এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। ফুলের তোড়া দিতে যাচ্ছে তরুণ আর তরুণীরা। চলেছে প্লাটফরমের দিকে। স্বাস্থ্য আর হাসিতে ঝলমল, সেই হাস্যোল্লাস ছিটকে দিয়ে যাচ্ছে গতির বীর্যভঙ্গিমায়। চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। উঠল প্লাটফরমের উপর—এক এক জনে তোড়া দিল এক এক সভাপতিকে। তারপরে সেকহ্যান্ড। আরে আরে—কি কান্ড, কোণের ঐ টাকমাথা প্রবীণ

মানুষটি আনন্দ-আবেগে আলিঙ্গন করছেন তাঁর নাতনির বয়সি মেয়েটাকে। অজানা অচেনা কত সমুদ্রের পারবর্তী বুড়ো থুত্থুড়ে এক জন আর নতুন কালের ওই আনকোরা আধুনিকা—এতগুলো মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু বিকার নেই কারো মনে। কেউ মুখ বাঁকাচ্ছে না। ও-সব হল অন্ধকার কোণ-চরদের রীতি—এই আলোর প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মনের ঘৃণ্য বীভৎস কীটগুলো। তারপরে হাততালি—ঘর ফেটে যায় বুঝি বা! সভাপতি মশায়রা সবাই তো বয়স্ক মানুষ—তাঁরা ঘেমে যাচ্ছেন, বুঝতে পারছি, আনন্দোন্মাদ জোয়ান ছেলে-মেয়েগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—এমনিতরো অবস্থা। করুণ চোখে ওদের দিকে চেয়ে কোন গতিকে তাল ঠেকিয়ে যাচ্ছেন। হাততালি বন্ধ হল শেষ পর্যন্ত; নাচুনে ছেলে-মেয়েগুলো নেমে চলেছে লড়াইয়ের ঘোড়ার মতো। পথের পাশের লোকের সঙ্গে সেকহ্যান্ড করে যাচ্ছে তীরগতিতে—সেকেন্ডে খান পাঁচ-সাত হাতের সঙ্গে। অদৃশ্য হয়ে গেল বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো। বাজনা বন্ধ।

কাজ শুরু এবারে। চুপ করুন। কলম-পেন্সিল বাগিয়ে বসেছি। অধোদেশে আমাদের চিত্রটাও আন্দাজ করে নিন একটু। শিবের মাথায় সাপ পেঁচিয়ে থাকে, সেই গোছের এক এক হেডফোন শিরে ধারণ করে আছি। টেবিলের গায়ে সুইচ-বোর্ড—আটটা ফুটো বোর্ডে। ইংরেজি, চীনা, রুশীয়, স্প্যানিশ এবং বক্তৃতার মূলভাষা—তা ছাড়া আর তিনটে ফাউ। ঐ চারটে ভাষার একটা অন্তত আপনি জানেন; তবে আর কোনই অসুবিধে নেই। বক্তা বক্তৃতা করে যাচ্ছেন, চোখের সামনে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছেন—আর যে ভাষা আপনার পছন্দ, সেই ছিদ্রে প্ল্যাগ ঢুকিয়ে মহানন্দে কথা শুনে যান। আদি-অকৃত্রিম বক্তৃতা শুনবেন তো তারও ব্যবস্থা রয়েছে—ঐ মূলভাষার ছিদ্র। এই-গুলো ছাড়া অন্য ভাষায় যদি প্রচার-ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তারই জন্য বাড়তি ফুটো তিনটে। আপাতত নিঃশব্দ এগুলো।

কায়দাটা বুঝলেন? যা মুখে এলো, এলোপাতাড়ি বলে যাওয়া নয়—আগে থেকে তৈরি-করা প্রত্যেকটি বক্তৃতা। একটা কপি পূর্বাহ্ণে জমা দিতে হয়। ওঁরা চারটে ভাষায় তার অনুবাদ করে রেখেছেন—মূল বক্তৃতার সঙ্গে একই সময়ে একই তালে ছাড়ছেন। নিখুঁৎ ব্যবস্থা—ধরা মুশকিল বক্তার আসল ভাষা কোনটা।

শ্রোতৃবর্গ পরম গম্ভীর—ব্যস্তসমস্ত হয়ে টোকাটুকি করছেন। কি অত টোকেন, আমি কিন্তু ভেবে পাইনে। বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলছে; টেবিলের উপর

টাইপ-করা পুরো বক্তৃতার কপি এসে যাচ্ছে অনতিপরেই। পরের দিন দশটা না বাজতেই বক্তা ও অনুষ্ঠানের রকমারি ছবি সহ ইংরেজি, রুশীয়, স্প্যানিশ ও চীনা—চারটে ভাষায় পরিচ্ছন্ন সচিত্র মুদ্রণে তাবৎ বৃত্তান্ত ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে। সমস্ত দায় ও'রাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আমাদের কাজ তো দেখছি—পা ছড়িয়ে বসে বসে বক্তৃতা শোনা, বিরাম-সময়ে ঘুরে ঘুরে আলাপ জমানো আর যথাভীষ্ট পানাহারে ও'দের অনুগৃহীত করা।

টুকে যাচ্ছি আমিও বটে! বক্তৃতার এক বর্ণ নয়—চতুর্দিকে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি। টুকে রেখেছিলাম, তাই তো প্রাণ খুলে বলতে পারছি। জুত মতো টেবিল-চেয়ার পেয়ে ভারি সুবিধা হয়েছে। স্মৃতি হাতড়ে যে লেখা বেরোয়, জীবনের উত্তাপ পাওয়া যায় না তার মধ্যে। শুকনো বিবরণের বাণ্ডিল—প্রাতঃকালের সংবাদপত্র। সবজান্তা হওয়া যায়, কিন্তু মনের মধ্যে ঢেউ তোলে না। যাক গে, যাক গে—কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল ঐ যে!

পয়লা বক্তৃতা সুং-চিং-লিঙের। ডক্টর সান-ইয়াৎ-সেনের ছবি তো যত্রতত্র, ছবির মুখে কথা পাইনে—কথার সুধা আর কথার আগুন এই শুনতে পাচ্ছি তাঁর স্ত্রীর মুখে। মাঞ্চু-রাজার গ্রাস থেকে মহাচীনকে ছিনিয়ে এনেছিলেন ও'রাই। সেই থেকে গণরাজার রাজত্ব বহাল। তার পরে চল্লিশ বছর কেটে গেল, কত ছেলেমানুষ বুড়ো হয়ে গেল, মাদামের কিন্তু বয়স বাড়ল না। একটি চুল পাকে নি—মুখে একটি কুঞ্চনরেখা নেই, নব তারুণ্যের ঝলকিত হাসি খেলে বেড়াচ্ছে তথায়। কথা যে ক'টি বললেন—বৈদগ্ধ্যে বিচিত্র নয়, কিন্তু আশায় সমুজ্জ্বল।

'শান্তি যারা চায়, তাদের শক্তি অসীম হয়ে উঠছে দিনকে দিন। হতেই হবে। লড়াই বন্ধ হবে পৃথিবীতে—ঝগড়া-বিবাদের আপোষ-নিষ্পত্তি। মারণাস্ত্র তৈরি আর চলবে না—ওটা মহা অপরাধ বলে ঘোষিত হোক। অবাধ ব্যাপার-বাণিজ্য চলবে সকল দেশের মধ্যে, সাংস্কৃতিক বন্ধনে এক হবে নানান জাতের মানুষ...'

সভা চালাচ্ছেন এখন ডক্টর কিচলু। মাও সে-তুং অভিনন্দন জানিয়েছেন; পড়া হল সেটা। উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে সকলে—কতক্ষণ কেটে গেল, উল্লাস থামবার লক্ষণ দেখিনে। বাণী পাঠিয়েছেন—জোলিও কুরি, ইকুওয়াকা, পাবলো নেরুদা, পল রবসন—এমনি সব জাঁদরেল ব্যক্তিবর্গ।

তার পরে বিরাম। ঘণ্টা দেড়েক ধরে বিস্তর ধকল গেল—খানাপিনা হোক

পিছনদিককার চার-পাঁচটা ঘরে, প্রকাণ্ড উঠানে চরে-ফিরে বেড়ান, আলাপ-পরিচয় গল্প-গুজব করুন। ঘণ্টা বাজলে আবার এসে বসবেন।

ঘণ্টা বাজল। মিঞা ইফতিকারউদ্দিন এবারের সভাপতি। হাসিখুশির মানুষ—কথায় কথায় রঙ্গ-রসিকতা। দুরন্ত প্রাণাবেগ—একটি জায়গায় বসে থাকা বড় শক্ত মানুষটির পক্ষে। কংগ্রেসের সত্যযুগীয় আমলে ইনিও এক চাঁই ছিলেন। তখন নাম শোনা ছিল, পিকিনে এসে কাছাকাছি পরিচয় পেলাম।

বক্তৃতার স্রোত চলল অতঃপর। একের পর এক এসে দাঁড়াচ্ছেন। গেব্রিয়েল-দ্য-অরকুশিয়ের—বিশ্বশান্তি-পরিষদের এক কর্মকর্তা। জাপানের অধ্যাপক হিরোশি মিনামি। আমাদের ডক্টর কিচলু। পাকিস্তানের দলপতি পীর মানকি-শরিফ। ব্রেজিলের আবেল চেরম্‌। ওয়ার্লড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ানস-এর ই. থর্নটন। অস্ট্রেলিয়ার ক্যানন মেনার্ড। বৃটিশ লেবার পার্টির জন বার্নস।

নানা রকম হিতবাক্য, নিজ নিজ দেশের সমস্যা, তাবৎ বিশ্ববাসী সম্পর্কে ক্ষোভ-বেদনা ও প্রত্যাশার বাণী। অধিবেশন শেষ হতে সন্ধ্যা। পয়লা দিন, এর বেশি আর নয়। দশ দিন ধরে চলবে এই রকম—কত কি শুনতে পাবেন, তাড়া কিসের!

বলে কি, অধিবেশন নাকি দশ-দশটা দিন ধরে! এত কথা বলবার আছে, এত ভাবনা ভাববার আছে, এত সংকল্প ঘোষণার রয়েছে? তাই! দশ দিনে শেষ হল বটে, কিন্তু শেষাশেষি প্রতিদিন দুটো-তিনটে করে অধিবেশন চালাতে হয়েছে। শেষ অধিবেশন হল রাত্রি এগারোটা থেকে তিনটে। এর উপরে কমিশনের মীটিং আছে—তন্দ্রায় ঢুলছেন সকলে, রাত কাবার হয়ে যাবার দাখিল, তবু ছাড়ান নেই। বড় কঠিন কাজ—হুকুম-হাকাম দিয়ে সৈনিকদের লড়াইয়ে পাঠানো নয়, লড়াইবাজদের ধূলিশায়ী করা। যাতে আবার উঠে বসে তারা দল জোটাতে না পারে।

(২১)

বাঘা শীত—ভোরে ওঠা অতিশয় কঠিন। কায়ক্লেশে উঠে তবু বেরিয়ে পড়লাম, ঊষালোকে পিকিনের চেহারা দেখব। তামাম শহর ঝকঝক তকতক করে—সে ব্যবস্থা হয়ে যায় মানুষের ঘুম থেকে উঠবার আগে। আগের দিন

গান্ধি-জয়ন্তীতে উঠে ব্যাপারটার আন্দাজ পেয়েছি, তাই আজকে আরও সকাল-সকাল উঠে পড়েছি। ছেলেবেলায় যাত্রার সাজ-ঘরে উঁকি দিতাম—বিড়িখোর ছোঁড়াটা হঠাৎ কি করে রাজকন্যা হয়ে যায়। এ-ও প্রায় তাই। কি করে এত বড় শহর এমন ফিটফাট রাখে?

পথে-পার্কে বিস্তর মানুষ। দস্তুরমতো ভিড় জায়গায় জায়গায়। দোকান-পাট বেলায় খোলে—তার আগে এখন চতুর্দিক পরিমার্জনা হচ্ছে। রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে, জল দিয়ে ধোয়াধুয়ি হচ্ছে, নর্দামার মুখে আরক ঢেলে ঢেলে বীজাণুমুক্ত করছে। ময়লা ফেলার পাত্রগুলো সাফ-সাফাই। নতুন দিনে জেগে উঠে পথে বেরিয়ে সর্বত্র দেখতে পাবেন নির্মল প্রসন্নতা। মানুষগুলোর নাকে-মুখে কাপড়ের পটি, চোখ দুটো শুধু খোলা। বীজাণুরা তাড়া খেয়ে ঐ সব ছিদ্রপথে দেহ-মধ্যে ঢুকে না পড়ে—তারই ব্যবস্থা। এই কাপড়ের পটি খুব চলছে—ফেরিওয়ালারা দু-পয়সা চার পয়সায় বিক্রি করে, লোকে দেদার কেনে আর পরে। যারা বাইরে বাইরে ঘোরে, পরতেই হবে তাদের। রাস্তার ধারে দোকান দিয়ে বসেছে, তারা সব নাক-মুখ ঢেকে কিম্ভুত-কিমাকার হয়ে আছে। ইস্কুলের ছুটির সময়, দেখতে পাচ্ছি, ঐ বস্তুতে নাক-মুখ ঢেকে ছেলে-মেয়েরা সারবন্দি বাড়ি ফিরছে। মোটর-ড্রাইভারের আবার নাক-মুখ ঢাকা শুধু নয়, দু-হাতে দস্তানা—স্টিয়ারিং-চাকার ময়লা যাতে হাতে না লাগে।

নজর কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে দিন। এক সঙ্গে, দেখুন দেখুন, কত মানুষ ব্যায়াম করছে! রেডিওয়, এই এত ভোরে, ব্যায়াম সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিয়ে এখন বাজনা বাজাচ্ছে। আর, এরা সব হাত-পা খেলাচ্ছে সেই বাজনার তালে তালে। এ পার্কে ঐ মাঠে এমন কি ফুটপাথের যেখানটা বেশি রকম চওড়া সেখানেও হয়তো দেখবেন, একই ধরনের শারীর-চর্চা। গ্রামে গ্রামেও নাকি এমনি সময়ে এই ব্যাপার। ছেলে-বুড়ো চাষী-মজুর ছাত্র-মাস্টার সবাই একই সঙ্গে হাত নাড়ে, পা তোলে, ঘাড় বাঁকায়। মানুষে মানুষে অজান্তে এক হয়ে যাচ্ছে—অযুতলক্ষ নরনারী, সকলে তারা এক।

আর ঐ এক মজা আছে—যা-কিছু করবে, তাই নিয়ে এক একটা আন্দোলন। পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে থাকবে—সেই বাবদেও। আন্দোলনের নাম হল, চার সাফাই—পাঁচ মার! সাফাই রাখো খাবার ও রান্নাঘর; সাফাই রাখো গোয়াল ও পায়খানা; সাফাই রাখো কাপড় ও বিছানা; সাফাই রাখো রাস্তা ও ঘরবাড়ি। মারো মাছি; মারো মশা; মারো পোকামাকড়; মারো জোঁক; মারো

ইঁদুর। এ ছাড়া আর যত প্রাণী রোগবীজাণু ছড়ায়, মেরে মেরে তাদের শেষ করে ফেল।

এক এক আন্দোলনের ফুলকি ছেড়ে দেয়, আর দেখতে দেখতে তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। 'মাকড় মারলে ধোকড় হবে—তুমিও যেমন!' অতি-বুদ্ধিমন্তেরা তুড়ি মেরে সমস্ত-কিছু উড়িয়ে দেবার সাহস পায় না। প্রতিটি চেষ্টার দ্রুত সাফল্য দেখে আত্মবিশ্বাস এসে গেছে সকলের মনে। চেষ্টা করলে আলবৎ হবে। যে মতলবটা উঠল, অচিরে তা হাসিল হবেই—তাবৎ লোকজন মরীয়া হয়ে লেগে যায়। এক গ্রামে গিয়েছিলাম—গ্রাম-প্রধান নানা গৌরব-প্রচেষ্টার মধ্যে পরিচয় দিচ্ছেন, কত হাজার মাছি মারা হয়েছে এতাবৎ। এখানে শুধুমাত্র মাছিমারা কেরাণী নয়, মাছিমারা সর্বজন। সরু জালে মাছি মেরে মেরে গোণাগুণতি করে রাখে। বেশি মারতে পারলে মুনাফাও আছে, উত্তম পুরস্কার।

দেহ আপনারই বটে কিন্তু সেটা পরিপাটি করে গড়ে তোলা এবং সুস্থ রাখার পুরোপুরি দায়িত্ব রাষ্ট্রের। মানুষ নিয়েই সব—মানুষকে মজবুত করবার তাই দেশব্যাপ্ত আয়োজন। ডাক্তারকে ফী দিতে হবে না, অষুধের দাম লাগবে না, রোগ-চিকিৎসা মুফতে; সিকি পয়সা সে বাবদে ডাক্তার-নার্সের প্রাপ্তি নেই। তাই রোগ যাতে কারো না হয়, ডাক্তারেরও চেষ্টা—হলে মুনাফা নেই, উপরন্তু হাঙ্গামা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে পুরোপুরি এখনো হয়ে ওঠে নি। নিশ্বাস ফেলে ওরা দুঃখ করছিল—ইচ্ছে আমাদের তাই বটে! কিন্তু ডাক্তার কোথায় পাচ্ছি অত?

তবু যা হয়েছে, তাজ্জব মানি। ১৯৫১ সনে শ্রমিক-বীমা আইন হল। বীমা করতেই হবে সকলকে। খনি ও ফ্যাক্টরিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করে, চিকিৎসা বাবদে তাদের এক পয়সাও লাগছে না বীমার কল্যাণে। ন্যাশনাল মাইনরিটি যত আছে, তাদের বীমার ব্যাপার নেই—তবুও বিনামূল্যে চিকিৎসা। গবর্নমেন্ট তরফের যত লোক—তাদের সম্পর্কেও এই। এই দেখুন, মুখ বাঁকাচ্ছেন আপনারা। সে তো হবেই—সরকারি লোক, তারা আবার পয়সা দিতে যাবে নাকি? তাদেরটা চাই সকলের আগে। আজ্ঞে না, গবর্নমেন্ট মানে জন-সাধারণ থেকে পৃথক্ তকমা-আঁটা রকমারি হিস্যার কর্তৃত্বভোগী এক দাম্ভিক গোষ্ঠী নয়—ঐ রাষ্ট্র-ধারণা মুছে ফেলতে হবে মন থেকে; মস্তিষ্ক ধুয়ে সাফ-সাফাই করতে হবে। এদের রাষ্ট্র গাঁয়ে গাঁয়ে; রাষ্ট্র-শক্তি ছড়িয়ে আছে যাবতীয়

জনসংস্থার মধ্যে। চাষীদের সমিতি আছে; তাদেরও নিখরচায় চিকিৎসা-ব্যবস্থা তাদের সমিতিগুলোর মাধ্যমে।

তবুও বাকি থেকে যায় কতক লোক। তাদের পয়সা খরচ করতে হয়। সেই হেতু নতুন-চীন হা-হুতাশ করে। তিনটে বছরেও সকল মানুষের জন্য ব্যবস্থা হল না—কি হল তবে আর বলুন! অতএব দ্রুত ডাক্তার বানিয়ে তোল ছেলেমেয়েদের, গড়ো ল্যাবরেটারি, চালাও গবেষণা, তৈরি করো রকমারি অষুধপত্তোর।

রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ কিসে না হয়, সেই চেষ্টা। মশামাছির সঙ্গে লড়াই। ডাক্তারের সংখ্যা ছিল অতি কম—শতকরা নব্বুই তার মধ্যে শহরে। গ্রামাঞ্চলে যে দু-দশটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তথায় না ডাক্তার না ওষুধপত্তোর—অব্যবস্থার চরম। আজকের গ্রামগুলো নিজ নিজ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলছে—স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার করে তারা, রোগ-প্রতিষেধ ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা করে।

আগে ছিল, প্রতি তিন বছরে একবার করে কলেরার প্রকোপ। শীতের পর যেমন গ্রীষ্ম, কলেরা তেমনি যথানিয়মে আসবেই। সারা চীনে এখন কলেরা বন্ধ হয়ে গেছে; তিন বছরের মধ্যে কোন লোককে কলেরায় ধরেনি। কখনো কারো কলেরা হবে না—ওরা জোর করে বলে। খাবার জল ফুটিয়ে খায় বারো মাস তিরিশ দিন—অবিরত প্রচারের ফলে কাঁচা জল বিষের সমতুল্য ভাবতে শিখেছে। ময়লা-আবর্জনার সঙ্গে দেশব্যাপী সংগ্রাম-ঘোষণা। তার উপরে নির্বিচারে কলেরা-টাইফয়েডের ইনজেকসন—বিশেষ করে বন্দর জায়গা এবং চীনে ঢুকবার ঘাঁটিগুলোয়। জগৎবেড় জাল পেতে আছে যেন—একটি মানুষ বাইরের রোগ নিয়ে ঢুকে পড়বে, কিছুতে তা হবার জো নেই।

বসন্তের ব্যাপারেও এমনি যুদ্ধং দেহি ভাব। দেশ জুড়ে পায়তারা চলছে। ঠিক করেছে, পাঁচ বছরের মধ্যে মা-শীতলাকে পুরোপুরি এলাকাচ্যুত করবে। পাঁচ বছরের তিনটে পার হয়ে গেছে। আর দুটো বছর।

কি দুরন্ত বেগে স্বাস্থ্যোন্নতি চলেছে! মানুষ কিলবিল করছে—তবু বলে, কেউ মরবে না অকালে, রোগা-ডিগডিগে হয়ে থাকবে না—বাঁচার মতন করে সকলে বাঁচবে। রোগ খেদাও, রোগের জড় মারো, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেড়াক মানুষ। মানুষ বাড়ুক আরও—মানুষ বোঝা নয়, মানুষই লক্ষ্মী।

কাজের মানুষ তৈরি করবে, সেই জন্য আরো বেশি মানুষ চাই। মৃত্যুর হার কমেছে, জন্ম বাড়ছে। বিশেষ করে ন্যাশন্যাল মাইনরিটিদের মধ্যে—দিনে-দিনে যারা নিশ্চিহ্ন হবার দাখিল হয়েছিল।

আমার কি বিপদ হল, শুনুন তবে। ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মুখের কাছে অবিরত খাদ্য এনে ধরে, অভ্যাস বশে খেয়ে যাই। এবম্বিধ খাটনির দরুন পাকযন্ত্র একদা উষ্মা প্রকাশ করল। দেশে-ঘরে এমন একটু-আধটু হামেশাই হয়ে থাকে, আমলে আনিনে। এটা অনেক দূরের দেশ, আর শীতের দেশও বটে। রোগি হয়ে চোখ-কান বুজে শয্যায় পড়ে থাকতে মন্দ লাগে না। অসুখের চেয়ে কু-মতলবই অধিক ছিল (ফাঁস করে দেবেন না কিন্তু)। তারিখটা ৭ই অক্টোবর—পাঁচ দিন তৎপূর্বে কনফারেন্স হয়ে গেছে। পাঁচ পাঁচটা দিন এক-নাগাড় ডজন পাঁচেক বক্তৃতা শুনেছি—তাই ভাবলাম, ভাগ্যবশে শরীর যখন খারাপ লাগছে—সভার ঝামেলা আজকে নয়; চুপিসারে ঘরের মধ্যে লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি।

তাই হতে দেবে নাকি? তক্কে তক্কে ঠিক চলে এসেছে সুইং। মেয়েটার চোখ দুটো চরকির মতো ঘুরে ঘুরে ত্রিভুবন পাহারা দেয়। এখনো ওকে পুলিশের বড় কর্তা কেন বানায় নি, তাই ভাবি।

অসুখ করেছে আপনার?

না হে, এমন-কিছু নয়—

অসময়ে শুয়ে কেন তবে?

মুহূর্তকাল নজর করে দেখে সে বেরিয়ে গেল। হ্যাঙ্গামা চুকল ভেবে আরামে লেপ মুড়ি দিলাম।

ফিরল সুইং অনতি পরেই। হাতিয়ারপত্র সহ ত্রিমূর্তি সঙ্গে। ডাক্তার এবং এক জোড়া নার্স। সে কি কাণ্ড! শোয়ায় বসায় দাঁড় করায়; আধ হাত জিভ বের করে আছি, নিরিখ করে করে দেখে; খুন্তির মতো এক বস্তু গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে টর্চের আলো ফেলে। পেট টিপে দেখে; বুকে নল বসিয়ে দেখে। বিশ মিনিট ধরে নানা রকম প্রক্রিয়ার পর ডাক্তার কায়েমি ভাবে শুইয়ে দিয়ে গেল। পাছে উঠে বসি, একটা নার্স মোতায়েন করে গেল শিয়রে।

তার পর অষুধপত্রের বোঝা এসে পড়ে। কোনটা খাওয়ার, কোনটা শোঁকার। আয়োজন দেখে আঁৎকে উঠি। রোগটা নিশ্চয় শক্ত। সত্যি বলুন, কি হয়েছে আমার?

মধুর হাস্যে নার্স ঘাড় নাড়ে।

কিছু নয়। ঘুমোন দিকি—আচ্ছা এক ঘুম দিন। জেগে উঠে দেখবেন, শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে।

বলেছে ভাল, চোখ বুজে থাকাই নিরাপদ। ডাক্তার এসে আবার যদি পরীক্ষা করতে চায়, সে চোখ কিছুতে আর খুলছি নে।

পাক্কা ছ-ঘণ্টা মড়ার মতো পড়ে থেকে সে যাত্রা রেহাই পেলাম।

আমার তো এই। আর এক অভাজন এসেছেন, তাঁর নাড়িতে সত্যি সত্যি দু-ডিগ্রি জ্বর পাওয়া গেল।

আর যাবে কোথা? মুহুর্মুহু ডাক্তারের আনাগোনা। শিয়রে ছোটখাটো ডিস্পেনসারি। দশ মিনিট অন্তর নাড়ি টিপে চার্টে লিখছে, অষুধ খাওয়াচ্ছে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা চলল এইপ্রকার। ইতিমধ্যে জ্বর ছেড়েছে। তবু রেহাই নেই—শুয়ে পড়ে থাকতে হবে। জ্বর আবার যদি আসে?

সকালবেলা একবার একটু ফাঁক পাওয়া গেছে; নার্স-ডাক্তার কেউ নেই। রোগি অমনি পিটটান দিয়েছেন। খোঁজ খোঁজ—কি সর্বনাশ! এ-ঘর ও-ঘর উপর নিচে—কোনখানে পাত্তা নেই। খোঁজ মিলল অবশেষে সাততলার খানা-ঘরে। এক গণ্ডা আণ্ডার রাক্ষুসে ওমলেট এবং কফির বাটি নিয়ে তিনি টেবিলে বসেছেন।

নাকে খৎ দিচ্ছি মশায়, কদাপি আর রোগে ধরবে না যত দিন এ দেশে আছি। বড় ভয়ে ভয়ে ছিলাম। রোগের চেয়ে বেশি ভয় নার্স-ডাক্তারের।

(২২)

সেক্রেটারিদের একজন খবর দিয়ে গেলেন, দুপুরবেলা জাপানিদের সঙ্গে খানাপিনা। চর্বচোষ্য ঠেসেই যে অমনি ঘরে ঢুকে শয্যা নেবেন, সেটা সভ্য রীতি নয়। অনেকক্ষণ বসে বসে উদ্গার তুলতে হয়। বচনে—এবং কখনো কখনো গানে। ভারতীয় দলের হয়ে আজকে আমি বলব। আর বলবেন উমা-শঙ্কর যোশি। ব্যাপার ঘোরতর—দুই সাহিত্যিক জোড়ে আসরে নামছেন। দেশে থাকতে হিতার্থীরা বিস্তর সদুপদেশ দিয়েছিলেন, রা কাড়বে না মোটে ও-সব জায়গায়—চোখ মেলে শুধু দেখে আসবে। জবান যা-কিছু ছাড়তে হয়, স্বদেশের নিরাপদ সীমানার মধ্যে ফিরে এসে। সতর্ক বাক্যগুলো বিলকুল ভুলে মেরে দিয়েছি। ভুল হয়ে যায় যে, ভিন্ন দেশে এসেছি—চতুষ্পার্শ্বের এরা আমার আপন লোক নয়। ঘরের দুয়োর এঁটে বসে, দোহাই প্রাজ্ঞবর্গ, মানুষকে পর ভাববেন না। বিজ্ঞানের দয়ায় পথে বেরুনো আজকাল তো কঠিন নয়—

দেখে আসুন, দেশ-বিদেশে কত আত্মীয়তা বিছানো আছে, মানুষজন কত ভাল!

সকাল-বিকাল দু-বেলা আজ অধিবেশন। সভাপতি পুরোপুরি এক ডজন। কটমট একগাদা নাম শুনে কি হবে, সভাপতি মশায়দের দেশগুলো কেবল জেনে রাখুন। অস্ট্রেলিয়া, মঙ্গোলিয়া, সিংহল, ইরান, বর্মা আর কলম্বিয়া সকালে সভারোহণ করলেন। বিকালের জন্য আর ছ-জন—তুর্কি (নাজিম হিকমত), কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা ও ইকুয়েডর।

নতুন দেশে প্রথম আজ মুখ খুলব। মওকা পেয়ে গেছি, ছাড়ব কেন? আচ্ছা করে স্বদেশের গুণ-কীর্তন করা গেল। আর সত্যি কথাই তো, দুর্গম ইতিহাসের সুদূর কাল অবধি বিচরণ করুন—হেন দৃষ্টান্ত একটি পাবেন না, পররাজ্য গিলবার জন্য ভারত হাঁ করেছে। হানা দিয়েছে বটে ভারতের মানুষ—সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নয়, সাধুসন্ত ও বিদগ্ধজনেরা—কণ্ঠে অভীঃ মন্ত্র, শান্তি প্রীতি ও আনন্দের বাণী...

শেষ করে বসতে না বসতে উমাশঙ্কর যোশি আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। ঐ যে বললেন, 'পাহাড়-সমুদ্রের ওপার থেকে চিরকাল আমরা বাইরের ভুবনের দিকে প্রীতির হাত বাড়িয়েছি—' ভারি সুন্দর! কিন্তু লেখক হয়ে অন্য লেখকের প্রশংসা—তবে কি লেখায় ইস্তফা দিয়েছেন উনি? অথবা ভিন্ন ভাষায় লিখলে বোধ হয় নিয়মটা খাটে না। বাংলা দেশে আমরা তো হেন ক্ষেত্রে কাষ্ঠ-হাসি হেসে চুপ করে থাকি। হেসে হেসেও কত কান্না কাঁদা যায়, বুদ্ধিমানে বুঝে নেন।

বক্তৃতায় আরও এক অহঙ্কার করেছিলাম। আর সেই সময়টা জওহরলালকে প্রাণ ভরে নমস্কার করেছি। বাইরের দশটা জাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালে তখনই বুঝতে পারি, কতখানি ইজ্জত হয়েছে আমাদের, কত শক্তি ধরি আমরা! বুক ঠুকে উদ্ধত ভঙ্গিমায় বললাম, শোন হে জাপানি ভায়ারা, ভুবনের তাবৎ ধুরন্ধরেরা সানফ্রান্সিসকো-চুক্তিতে সই মেরে বসলেন—ভারত কিন্তু নয়। এমনি অপমানের দশা আমাদেরও গিয়েছে এই সেদিন অবধি, বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধের সময়,—ইংরেজ যখন মাথায় চড়ে ছিল। দেশের মানুষ না-রাম না-গঙ্গা কিচ্ছু জানে না, অথচ দুনিয়ার লোক জেনে বুঝে রইল, লড়নেওয়ালা-দের মধ্যে ভারতও আছে। গান্ধিজীর সঙ্গে দেশসুদ্ধ আমরা চেল্লাচেল্লি করলাম, না গো—নেই আমরা। কার কথা কেবা শোনে? সে মনের দাগা এখনো মিলায় নি। তোমাদের জাপানি মানুষদের অবস্থাটা তাই মালুম হল। চুক্তিতে

তোমরা রাজি হয়েছ বটে—বুঝতে পারি, সেটা খুশ মেজাজে নয়, কর্তার ইচ্ছাক্রমে।

কেমন-কেমন চোখে তাকায় জাপানিরা। সমব্যথীর কথায় বিচলিত হয়েছে। এই কথাগুলোই পরে আর এক বৈঠকে হচ্ছিল। সেবারে নানান দেশের অনেকে সেখানে। আমাদেরই পড়শি এক ব্যক্তি মাথা চুলকান, 'সানফ্রান্সিসকো-প্যাক্টে আমরা সই দিয়েছি বটে—কিন্তু সে হল গবর্নমেন্ট, পিপল্স্ নয়।' আর উপায় কি, দেশের গবর্নমেন্টের কান মলে দশের আসরে কায়ক্লেশে মান বাঁচানো। আমাদের সে দায় ঠেকতে হল না; আমাদের জওহরলালের দূরের নজর অতি পরিষ্কার।

এক বক্তৃতা ঝেড়েই কিঞ্চিৎ পশার জমে উঠল—পিছন-বেঞ্চি থেকে পয়লা সারিতে প্রমোশান। লোকটা তবে কলম-পেশা লেখক মাত্র নয়, গরজ মতো বচনও ছাড়তে পারে! আর গণতান্ত্রিক ভুবন তো তারই মুঠোয়, তূণ-ভরা যার বাক্য-অস্ত্র।

ডক্টর জ্ঞানচাঁদ সেকহ্যান্ড করে বললেন, আপনাদের লেখকদের দিন এলো এবার। কি বলতে চাইলেন, ঠিক বুঝি না। কলমের খোঁচায় এ যুগে মানুষের পুরু চামড়া ভেদ করা শক্ত—তাই বুঝে জগতের লেখককুলও রসনায় শান দিচ্ছেন —এই নাকি? অমৃত রায় বললেন, আপনি এমন বলেন, তা তো টের পাইনি। যথারীতি আমি না-না করছি, অর্থাৎ বলুন না আরও-কিছু মনোরম বাক্য— আঙুর-আপেলের সঙ্গে চেখে চেখে স্বাদ নেওয়া যাক। আর এক জন— উড়িষ্যার চিন্তামণি পাণিগ্রাহী—বয়স বেশি নয়, জাত-লেখক। যা-কিছু চোখে পড়ছে, টুকে বেড়াচ্ছেন আমারই মতো। অবসর পেলেই লেখাপড়ায় বসেন। ইংরেজি লেখেন বেশি, এক টাইপরাইটার অবধি ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছেন সেই কটক থেকে। পাণিগ্রাহী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন...উঁহু আপনাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হচ্ছে, আন্দাজ পাচ্ছি। কি হে লেখক মশায়, সার্টিফিকেটের মালা গলায় ঝুলিয়ে শোভা বাড়ানোর লোভ হয়েছে?

এই দেখুন, কিঞ্চিৎ নাম জাহিরের চেষ্টায় ছিলাম, ঠিক ধরে ফেললেন। বক্তৃতা শুনে আমাদের সুবোধ বন্দ্যো বড় খুঁতখুঁত করছেন, বাংলায় বললেন না কেন আপনি? জাপানিরা তাদের ভাষায় বলল—জাপানি থেকে চীনায় তর্জমা, তার পরে ইংরেজি। আপনারও তেমনি হত। বাংলার সাহিত্যিক—বাংলা ভাষায় শুনতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে।

ক্ষোভের কথাই বটে! আন্তর্জাতিক সমাবেশে সবাই প্রায় স্বভাষায় বলে,

আমরা কেন তবে লালাসিক্ত ভাঙা ইংরেজি বর্ষণ করি? কিন্তু মুশকিল হয়েছে —এত বড় এই পিকিন শহরে, যত দূর জানি, বাংলা-জানা আছেন একজন মাত্র —এক বিদুষী রমণী, অধ্যাপক উ শিয়াও-লিঙের স্ত্রী। শান্তিনিকেতনে স্বামীর সঙ্গে অনেক দিন ছিলেন, ভাল বাংলা শিখেছেন, মহিলার ঐ সময় নাম হয়েছিল পার্বতী দেবী। সাহিত্যের উত্তম সমঝদার, রবীন্দ্রনাথের অনেক বইয়ের তিনি চীনা তর্জমা করেছেন। অধ্যাপক উ-র সঙ্গে খানিকটা দহরম-মহরম হয়েছে; কিন্তু পার্বতী দেবীর ধরা পেলাম না। ফোনে উত্যক্ত করেছি, অনেককে বলেছি একটুখানি মোলাকাতের উপায় করে দেবার জন্য। শুনলাম, অত্যন্ত কর্মব্যস্ত তিনি—তিলেক ফুরসৎ নেই। তাই কি—না, গুহ্যতর কিছু? সে যা-ই হোক, রবীন্দ্রনাথকে তিনি চিরকালের চীনা গুণীদের আসরে আদর করে নিয়ে বসিয়েছেন—সে কুটুম্বিতা কিছুতে ভুলতে পারি না। আমার একটা বই মহিলার নামে পাঠিয়ে রবীন্দ্রোত্তর আর এক বাঙালি সাহিত্যিকের আগমন জাহির করে এলাম। সে বইয়ের পাঠোদ্ধারের দ্বিতীয় মনুষ্য যখন নেই—ভরসা করা যায়, উপহারটা তাঁর হাতে পেঁৗচেছে।

অবস্থা তো এই। আর রইলেন আমাদেরই দলের গুটিকয়েক বঙ্গনন্দন —বাংলায় বচন ঝাড়লে অতএব ঠেলা সামলাবেন তাঁদেরই কেউ না কেউ। ইংরেজিতে তর্জমা না হওয়া অবধি শ্রোতৃবৃন্দ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাবেন অথবা মৃদু মধুর আন্দাজি হাসি হাসবেন। অবোধ জনদের এমন করে খেলাতে মায়া লাগে। ঝক্কিটা তাই নিজের কাঁধে রাখা—আর কিছু না হোক, সময় বাঁচে অনেকটা।

কিন্তু সুবোধ বন্দ্যোর মনোভাবও মালুম হচ্ছে। এখানে যে যার নিজ ভাষায় বলছে, আমরাই বা কম কিসে? ঘাট মানলাম তাঁর কাছে। মূল শান্তি-সম্মেলনে আমায় যদি কিছু বলতে হয়, নিশ্চয় বাংলায় বলব। বলব বাংলায় আর যদি কোথাও সুবিধা পাই।

বিস্তর জায়গায় বলতে হয়েছে আমাকে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যস্ত হবেন না—ধীরে ধীরে আসছি। শেষটা যেন নেশায় পেয়ে গেল। বেপরোয়া জবান ছেড়েছি—মাথা-মুণ্ড কি পরিমাণ থাকত, সেটা আর না-ই শুনলেন। ভরসা ছিল, বিষম অতিথিবৎসল জাত; যত যা-ই করি, হজম করে নেবে—অতিথির হেনস্তা হতে দেবে না। অত বক্তৃতার মধ্যে দুটো বাংলায়—একটা ঐ যে শান্তি-সম্মেলনের কথা শুনলেন। আর একটা এক ভোজসভায় পাকিস্তানি ভায়াদের সম্বর্ধনার ব্যাপারে।

তবে শ‍ুনুন, অধমও ছেড়ে কথা কয়নি। অনেক পরের ব্যাপার। শান্তি-সম্মেলন চুকে-বুকে গেছে—পিকিন ছাড়ব-ছাড়ব করছি। খুচরো সভাসমিতির হিড়িক পড়ে গেল, এবেলা-ওবেলা মিলিয়ে অমন পাঁচটা-সাতটা। বক্তৃতাদি তেমন নয়, ঘরোয়া মেলামেশা—টেবিলে টেবিলে ভাগ হয়ে বসে আলাপ-আলোচনা, এবং তৎসহ—। উ'হু, আমি কথা দিয়েছি খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে পাঠক-সজ্জনদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করব না। তবু বারম্বার তাই উঠে পড়ে। আজ্ঞে না, ধরে নিন কথাবার্তাই শুধু। আর যদি কিছু থাকে, আমার তা মনে নেই।

আমাদের টেবিলটা ছোট—সাকুল্যে জন আষ্টেক হবো। ভুবনের এপাড়া-ওপাড়ার কয়েকটি ব্যক্তি। মেক্সিকো আছেন, ইউ-এস-এ ও ইরান আছেন। হুন্দুরাসের ফরশা মোটা মেয়েটিও আছেন, অনুমান হচ্ছে। আর আছেন মাও তুন—তাঁকে পাকড়াও করে এনে বসিয়েছি। যে সে ব্যক্তি নন, জাঁদরেল উপন্যাসকার—শুনলাম, আমাদের শরৎ চাটুজ্জে মশায়ের দোসর। আবার ওদিকে বড়-কর্তাদেরও একজন—সাংস্কৃতিক মন্ত্রী। চেহারায় পোষাকে কিম্বা ভাবে-ভঙ্গিমায় অবশ্য টের পাবেন না। কথার তুবড়ি ছুটছে। মাও তুন চীনা বলছেন, আমাদের কেউ ইংরেজি, কেউ বা স্প্যানিশ। গোটা দুই-তিন দোভাষি ছেলেমেয়ে টপাটপ এভাষা-ওভাষায় তর্জমা করে এর ঠোঁটের কথা ওর কানে এনে জুড়ে দিচ্ছে। খুব জমেছে।

তখন আচ্ছা করে বললাম মাও তুনকে। এটা কেমন হল মশায়? রবীন্দ্র-নাথ এলে খুব তাঁকে তোয়াজ করলেন, কলেজ অব আর্টসে তাঁর বিশাল ছবি। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে আধুনিক ভারতীয় বই বলতে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি বইগুলো। তিনিও দেশে ফিরে চীনাভবন গড়লেন শান্তিনিকেতনে। আমাদের চিরকালের ভালবাসা তাঁকে দিয়েই ফের জমজমাট হল। আর এখানে সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাংলার অনাদর! কলকাতা য়ুনিভার্সিটি চীনা ভাষা পড়াচ্ছে, কিন্তু ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম যে বাংলা—

আর যাবে কোথায়! ডাইনের টেবিলে তাকিয়ে দেখিনি—রে-রে রব উঠল সেদিক থেকে। বাংলা-বাংলা করে তড়পাচ্ছেন, রাষ্ট্রভাষাটা বুঝি ফেলনা হয়ে গেল?

হিন্দি-ভাষী বন্ধুকে তাড়াতাড়ি নিরস্ত করি, ঠিক কথা! ভাষাই তো হল দুটো—বাংলা আর হিন্দি।

বাঁয়ের টেবিল অমনি ফোঁস করে ওঠেন, দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাগুলোর খোঁজ রাখেন? না জেনে-শুনে আপ্তবাক্য ছাড়বেন না।

শান্তির সৈনিক হয়ে অশান্তির আলোড়ন তোলা চলে না। সেদিকে ফিরেও ঘাড় নাড়তে হয়, আজ্ঞে হ্যাঁ—ভারতীয় সমস্ত ভাষাই অতি উত্তম।

এবং সকলে মিলে ও-পক্ষকে চেপে ধরা গেল, হিন্দির জন্য ঐ দেড়খানা অধ্যাপক রেখেই হয়ে গেল? আর কি করছেন বলুন? এবারে আমাদের যে-ই আসুক, নিজের ভাষায় কথা বলে যাবো। না বুঝতে পারেন, নাচার।

ও'রা দোষ কবুল করেন। ঝামেলা কত রকম বিবেচনা করুন। অদূরে কোরিয়ার লড়াই। সকল দিককার তাল সামলাতে হচ্ছে, ভারতীয় ভাষার ব্যাপারে তাই যথাযথ মনোযোগ দেওয়া যায় নি। কিন্তু বাংলা শেখাবার লোক কোথা পাওয়া যায়, সে-ও তো এক মহা ভাবনা!

কত চাই? বদলাবদলি চলুক না—ওখান থেকে বাংলা শেখাবার লোক আসবেন, এদিক থেকে গিয়ে চীনা শেখাবেন। সেকালে যেমন শিক্ষক-ছাত্রের স্বচ্ছন্দ গতায়াত ছিল।

কিন্তু দেখুন কাণ্ড! গড়াতে গড়াতে এ কোথায় এসে পড়েছি! গল্প জুড়ে বসলে তাল ঠিক থাকে না। ভোজের আসরে ওদিকে জাপানি বন্ধুরা। খানাপিনা এবং বক্তৃতাদি সারা হয়েছে, আজে-বাজে কথা এখনো বেশ খানিকক্ষণ চলতে পারে।

ছাড়পত্র দেয় নি, এসে পৌঁছলে তোমরা কেমন করে ভাই? ডাঙা-পথ হলে বুঝতাম, কোন গতিকে সীমানা পেরিয়ে পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছ। এ যে জল—জাহাজ ছাড়া গতি নেই। একটি দুটি নয় —এতজনে কি করে পার হলে উত্তাল সমুদ্র?

ওরা হাসে, বলবে না গুহ্য কথা। যা দিনকাল—আরো কতবার হয়তো এমনি হবে। কার মনে কি আছে, এতগুলোর মধ্যে মতলববাজও থাকতে পারে দু-চারটি—ফাঁস করে দিয়ে শেষটা মুশকিলে পড়ে আর কি!

তা না বলো তো বয়েই গেল! ভারি এক ব্যাপার! আমাদেরও ঢের ঢের জানা আছে। দায়ে পড়লে কায়দা বেরোয় মস্তিষ্ক ফুঁড়ে। রাসবিহারী বোস দিন দুপুরে চাঁদপাল-ঘাটে জাহাজে উঠলেন—সেই ঘাটেরই দেয়ালে তাঁর ছাপানো ছবি, ছবির নিচে মোটা অঙ্ক ফেলা আছে মাথার মূল্য হিসাবে। নেতাজি নিশিরাত্রে এলগিন রোডে মোটরে চাপলেন। সিপাহি-সান্ত্রী ঝিমিয়ে পড়ে ঠিক সময়টা। ঝিম-ঝিম করে রাত, নিঃসীম স্তব্ধতা। কে যায়? যুগ-

যুগান্ত ধরে আমরা চলি এমনি আগুন হাতে। আঁধারের মধ্যে আলো ছড়াই, পঙ্গুর পায়ে পাহাড় ডিঙোবার বলের জোগান দিই। নিঃসহায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটি-দুটি প্রাণী—কিন্তু ইতিহাসের আমরা মোড় ঘুরিয়ে দিই, ভাবীকাল উজ্জ্বল বাহু বাড়িয়ে সমাদরে মাথায় তুলে ধরে...

(২৩)

বিকালে শান্তি-সম্মেলন চলছে—তার মধ্যে এক ব্যাপার। ভারতীয়দের তরফ থেকে কোরিয়ানদের উপহার দেওয়া হল—কী আর এমন জিনিষ—জয়-পুরী কাজ-করা কুঁজো, টেবিল-ঢাকা, আর ফুলের তোড়া। একটা বক্তৃতা সায় হতে গম্ভীর বাজনা বেজে উঠল হঠাৎ—উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায় সকলে পিছন-দরজায়—দরজা খুলে গেল। পাঁচটি ভারতীয় মেয়ে ফুল আর জিনিষ ক'টি নিয়ে প্লাটফরমের দিকে চলেছেন—কিচলু অগ্রবর্তী। কোরিয়ানদের মধ্যে দুটি মেয়ে—উপহার তাদের হাতে দিতে সে কী ভয়ঙ্কর হাততালি! আমাদের মেয়েদের তারা জড়িয়ে ধরল গভীর আলিঙ্গনে। ডুবন্ত মানুষের দিকে কারা যেন স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—সেই হাত যেমন শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। কিছুতে ছাড়বে না। তারপর ছেড়ে দিল তো এ-মুখে ও-মুখে চুম্বন করছে বারম্বার। বাইরের দেশ থেকে ধ্বংস আর মৃত্যুই পাচ্ছে ওরা, তারই যেন অভ্যাস—ভালবাসা এই প্রথম পেল। পেয়ে যেন পাগল হয়ে গেছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখে জল এসে যায়—বিশাল হলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত সকলে চোখ মুছছে।

সেদিন সন্ধ্যার পর সাত তলার খানা-ঘরে খেতে যাচ্ছি। লিফটে দেখা হল কোরিয়ান ক'জন—তার মধ্যে সেই মেয়ে দুটিও। তাকাচ্ছে আমার দিকে। বললাম, ইণ্ডিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল সকলে। দোতলা থেকে সাত তলা—কতটুকু বা সময়! হাতগুলো ছোঁয়াও হল না। অনেক গেছে তাদের—ঘর-বাড়ি চুরমার হয়েছে, রক্তে দেশ ভাসছে। জীবাণু-বোমার নিখুঁত বন্দোবস্ত, সকালবেলা এই হাসাহাসি ঝাঁপাঝাঁপি করছি, দুপুরের আগেই হয় তো ভবলীলা-সমাপন। পৃথিবীর এক অতি-মহৎ অতি-প্রাচীন দেশ আজকে তাদের অমৃত পান করাল—সেই নেশায় আবিষ্ট এখনো। ওরা জেনে

বুঝে আছে, শক্তিমানের ভাণ্ডারে মারণাস্ত্রই শুধু—এই টের পেল দেশদেশান্তরের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতি ও সমবেদনার সম্ভার। নিরাশ হবার কি আছে?

খানা-ঘর ভরতি, জায়গা খুঁজে পাইনে। এক প্রান্তে ছোট এক টেবিলে দু-জন গুজরাটি আর জন তিনেক বিদেশি। কায়ক্লেশে আরও একটা জায়গা হতে পারে। বসলাম চেয়ার টেনে নিয়ে। বিদেশিরা অস্ট্রিয়া থেকে আসছেন—বাক্যের এক বর্ণও বুঝিনে। ঐ না বোঝা নিয়ে-ই হাসাহাসি চলল। খেয়ে দেয়ে উঠে গেল তারা। সেই দুই চেয়ার দখল করলেন তখন আর এক শ্বেতা-ভগিনী, এবং এক শ্বেত-পুরুষ।

পুরুষটির সঙ্গে আলাপ জমাই, ইংরেজি জানো তুমি?

ঘাড় নাড়লেন। রক্ষে পেলাম, জানেন তিনি ইংরেজি। এই পিকিনেই আছেন অনেক কাল। কুয়োমিনটাঙের আমল থেকে।

তাজ্জব লাগে মশায়, যেদিকে তাকাই ঝকঝক-তকতক করছে। কলকাতায় বিস্তর চীনা আছেন, তাঁদের দেখে চীন সম্বন্ধে উল্টো ধারণা হয়েছিল।

ভদ্রলোক বললেন, বিদেশে গিয়ে তাঁরা হয়তো অমনি হয়ে গেছেন। পরিচ্ছন্ন চিরকালই এ জাতটা। নতুন আমলে পরিচ্ছন্নতার যেন নেশায় ধরেছে।

মহিলাটি এক মনে নিজ কর্মে রত ছিলেন। আমাদের কথার মধ্যে সহাস্য মুখ তুলে ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, ভারত থেকে আসছ? আমি সুইডিশ, ফরাসি বলি। কিন্তু দেখছ তো, ইংরেজিও বলতে পারি—

খাওয়াটা ইতিপূর্বেই দ্রুত হাতে প্রায় সমাধা করে এনেছেন—তাঁকে এখন ঠেকায় কে? গড়গড় করে একাই বলে চলেছেন—কমা-সেমিকোলন নেই যে তার ভিতরে পালটা কেউ একটা-দুটো জবাব গুঁজে দেবে। নাম-ধাম জাত-জন্মের নিজেই পরিচয় দিচ্ছেন। আইনজীবী আন্তর্জাতিক সংঘের বড় পাণ্ডা। বলুন তাই, কথা বিক্রিই পেশা। তার উপর স্ত্রীলোক। মণিকাঞ্চন যোগা-যোগ—তবে আর এমন হবে না কেন বলুন।

তিনটে দিন পরে এই মহিলার বক্তৃতা হল শান্তি-সম্মেলনে। সে-ও এক তাজ্জব। জলের মতো প্রমাণ করে দিলেন, শান্তিকামী মানুষেরাই আসলে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। যাদের কাজে ভুবনের শান্তি বিঘ্নিত হয়, ধরে ধরে তাদেরই কাঠগড়ায় তোলা উচিত; এবং বিচারান্তে চোস্ত শাস্তি। আমি এই যেমন দু-কথায় সেরে দিলাম, তেমনটি ভাববেন না। দেশ-বিদেশের পাহাড় প্রমাণ আইন-নজির জুটিয়ে অশেষবিধ তর্কবিতর্কের পর শেষকালে সিদ্ধান্তে পেঁছলেন।

বলছেন, তোমাদের দলেও তো উকিল-ব্যারিস্টার রয়েছেন। যত দেশের যত আইনবাজ এসেছেন, সকলের সঙ্গে আমি মোলাকাত করব। আমাদের ভিতর রীতিমতো বুঝসমঝ থাকা দরকার, যাতে কোনখানে বে-আইনি কিছু ঘটলে একসঙ্গে দুনিয়ার টনক নড়ে ওঠে।

তার পরে সকলের দিকে নয়ন তুলে পাইকারি প্রশ্ন, কি করো তোমরা ?

গুজরাটি ভদ্রলোক উষাকান্ত শেঠ আমার পরিচয় দিলেন, নানা বিশেষণ জুড়ে ওজন বাড়িয়েই বললেন।

লেখক ? বিগলিত কণ্ঠে মহিলা বললেন, নামটা কি বলো দিকি ? হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঢের জানি, তোমার কত বই পড়েছি—

সবিনয়ে প্রতিবাদ করি, আজ্ঞে না। আপনার ভুল হচ্ছে—

নাছোড়বান্দা তিনি। এই দেখ, ভেবে রেখেছ—আইনের বই ছাড়া আর আমি কিছু পড়িনে। জানি তোমার নাম—এক-আধটা নয়, বিস্তর বই পড়েছি তোমার। আচ্ছা, বলে দিচ্ছি—ইংরেজিতে তোমার কি কি বই আছে, শুনি ?

একটাও নয়—

কোন বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ হয় নি ?

গল্প পাঁচ-দশটার। গোটা বই একটারও নয়।

সে কি ! বিস্তর শুনেছি যে তোমার নাম—বাসু...বাসু...

বাসু (বসু) অমন দশ-বিশ হাজার আছেন আমাদের দেশে। বিস্তর গুণী-জ্ঞানীও আছেন, তাঁদেরই কারো নাম শুনে থাকবেন। আমার লেখা চা-সন্দেশ কবুল করেও পাঠকদের পড়াতে পারিনে, আপনি নিজের থেকে কোন দুঃখে পড়তে যাবেন ?

না হে, পড়েছি আমি। আছে তোমার বই ইংরেজিতে—তুমি জানো না। যাকগে—একটা বাণী দিতে হবে আমার দেশের সাহিত্যিকদের জন্য। তারা খুশি হবে। কাল আবার খানা-ঘরে দেখা হচ্ছে তো ? সেই সময় চাই।

খানা-ঘরে সেই থেকে দেখে শুনে ঢুকতে হত। আবার তাঁর খপ্পরে গিয়ে না পড়ি !

(২৪)

পূর্ণিমা রাত—এত হুল্লোড়ে আকাশ পানে তাকাই কখন, কে জানে অত শত খবর ?

জানিয়ে দিয়ে গেলেন অধ্যাপক চেন।

তৈরি থাকবেন মশায়রা, খেয়েদেয়েই শয্যা নেবেন না। চাঁদের আলোয় ভেসে ভেসে বেড়াবো।

রাত্রি ঠিক দশটা। সেই সময় এলেন তাঁরা। জোর-জবরদস্তি নেই, যাঁর যাঁর খুশি চলে আসুন। একটা মাত্র বাস—সেইটে কোন গতিকে বোঝাই হল। আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না, তার উপরেও চারিদিক আলোয় আলোয় সাজিয়েছে। বছরের একটা বড় পরব। পরবের নাম তর্জমা করলে দাঁড়ায়—'মধ্য-শারদ রাত্রির উৎসব।'

অধ্যাপক চেন মানে করে বোঝাচ্ছেন। আমুদে মানুষ—কথায় কথায় হাসিরহস্য। অথচ বিদ্যার বারিধি। তামাম জগৎ চষে বেড়িয়েছেন; ভারত ঘুরে গেছেন মাস কয়েক আগে; কলকাতায় অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। সেটা অবশ্য বড়-কিছু নয়। আমার সঙ্গে এই তো আজ সর্বপ্রথম দেখা—ঘনিষ্ঠ হতে মিনিট দুই লাগল। ঘড়ি ধরে দেখেছি, দু-মিনিটের কম বই বেশি নয়।

হোটেল থেকে ডাইনে ঘুরে নিষিদ্ধ-শহরের রঙিন পাঁচিলের পাশে পাশে বাস চলেছে। তার পর তারই মধ্যে ঢুকে পড়ল এক সময়। চলেছে, চলেছে ...মাঠের প্রান্তে এসে থেমে দাঁড়াল। ফটক পার হয়ে হুড়মুড় করে সকলে ঢুকে পড়লাম।

পে-হাই পার্ক। পে-হাই কথার মানে হল উত্তর-সমুদ্র। লেক আছে; লেকটা বড় বটে—লেকের দরুন তোলা-মাটিতে মাঝারি সাইজের পাহাড় গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও সমুদ্র বলতে কেমন কেমন লাগে। গল্পটা আগে করেছি। রাজ-অন্তঃপুরিকারা বাইরের সমুদ্র চোখে তো দেখবে না—তা এই সমুদ্রই দেখে নাও নয়ন ভরে। আসল সমুদ্র আয়তনে খুব খানিকটা না হয় বড়ই হবে—আবার কি! পে-হাইয়ের মতো সমুদ্র আরও অনেক আছে নিষিদ্ধ-শহরের ভিতর—দক্ষিণ-সমুদ্র, মধ্য-সমুদ্র। আর তোলা-মাটির পাহাড় সমুদ্রগুলোর পাশে পাশে; দূরদূরান্তর থেকে সত্যিকার পাথরের চাঁই এনে সেই সব পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বসানো। তবে আর কি দরকার রইল চাল-চিঁড়ে আঁচলে বেঁধে পাহাড়-সমুদ্র দেখতে বেরুবার? দুঃখ কিসের তবে আর রাজ-বধূ? নিষিদ্ধ-শহরের ভিতরেই ঘুরে ঘুরে খোদাতালার দুনিয়া দেখ।

এত রাত হয়েছে, তবু কত মানুষ! ঘুরে বেড়াচ্ছে, লেকের উপর নৌকো বাইছে, আড্ডা দিচ্ছে এখানে-ওখানে বসে পড়ে। দলে দলে বেড়াচ্ছে কলেজি ছেলেমেয়ে। এমনটা রোজ হয় না—আজকে, শুধু এই পরবের রাতেই, হস্টেলের

দরজা অনেক রাত অবধি খোলা থাকবে। গান ধরেছে এক একটা দল—এদিক-ওদিক থেকে গান ভেসে আসছে। আর চকিত হাস্যধ্বনি।

মনে পড়ে গেল, আমার বাংলাদেশেও এমনি! কোজাগরী রাত্রি—লক্ষ্মী-পূর্ণিমা। নাটমণ্ডপে পাশা চলছে—গ্রামের মানুষের জটলা। হুঙ্কার দিয়ে নির্জীব শুষ্ক অক্ষকে শুনিয়ে দিচ্ছে, কোন দান পড়তে হবে এইবার। দানটা পড়ল তো উল্লাসের ধাক্কায় ঘরবাড়ি কাঁপতে থাকে। হুঁকো ফিরছে হাতে হাতে। পাথরের খোরায় চিঁড়ে ভেজানো নারিকেল-জলে। আজকে ফলাহার এবং নিশি-জাগরণ চারিপ্রহর। এরই মাঝে ক্ষণে ক্ষণে কর্তা উন্মনা হয়ে বাইরে তাকান। কে মেয়েটা ঐ, ধবধবে কাপড়-পরা? উঁহু, পোয়াল-গাদার পাশে জ্যোৎস্না পড়ে ঐ রকমটা দেখাচ্ছে। তা আসবেন তিনি ঠিক—এমনি শারদ পূর্ণিমা রাত্রে ফুটফুটে-রং হাস্যমুখী লক্ষ্মীঠাকরুন মর্ত্যলোকে নেমে আসেন। গ্রামের সুঁড়ি-পথে ডালপালার ছায়ায় ছায়ায় জ্যোৎস্না পড়ে আলপনা এঁকে দিয়েছে। তারই উপর পদ্মফুলের মতো কোমল পা ফেলে ফেলে নিঃশব্দে তিনি এ-বাড়ি ও-বাড়ি উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়ান। কে জেগে আছ গো? পায়ের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় সারা উঠান শুচি হয়ে যায়—এই তো, আর ক'দিন পরে মাঠের হৈমন্তী ধান তুলবে এনে ওখানে। ঝি-বউ সকলে এতক্ষণ জেগে ছিল—পুজো-আচ্চার পরে গল্পগুজব করছিল কিম্বা বিন্তি খেলছিল। তা চোখ যদি ঝিমিয়েই পড়ে থাকে, তাদেরই জেবলে-দেওয়া পূজার প্রদীপ তো রয়েছে। প্রদীপ নেভাবার নিয়ম নেই, সারারাত্রি এমনি জ্বলবে। মিটি-মিটি দীপের আলোয় লক্ষ্মী দেবীও আর এক কুমারী মেয়ে হয়ে ঘুমন্ত গ্রামকন্যাদের মধ্যে একটুখানি বসে পড়েন।

ছেলেবেলা এমনি ছবি গ্রামে দেখেছি। পে-হাই পার্কে ঘুরতে ঘুরতে তাই মনে পড়ল। পালপার্বনেও এত মিল দুটো দেশের মধ্যে!

কথা হল, নৌকোয় করে চলে যাবো লেকের শেষ প্রান্ত অবধি; পায়ে হেঁটে ফিরব। কম সময়ে বিস্তর জিনিস দেখা হবে। কিন্তু ঘাট হা-হা করছে, কোথায় নৌকো? বিস্তর খোঁজাখুঁজিতে শেষ অবধি মিলল একটা বটে, কিন্তু মাঝি নেই। এত রাতে কে বসে রয়েছে আপনার নৌকো বেয়ে দেবার জন্যে? নৌকো বেঁধে রেখে সে-ও হয়তো গান ধরেছে কোন পাহাড়তলীর বাঁশঝোপে।

পায়ে হাঁটা ছাড়া অতএব গতি নেই। রোহিণী ভাটেকে জিজ্ঞাসা করি, পথ অনেকটা কিন্তু। পারবেন?

ঘাড় দুলিয়ে তিনি বললেন, হাঁটতে আমি খুব পারি।

এই এক ডাহা মিথ্যা বলে বসলেন। স্বচক্ষে দেখেছি সেদিন মহাপ্রাচীরের উপর ওঠা। হাঁটেন না তো উনি; নাচুনে মেয়ে—চলেন নাচের চালে। কিম্বা বাতাসে লঘুদেহের ভর রেখে আঁচল মেলে পাখীর মতো।

লেকের গা বেয়ে বাঁধানো পথ। ঘাটের যত নৌকো কারা সরিয়েছিল, এবারে ঠাহর হচ্ছে। ডানপিটে যত কলেজি ছেলেমেয়ে। মাঝির তোয়াক্কা রাখে না, নিজেরাই বাইছে। নৌকোর পর নৌকো যাচ্ছে সাঁ-সাঁ করে জল কাটিয়ে। জ্যোৎস্নায় ঝিলিক দিচ্ছে। আর তার সঙ্গে দু-এক টুকরো হাসি, দু-এক কলি গান, একটু বা বাজনা। আমাদের গাঙে পৌষ-সংক্রান্তির সেই বাইচখেলা যেন। অধ্যাপক চেন বললেন, রাতে বুঝতে পারছ না—এই লেকের জল অবিকল কাশীর গঙ্গার মতো। ভারত ঘুরে আসার পর প্রতি কথায় তিনি ভারতবর্ষ এনে ফেলেন।

আর এই ডক্টর আলিম। ইতিহাস একেবারে গুলে খেয়ে আছেন। পা ফেলতে না ফেলতে জায়গাটার হাড়হদ্দ বিশ পুরুষের খবর। খৃস্টীয় নয় শতকে এই রাজোদ্যান গড়তে হাত লাগানো হয়। তারপরে কাজ কখনো টগবগিয়ে চলেছে, কখনো ঢিমে-তেতালায়; কখনো বা বিলকুল বন্ধ। সামনে ঐ যে সকলের বড় পাহাড়টা—বানানো পাহাড় বলে নাক সিঁটকাবেন না, উঠে বুঝুন না গায়ে কত দূর শক্তি ধরেন। চড়াই-উৎরাই, গুহা, গাছপালা—চাই কি হোঁচট খাবার পাথরের চাঁই অবধি রয়েছে। রাজারাজড়ার গড়া জিনিস—ঈশ্বরের চেয়ে তাঁরা বড় বেশি কম যান না। (ঝরণা দেখি নি, এই একটা ব্যাপারেই ঈশ্বরের জিত) চূড়ায় সমাধি-মন্দির। এক তিব্বতী লামা মারা যান; শবদেহ তিব্বতে পাঠানো হয়েছিল—মন্দির রচিত হল তাঁর স্মৃতিতে। নিয়ম মাফিক এক ঝুটো সমাধিও তৈরি আছে মন্দিরের ভিতরে।

সেইখানে আমরা উঠছি। হিমরাত্রি, কিন্তু গায়ে ঘাম দিল—পা আর চলে না। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে আনন্দ-মূর্তি ঐ ছেলেমেয়ের দল ধুপধাপ করে উঠে যাচ্ছে। গান গাইছে, মাউথ-অর্গান বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে, নাচছেও কখনো কখনো। তখন নিজের উপর রাগ ধরে যায়। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে যায়, আমরা না হয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলি—ফিরে গেলে বড্ড অপমান! আমাদের গ্রামের বিলে দেখেছি, অগুন্তি আলেয়ার মুখে দপ-দপ করে আগুন ওঠে। আলোর লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে পথিককে তারা তেপান্তরে নিয়ে ফেলে। এরাও এদিকে-সেদিকে তেমনি ছুটোছুটি দাপাদাপি করে আমাদের চূড়োয় নিয়ে তুলল।

আলো-ঝলমল রাতের পিকিন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। আর কি জ্যোৎস্না! রাত দুপুরে দিনমান। মন্দির ও সমাধি দেখছি চারিপাশে বারান্ডায় ঘুরে ঘুরে। মন্দিরের গায়ে অগুন্তি বুদ্ধমূর্তি। নাকভাঙা—এই এক মজা দেখছি, শত শত মূর্তির মধ্যে একটিরও নাক আস্ত নেই। নাকের উপর এত আক্রোশ কেন বলুন দিকি? ওদের মঙ্গোল-মুখের উপরে থ্যাবড়া নাক থাকে বলে? এক জনে—ছাত্রই হবে—বলল, জাপানিদের কীর্তি। ডক্টর আলিম তা মানেন না, ইতিহাস এমন কথা বলে না কোথাও।

এই ঊর্ধ্বলোকেও চা-কফি-সরবতের দোকান। লোকে খাচ্ছে আর গুলতানি করছে। এখানে-ওখানে মগ্ন হয়ে বসেও কত জন—জ্যোৎস্না রাত্রির রূপ দেখছে। হঠাৎ ঝোপঝাড়ের দিক থেকে বাঁশির আওয়াজ আসে—ছায়ামূর্তি ঐ যেন কারা! ঘড়ি দেখে শিউরে উঠি—বারোটা বেজে গেছে। আর নয়, আর নয়—পালানো যাক।

তা বলে এত সহজে? মোড় ঘুরে দেখি, পথ আটকেছে অনেক ছেলে। হাত বাড়িয়েছে, সেকহ্যান্ড করবে। আমরা এই ক-জন আর ওরা অতগুলো—ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হাড়ের নড়া ছিঁড়ে দেয়। কোন্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র তারা। চেন আমাদের জনে জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জকার উঠছে, হোপিং ওয়ানশোয়ে—শান্তি দীর্ঘজীবী হোক। ক্ষমা দেও লক্ষ্মীভাইরা. এবারে যাই—। শান্তি-সৈনিক—বুঝতে পারছ তো? বেশ এক ঘুম ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার, সকালে চোখ মুছেই আবার গিয়ে সম্মেলনে বসতে হবে।

পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে—একটা চীনা কথা বলুন, তবে ছুটি। বলে ফেলুন—

একটা কেন—অমন এক গণ্ডা কথা ইতিমধ্যে জমেছে ভাণ্ডারে। পরোয়া কিসের? লাগসই বুঝে ছেড়ে দিলাম—ছে-ছে অর্থাৎ ধন্যবাদ।

এবারে তাদের চেপে ধরি, বাংলা বলো। টেগোরের ভাষা—বলতে হবে একটা বাংলা কথা।

বেবাক হার। বোবা হয়ে রইল। দুও-দুও—আসবে আর লাগতে? ছাড়ো পথ। কিন্তু হেরে গিয়েও ছেড়ে দেবে না। শিখিয়ে দিয়ে যাও বাংলা একটুখানি। শুনুন আবদার—রাত দুপুরে এখন টিলার উপরে ক্লাস করতে বসে যাই!

হাত ছাড়িয়ে পালাতে বড্ড দেরি হল। জোর পায়ে নামছি। একটা বড় জিনিস দেখা বাকি রইল—সাত ড্রাগনের দেয়াল। নাম ঐ বটে, ড্রাগন গুণতিতে

ডবল। এ-পিঠে সাত, ও-পিঠে সাত। চেন বললেন, বাকিই থাক মশায়। আবার একদিন আসতে হবে এই লোভে লোভে। দু-দিন কেন, দশ দিন এলেও ক্ষতি নেই এ জায়গায়।

চওড়া রাস্তা—মাঝখানটা বাঁধানো, ঢালু হয়ে ক্রমশ নেমে গেছে। রোহিণী পাশের দিকে চলতে চলতে পা পিছলে যাচ্ছিলেন। চেন বলেন, পথ হাঁটবার সময় মাঝামাঝি যেও সব সময়। বিপদ ঘটবে না।

আলিম বলেন, রাজনীতিতেও। মাঝ-রাস্তা সব ক্ষেত্রেই ভালো।

খানিকটা দূরে আর এক মাটির পাহাড়, তার উপরে প্রাসাদ। জ্যোৎস্না বলেই নজরে আসছে। আজ এই উৎসব-নিশীথে সারা শহর আলোর মালা পরেছে—শুধু কেন্দ্রভূমে ঐ জায়গাটুকুই নিরন্ধ্র অন্ধকার। আলো জ্বালতে মানা, দুয়োর খুলতে মানা—অন্ধকার হয়ে থাকবে প্রাসাদ-কক্ষগুলো দিবারাত্রি। শেষ সুঙ-রাজা ওখানে আত্মহত্যা করেন। জানি না, বিলাসলাস্য-নিক্কণিত নিষিদ্ধ-নগরের সর্বময় প্রভু শক্তিধর সম্রাটের কি ছিল অন্তর-বেদনা!

মার্বেল পাথরের মনোরম সেতু পার হয়ে বাসের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। দলের দু'টি লোকের সন্ধান নেই। জ্যোৎস্নালোকিত এই মায়াপুরীতে কোথায় তাঁরা পাগল হয়ে ঘুরছেন, সময়ের খেয়াল নেই। ডাকতে চলে গেলেন একজন। কি ব্যাপার, তিনিও ফৌত! তারপর আবার একজন। এখনও দলে দলে মানুষ এসে ঢুকছে। বাসের হর্ন টিপে এই বিপুল উল্লাসের তাল ভাঙা যায় না। কি করব, শীতার্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি।

(২৫)

গৌরাঙ্গ মাস্টার মশায় সেকালে আমাদের ভূগোল পড়াতেন। ছেলেরা বলাবলি করত, গৌরাঙ্গ নয়—গণ্ডার মাস্টার। উঃ, কি পিটুনিই দিতেন! শ্রীকৃষ্ণের শত নামের মতন ভুবনের যাবতীয় জনপদ তাঁর ঠোঁটের আগায়। দেয়ালে ম্যাপ টাঙানো—মুখের কথার রেশ না মেলাতেই ম্যাপের উপর দেশ দেখাতে হবে। ঈশ্বরকে শাপশাপান্ত করতাম মনে মনে—এত বড় ভুবন কেন গড়লে প্রভু, কেন এত সব রকমারি জায়গা? একমাত্র উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে, গ্রাম-বালকগুলোকে গৌরাঙ্গ মাস্টারের বেত খাওয়ানো। এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

তারপর উঁচু ক্লাসে উঠে গৌরাঙ্গের বেতের দাগ অঙ্গ থেকে মেলালো—ভূগোল তৎপূর্বেই বেমালুম মিলিয়ে গেছে মন থেকে। সে এক দুঃস্বপ্ন! শত শত শুকনো নাম, আর সপাং-সপাং বেতের আওয়াজ। অনেক দিন অবধি আৎকে উঠেছি পুরানো কথা মনে ভেবে।

সেই নামগুলো মানুষের মূর্তি হয়ে আজকে এক ঘরে জমেছে। ভুবন অতি ছোট—বাল্যের কামনা পূরল এত দিনে। পাহাড়-সমুদ্র ব্যবধানের দেশ-ভুঁইরা মিলে মিশে দিব্যি যেন এক সংসার রচনা করেছে। সারির মাথায় মাথায়, দেখ, নানান দেশের নামের ফলক আঁটা; আর সেই সঙ্গে ছোট এক এক পতাকা। কনফারেন্সের চেয়ে বিরতিগুলোই বেশি আরামের। ঘণ্টা দেড়েক চলবার পর খানিক ক্ষণের ছুটি। নিন, দেহমন চাঙ্গা করে আসুন। পিছনের লাউঞ্জে এবং আরও পিছনে এদিক-ওদিকের ঘরগুলোর আঙুর, কলা, আপেল, কেক, সাণ্ডুইচ, কফি, চা, মিনারেল-ওয়াটার—! নিজের হাতে যত দফায় যেমন খুশি তুলে নিন। দোভাষি ছেলেমেয়েগুলো ঘুরছে পরস্পরের কথা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। কোন কিছুর অকুলান দেখলে—হয়তো বা গেলাস পাচ্ছেন না অরেঞ্জেড ঢেলে নেবার, কিম্বা কাপগুলোয় চা ঢেলে খেয়ে গেছে—ছুটে জোগাড় করে এনে হাতে দেবে। এই রে, ভুল করে নানান অকথ্য খবর দিয়ে বসলাম! ...শীতের স্নিগ্ধ রোদে আসুন ঘুরে ঘুরে বেড়াই পিছনের প্রকাণ্ড মাঠে। বেড়ানো কি বলছি—আক্রমণ, ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে একে অন্যের উপর। কোন জায়গার মশায় আপনি? আমি ইকুয়েডরের। আমি এল-স্যালভেডরের। পেরু থেকে আসছি আমি। আমি পানামা থেকে। আমার নিবাস ইরাক।...আপনার আমার মতোই দু-হাত দু-চোখ-বিশিষ্ট মানুষ সকলে (বিশ্বাস করছেন তো পাঠক?)—হো-হো করে হাসে মজাদার কথায়, মেয়েগুলো বাহার করে মন ভোলায়, প্রশংসা-বাণীতে গলে পড়ে। এর মধ্যে সাধ্য কি আপনি আলতো হয়ে নিজ মহিমায় বিচরণ করবেন! আরে ছোঃ—এরই নাম দুনিয়া, এরাই সব দুনিয়ায় মানুষ! ভাবনা কিসের তবে, কোন মানুষটার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারি নে? দুনিয়া তবে তো আমারই! কনফারেন্সের ব্যাপারে গিয়েছিলাম বটে—কিন্তু সত্যি বলছি, শুধুমাত্র বক্তৃতার কচকচানি হলে ফিরে এসে জাঁক করে এই রকম আসরে বসতাম না আপনাদের নিয়ে। উঁচু প্লাটফরমে উঠলেই বক্তা আপ্তবাক্য ছাড়তে শুরু করেন—কি এদেশে, কি সেদেশে। সে আর নতুন কি? কনফারেন্সের কথা রাজনীতি-ধুরন্ধরেরা বলুন গে—আমি যে ওরই মধ্যে ভুবনের

সঙ্গেও যৎকিঞ্চিৎ মোলাকাত সেরে এসেছি, ঐ এক আনন্দ নানান রকম সুর ভেঙে আপনাদের শোনাই।

বক্তৃতার পর বক্তৃতা। দিন তিনেক তো কেটে গেল, থামবার গতিক দেখি নে। পুরো দশ দিন চলবে নাকি। দু-বেলা হচ্ছে, তাতে কুলোবে না—শুনি, রাত্রি-বেলাও বসতে হবে মাঝে মাঝে। ওরে বাবা, ইস্কুলের ছেলেমেয়ে বানিয়ে ফেলেছে আমাদের। আরও মুশকিল, প্রাজ্ঞ প্রবীণ সকলে—তিলেক মাত্র চাপল্য দেখানো চলবে না। পাকাচুল ব্রেজিলের ব্যক্তিটি দৈবাৎ হাই তুলে ফেলেছেন—চারিদিক তাকিয়ে ধড়মড় করে খাড়া হয়ে বসলেন আবার। পরম মনোযোগে বক্তৃতা শুনছেন—উঁহু, ভূমিকম্প জলস্তম্ভ দাবানল যাই ঘটুক না কেন আর তিনি মুখ ফেরাচ্ছেন না মঞ্চের দিক থেকে।

ভারি এক কাণ্ড হল সেদিন। এক বিদেশিনী পড়ে যাচ্ছিলেন শুনতে শুনতে। মাটিতেই পড়তেন, পাশের মানুষ ধরে ফেলল। বক্তৃতা অতি প্রখর তখন ওদিকে। ক্লান্ত মুদিত-চক্ষু মহিলা— নিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে। এত লোক বাদ দিয়ে বক্তৃতার বাণ বিধল এসে অবলাজনকে! চাপা উদ্বেগ চতুর্দিকে সকলের মুখে, ক'জনে কর্তাদের খবর দিতে ছুটলেন। জাঁদরেল এক ডাক্তার আমাদের মধ্যে—উঠে গিয়ে তিনি নাড়ি টিপে দেখেন। ও-তরফের নার্স-ডাক্তার স্ট্রেচার ফাস্টএডের বাহিনী এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। সুযোগ পেয়েছে তো ছাড়বে কেন? হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

আমাদের ডাক্তার হাঁকিয়ে দেন—উঁহু, কদাপি নয়।

সকলের উদ্বেগ-কাতর প্রশ্ন—হল কি ডাক্তার সাহেব, নাড়ানাড়ির ধকলও সইবে না এ অবস্থায়? বরফ দেওয়া হোক তবে, আর কিছু অষুধপত্তোর?

কিছু নয়, কিছু নয়।

রোগিণীকে সাবধানে বসানো হয়েছে চেয়ারের উপর, ঘাড় এলিয়ে পড়েছে। আহা রে, কি সর্বনাশ বিদেশবিভূঁয়ে এসে! কিন্তু কঠিন-প্রাণ ডাক্তার সাহেব —ওদের নার্স-ডাক্তার সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। ব্যাধিটা তখন মালুম হল—নিদ্রাকর্ষণ। ঝিমুনির মাত্রাধিক্য ঘটেছিল—তার পরে হৈ-চৈয়ের মধ্যে অমনি অবস্থায় নিঃসাড় নিশ্চেতন হয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি? ঘুম ভেঙে গিয়েও মূর্ছিত হয়ে থাকেন মান বাঁচানোর দায়ে। ডাক্তার সাহেব হাসতে হাসতে ব্যাপারটা পরে ফাঁস করেছিলেন অন্তরঙ্গ মহলে।

ছবি তুলছে ক্ষণে ক্ষণে—স্থির অস্থির, উভয় রকমের। আমাদের মধ্যে দু-জন এই তালেই আছেন শুধু। ক্যামেরা কখন কোন দিকে তাক করছে,

তদনুযায়ী ঘাড় বাড়িয়ে দিচ্ছেন—কোনও ছবি ফসকে না যায়। আসন ছেড়ে কেউ হয়তো বাইরে গেছেন, কিম্বা বক্তা রূপে মঞ্চের উপর উঠেছেন—সেই সব খালি জায়গার কখনো এটায় কখনো ওটায় গিয়ে বসলেন ছবি স্পষ্ট ওঠে যাতে। দেখুন দেখুন—বিশিষ্ট এক ব্যক্তি পড়ায় মগ্ন হয়ে আছেন টেবিলের খোপে সকলের নজরের আড়ালে বই রেখে। ইস্কুলের ছেলের উপমা দিলাম—দিব্যি সেটা লাগসই হয়েছে তবে তো!

হাতে আমার কলম—ইতি-উতি চেয়ে অপর সকলের দোষ টুকে নিচ্ছি। নিজেও পরমহংস নই, এই থেকে মালুম। আজেবাজে এতেক কাহিনী লিখছ লেখক মশাই, এই কি সাচ্চা প্রতিনিধির কাজ? এই জন্যে কি এমন খাসা ফাইল পকেট-বই আর কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে? মানি সেটা। কিন্তু একমনে কাঁহাতক এইপ্রকার জবানের পর জবান শোনা যায়? গরজও নেই—টাইপ-করা ও ছাপা যাবতীয় বিবরণই তো আপনা থেকে পেয়ে যাবো!

বিপদ হয়েছে, হলের ভিতরে যতক্ষণ আছি মাথা থেকে হেডফোন নামাবার জো নেই। সকলে তাকাতাকি করবে। দেখ, দেখ, কি দুর্জন—শুনছে না, কনফারেন্স ফাঁকি দিচ্ছে। তিনিই মহাজন, যিনি ধরা পড়েন না; ধরা পড়লে গোল্লায় গেলেন। দু-কান জুড়ে অবিরত ভ্যানর-ভ্যানর—মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তার পরে ভারি এক বুদ্ধি এসে গেল—আহা, কি চমৎকার! সুইস-বোর্ডে ফালতু যে তিনটে ফুটো আছে, তারই একটায় প্লাগ ঢুকিয়ে দাও। ব্যস নিশ্চিন্ত—একেবারে নির্বাধ শান্তি। নিরুপদ্রবে তীরবেগে কলম চালাও এবার। সকলের চোখে চোখে সম্ভ্রম—হাঁ, খাটনি খাটছেন বটে মানুষটি, বক্তৃতার কমাটুকুও ছাড়ছেন না।

ডাক্তার ফরিদি আমার ডাইনে। লক্ষ্ণৌয়ে বসতি, ভারি দরের ডাক্তার, ডিগ্রির অন্ত নেই। আগের বছর আন্তর্জাতিক চিকিৎসক-সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পেয়ে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন। প্রতি দেশ থেকে দু-জন করে প্রতিনিধি—ভারতের দু-জনের মধ্যে তিনি একটি। তারপর তামাম আমেরিকা চষে বেড়িয়েছেন তিন-চার মাস ধরে। এবারে এই নতুন-চীনে। রসিক মানুষ—ফিসফিসিয়ে মাঝে মাঝে ফষ্টিনষ্টি চলে আমাদের। বলেন, পৃথিবী বেড়ানো মোটামুটি শেষ হল এই বারেরটা দিয়ে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন আমার লেখা।

বই শেষ করে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে?

আজ্ঞে না, শুধু মাত্র দাগা বুলানো। আজকের এই হৃদয়গুলোর আনন্দ-

উত্তাপও যদি একটু লিখে নিতে পারি। দেশে ফিরে অনেক রাতে কলম নিয়ে বসব। মন তখন পিছিয়ে এই দিনে পেঁছুবে লেখাগুলো ধরে ধরে।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, কোন ভাষায় লিখবেন বই? ইংরেজি—ইংরেজিতে কিন্তু। নইলে আমাদের বঞ্চনা করা হবে।

বইয়ের নামে কৌতূহল অনেকেরই। পিছনের সারি থেকে বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় উঁকি দিচ্ছেন, দেখি কি লিখলেন? হাত ঢাকা দিই। দেখাবার মতন কি কিছু? এই খড়কুটোর উপর মাটি লেপে মূর্তি বানাই, তার পরে দেখবেন।

বাইরে যখন মাঠে ঘুরছি, হাতছানি দিয়ে একজন ডাকলেন। শুনুন, উত্তম চেয়ার-টেবিল, অফুরন্ত সময়, দেদার লিখে যান। আমি এক কায়দা বাতলে দিচ্ছি—

কানের কাছে মুখ এনে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কায়দাটা বাতলে দিলেন। আমি হেসে বললাম, ফালতু ফুটোয় প্লাগ ঢোকানো—এই কর্মই চালাচ্ছি মশায় কয়েকটা দিন।

বলেন কি, ওটা তো আমারই মাথায় এলো—

দায়ে পড়ে অনেক মাথাই খুলেছে, খোঁজ নিয়ে দেখুন।

ডক্টর কিচলু উঠলে উৎকর্ণ হলাম। এখানে ফাঁকি নয়। সাংস্কৃতিক লেনদেন নিয়ে বলছেন। আমার মনের কথাগুলোই তাঁর কণ্ঠে উদ্দীপ্ত হয়ে বেরুচ্ছে।

"ইউরোপে বিভিন্ন দেশ; কিন্তু সাংস্কৃতিক লেনদেন তাদের মধ্যে বরাবরই চলেছে। এখনই থমকে যাচ্ছে লড়াইয়ের আলাদা আলাদা ঘাঁটি বানাবার দরুন। এশিয়ার আমরা বহু পুরানো কাল থেকেই এক—মাঝখানটায় কেবল ছন্নছাড়া হয়ে ছিলাম, বিদেশিরা যখন ঘাড়ে চেপে বসল। তাদের সংস্কৃতি বয়ে এনে চাপান দিল আমাদের ঘাড়ে।

প্রশান্তসাগরীয় অঞ্চলের তাবৎ জাতি এখানে জমায়েত হয়েছেন। দক্ষিণ-আমেরিকা ফিলিপাইন নিউজিল্যান্ড—ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগটা অনেক কম। প্রীতির বাহু বিস্তার করুন ওঁদের দিকে—সমস্যা একই সকলের। সংস্কৃতি মানে আর এখন ধর্ম ও দর্শন নয়, সাহিত্য ও শিল্প নয়—সামগ্রিক জীবন-রীতি। তারই বিস্তারে গোটা দুনিয়া এক হয়ে যাবে, শান্তি আসবে।

এগিয়ে আসুন লেখক-শিল্পীরা, এদেশে-ওদেশে যাতায়াত ও মেলামেশা করুন। আসুন সাংবাদিক, শিক্ষক, সমাজ-কর্মী, অভিনেতা—সকলেই। চাষী-কারিগর চিনে ফেলুন পরস্পরকে। খেলুড়ের দল খেলাধূলা করুন এদেশে-বিদেশে। বাচ্চাদের মধ্যেও প্রসার হোক ঐক্য-চেতনা—খেলনা-পুতুলের লেন-দেন চলুক। এদেশের পড়ুয়ারা চলে যাবেন ঐ সব দেশে; ওদেশ থেকে আসবেন এখানে। বিদেশে পড়াশুনোর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা হবে। একজিবিসন হবে; সভা হবে ভুবনের তাবৎ সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে। সিনেমা নাটক নাচ-গানের পালটাপালটি হবে। ভাষা শিখতে হবে এদেশের ওদেশের; বইপত্তোর তর্জমা হয়ে ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র। বড় বড় ওস্তাদ গুণীজ্ঞানীদের স্মৃতিতে আন্তর্জাতিক উৎসব হবে...”

নিমন্ত্রণ। কনফারেন্স করছি, সেক্রেটারিচমূর এক জন শিলপ পাঠিয়ে খবর জানালেন। কয়েকজন চৈনিক পণ্ডিতের বাঞ্ছা হয়েছে—আমাদের পাঁচ জনকে ভোজ খাওয়াবেন—ডক্টর কিচলু, সর্দার পৃথ্বী সিং, অধ্যাপক উপাধ্যায়, কেরালার লেখক জোসেফ মুণ্ডেসেরি এবং এই অধম। উদ্যোক্তা মহাশয়দের পাণ্ডিত্যে খাদ নেই, তা এই মহৎ ইচ্ছা থেকে মালুম। অধিবেশনের পর হোটেলে নয়—সোজা চলে যাবো তাঁদের সঙ্গে। আহারাদি অন্তে পুনশ্চ এইখানে হাজির করে দেবেন বৈকালিক সভাশোভন বাবদে। দুপুরবেলাটা খাটে গড়ানো আজকে কপালে নেই।

আর একটু হাঙ্গামা—দাঁড়িয়ে যান হলের বাইরে এইখানটায়। গোটা ভারতীয় দল নিয়ে ফোটো তোলা হচ্ছে। ঝানু ব্যক্তিরা তক্কে তক্কে ছিলেন—কিন্তু জুত হল না, রমেশচন্দ্র জায়গা ঠিক করে দিচ্ছেন। বলেছি তো—পয়লা সারির লোক হয়ে দাঁড়িয়েছি, কিচলু সাহেবের পাশেই আমি। আরে দূর—তাই হয় কখনো? রবিশঙ্কর মহারাজ আর ডক্টর জ্ঞানচাঁদকে মাঝে ঢুকিয়ে নিলাম। সে ছবি দেখেছেন আপনারা বইয়ের গোড়ায়।

সকলে মিলে নিমন্ত্রণ খেতে চললাম দু-খানা গাড়ি নিয়ে। তা-বড় তা-বড় পণ্ডিত—অতএব বিস্তর ভাল কথা শুনতে শুনতে যাচ্ছি। এই পিকিনের কথাই ধরুন। অতি-পুরানো শহর—কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার—গোটা দুই-তিন রাস্তা মাত্র আঁকাবাঁকা; আর সমস্ত সোজাসুজি চলে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় কাটাকাটি সঠিক সমকোণে। প্ল্যান করে শহর বানিয়েছে সেই প্রাচীন

কালের ইঞ্জিনিয়াররা। চওড়া চওড়া রাস্তা ছিল তখন। নতুন আমলে এখন ছোট রাস্তাগুলো বড় করা হচ্ছে—দু-পাশের বাড়ি ভেঙে ফেলে। খুঁড়তে গিয়ে মাটির নিচে সেকালের পুরানো পয়ঃপ্রণালী বেরিয়ে পড়ছে। অনেক রকম বিপর্যয় ঘটেছে পিকিনের উপর দিয়ে, চেহারা পালটেছে অনেক বার। কালে কালে মানুষ রাস্তা গ্রাস করে তার উপরে ঘরবাড়ি তুলেছিল।

উঁচু ঘর কিন্তু বানাতে দিত না সে আমলে। আপনার আমার ঘর রাজ-বাড়ি ছাড়িয়ে মাথা তুলবে, এ কেমন কথা? যতদূর খুশি ছড়িয়ে ঘরবাড়ি করুন, কিন্তু উপর দিকে নয়। ছ-সাত তলা এই যে অট্টালিকা দেখছেন, নিতান্তই হাল আমলের এগুলো।

আরে—ঘুরে ফিরে গাড়ি যে আবার পিকিন-হোটেলের সামনে। হোটেল ছাড়িয়ে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। তার পরে আরো খানিকটা গিয়ে থেমে দাঁড়ায়।

রেস্তোরাঁ। পুরাণো প্যাটার্নের বাড়ি—চেহারা চমকদার নয়। খানা-পিনার জায়গা, বাইরে থেকে মালুম হয় না। রসিক অধ্যাপক চেন হ্যান-সেং নিমন্ত্রকদের একজন। আর আছেন চেং চেন তো, ভারি জাঁদরেল পণ্ডিত—সাহিত্যিক, সহকারী সাংস্কৃতিক মন্ত্রী।

তা নেমন্তন্ন করে রেস্তেরাঁয় কেন মশায়? বাড়িতে নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন?

এই রেওয়াজ। কি কি পদ ভারতীয়েরা তারিফ করেন, আগে থাকতে বলে গিয়েছিলাম; এরা সেই মতো আয়োজন করেছে। বাড়িতে এসব হয় না।

ঘরগুলো আধ-অন্ধকার, ঘিঞ্জি মতন। চেং বলেন, এই থেকে আমাদের সেকেলে গৃহস্থবাড়ির আন্দাজ নিন। ঐ হল উঠোন, এইগুলো শোবার ঘর, ওখানে ওঠা-বসা হত। একজনের বসতবাড়ি এটা। জাপানিরা পিকিন দখল করল; তাদের এক দল গৃহস্থ তাড়িয়ে এখানে আস্তানা গাড়ে। মালিকেরা ফৌত। কোথায় গেল, কি হল—সেটা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। এমন বিস্তর ঘটেছে। মানুষ শেষটা তাই মরীয়া হয়ে উঠল একেবারে। কম্যুনিস্টদের মুক্তি-সৈন্য ধেয়ে আসছে পিকিনমুখো; কুয়োমিনটাং নানা রকম গুজব ছড়াচ্ছে—মানুষ নয়, ভূতপ্রেত দত্যিদানো হল বেটারা। লোকে তবু ভয় পায় না একটুও। যা-ই ঘটুক, জাপানিরা যে কাণ্ড করে গেছে তার বেশি তো নয়। ভাগ্য ভাল মশায় যে আপনাদের ভারত কখনো জাপানের তাঁবে থাকে নি।

এদিক-ওদিক ঘুরে দেখছি। নানা রকম তুকতাক, অদ্ভুত ধরনের বিচিহ্ন দেয়ালে। শয়তানকে ভয় দেখাত এই সব করে। দেশময় কুসংস্কার ছড়ানো ছিল—পুরানো জাতের যেমন হয়ে থাকে। রেলগাড়ির যখন চলন হল, রেলের পাটি মাইলের পর মাইল উপড়ে দিয়েছিল—এই সব কাণ্ডকারখানায় শয়তান যদি ক্ষেপে যায়, তখন ?

তবে আভিজাত্য ও জাতিভেদ বলে কিছু ছিল না কোন কালে। গরিব-ধনী মূর্খ-বিদ্বান সবই ছিল, জাত হিসাবে ইনি মোটা উনি খাটো এমন বিধান চলে নি। বুদ্ধিজীবী, চাষী, শিল্পী ও সৈন্য—চতুর্বর্ণের সমাজ। আপনি গুণ দেখিয়ে এ-বর্ণ থেকে ও-বর্ণে স্বচ্ছন্দে প্রোমোশান নিয়ে যান, কেউ রুখতে পারবে না। খৃস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে নাকি এই নিয়ম চালু।

আর নয়—আসুন, এবারে খাওয়া-দাওয়া। ভাগ্যবশে এমন সঙ্গ পেয়ে গেছি, খাদ্যে রুচি নেই—জ্ঞানীগুণীদের মুখের বাক্যই গোগ্রাসে গিলছি। টুকে নিচ্ছি একটু-আধটু খাতায়।

নিজ দেশকে ওরা বলে চুং-কো (মাঝের দেশ)—চীন নয়। জাতটা ধরেই ঠাণ্ডা মেজাজের। দু'জনের মারামারি হচ্ছে—তাই দেখে বলত, ভারি বোকা তো! যুক্তি-তর্কে হারিয়ে দাও, গায়ের উপর খোঁচাখুঁচি কেন? সেই চীনকে কত কাল ধরে কি বিষম লড়াই করতে হল, দেখুন! লড়াই করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু নয়, নিজেদের ভদ্র চরিত্র ও চিরাচরিত ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। হীনবল ও প্রায়-নিঃসহায় অবস্থায় গেরিলা-যুদ্ধ চালাল জাপানির সঙ্গে। রেগে তারা অগ্নিশর্মা। কি রকম অভদ্র বিবেচনা করুন—যুদ্ধের নিয়মকানুন পালবে না, পরনে ইউনিফর্ম নেই, পাহাড়-জঙ্গল রাস্তা-সাঁকোর আড়ালে আবডালে থেকে নোটিশ না দিয়ে আঘাত হানবে। তা যেমন মুগুর তেমনি কুকুর হবে তো—জাপানিরাও এক একটা অঞ্চল ধরে বিলকুল সাবাড় করতে লাগল।

(২৬)

'সাদা চুলের মেয়ে (White-haired Girl)' চীনা ছবিটা দেখেছেন? দুনিয়ায় অমন নাকি দ্বিতীয় নেই। সেবারে ফিলম-উৎসবের সময় কলকাতায় এসেছিল। চীনে যাবার যদি মনন থাকে, তার আগে অতি-নিশ্চয় দেখে যাবেন ছবিটা। অনেকবার উঠবে ছবিটার কথা; নানা রকম জেরার তালে পড়ে যাবেন।

জবাব না পেলে ছেলেমেয়েগুলো অভিমানে মুখ ভার করবে। অতএব তৈরি জবাব নিয়ে যাওয়াই ভাল।

ভাগ্য বশে আমার দু-দুবার দেখা। চীনভূমিতে পা দিয়ে সেন-চুনের রেলগাড়ি থেকেই ঐ ছবির কথা। দেখেছ তুমি? নিশ্চয় খুব ভাল লেগেছে—লাগতেই হবে।

লাগুক যেমনই, সভ্য সমাজে হেন অবস্থায় একটিমাত্র বিধি—হাসিমুখে হাঁ-হাঁ করে ঘাড় নেড়ে যাওয়া।

অপেরার পালা—পালাটার নামে মানুষজন ভেঙে পড়ে। সিনেমার ছবিতে গেঁথে ফেলার পর থেকে ভারি জুত হয়েছে। অপেরার তোড়জোড় হামেশাই তো হয়ে ওঠে না—এখন সিনেমার টিকিট কেটে স্বচ্ছন্দে হলে গিয়ে বসুন। এমন একটা জিনিস—শতবার দেখেও নাকি আশ মেটে না।

এমনিতরো উচ্ছ্বাস শুনি, আর স্ফূর্তিতে প্রাণ ডগমগ হয়ে ওঠে। সিনেমার ব্যাপারটায় আমরা তা হলে অনেক বেশি লায়েক, অনেকদূর এগিয়ে আছি। উন্নতি হোক তোমাদের—তবে যতই করো, মুরুব্বির আসরে কলকে-প্রাপ্তির দেরি আছে অনেক। অনেক দেরি।

দু-কথার পালাটার একটু আঁচ দেবো নাকি? বাসন্তী পরবের দিন ভারি ঝড়জল—তার মধ্যে ইয়াং বাড়ি আসছে। জমিদারের ভয়ে বেচারি হপ্তা ভোর পালিয়েছিল। বড় আদরের মেয়ে সিয়ার—ভেবেছিল, মেয়ের সঙ্গে আজকের দিনটা চুপি চুপি উৎসব করে যাবে। হেন কালে জমিদারের লোক এসে টুঁটি ধরে নিয়ে গেল। জবরদস্তিতে পড়ে ইয়াং জমিদারের কাছে মেয়ে বেচে দিয়ে এলো বাকি খাজনার দরুন।

শাশুড়ি ও হবু-স্বামী তা'কে নিয়ে সিয়ার ওদিকে ভোজ খাচ্ছে। এক বন্ধু বাড়ি পেঁছে দিয়ে গেল ইয়াংকে। তা সে সময়টা উজ্জ্বল মুখে মুক্তিবাহিনীর গল্প করছে। তারা আসছে, এসে পড়ল বলে, সকল দুঃখের অবসান হবে। জমিদারবাড়ি যে কাণ্ড করে এসেছে, ইয়াং সে সমস্ত এ আসরে বলতে পারল না। গভীর রাতে দেখল, আনন্দ-প্রতিমা মেয়ে নিশ্চিত আরামে ঘুমুচ্ছে। বিষ খেয়ে ইয়াং ব্যথা-বেদনার শেষ করল।

সকালবেলা তা এসেছে প্রিয়তমার কাছে—এসে দেখে ইয়াঙের শবদেহ।

সিয়ার জেগে উঠল। বাপের জামার মধ্যে পাওয়া গেল সর্বনেশে দলিল। অনতিপরে জমিদারের দল এসে ধরে নিয়ে গেল সিয়ারকে।

জমিদারের মায়ের দাসী সে এখন। অত বড় বাড়ির মধ্যে মুখের দিকে তাকাবার শুধু একটি মানুষ—বুড়ি চাকরানি চ্যাং। তা একদিন জমিদারের লোককে আচ্ছা করে ঠেঙানি দিয়ে মনের ঝাল ঝাড়ল। জেল হল তার। জেল থেকে পালিয়ে সে মুক্তিবাহিনীতে ভিড়ল। সিয়ারকে খবর পাঠিয়েছে ফিরে আসবে সে দলবল নিয়ে—সিয়ার যেন অপেক্ষা করে তার জন্য।

তারপরে সেই ভয়ানক রাত্রি—জমিদারের ধর্ষিতা হল সিয়ার। বাপের মতোই আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োবে, কিন্তু বুড়ি চ্যাং হতে দিল না।

জমিদারের বিয়ে খুব বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে। সিয়ারকে অতএব বাড়ি থেকে চালান করে দিতে হয়। গণিকালয়ে—তা ছাড়া কোথায়? টের পেয়ে সিয়ার ক্ষেপে গেল। তালা আটকে রাখল তখন তাকে। চাবি চুরি করে চ্যাং দোর খুলে দিল। খোঁজ, খোঁজ—সিয়ারের খোঁজে জমিদারের দলবল তোলপাড় করছে চতুর্দিক। নদীর ধারে সিয়ারের জুতো—অতএব জলে ডুবে মরেছে নিশ্চয় হতভাগী। তাই সকলে ধরে নিল।

সিয়ার কিন্তু পালিয়ে আছে জঙ্গলে-ভরা দুর্গম পাহাড়ের গুহায়। সেই পাহাড়ে লাই-লাই মন্দির—লোকে পুজো দিয়ে যায়। পুজোর নৈবেদ্য আর বনের ফল খেয়ে থাকে সিয়ার। নুন খেতে পায় না, আর রোদও বড় একটা লাগে না গায়ে—চুল তাই সাদা হয়ে গেল। চাষীরা কেউ কেউ দেখেছে তাকে—তারা বলে প্রেতিনী। জমিদার একদিন পুজো দিতে এসে ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়েছে। দুর্যোগের মধ্যে সিয়ার যথারীতি নৈবেদ্য কুড়োতে গেল। ঐ ভয়াবহ মূর্তি দেখে আৎকে ওঠে জমিদার। সিয়ারও উদ্যত আক্রোশে ধেয়ে যায় তার দিকে।

জাপানির তাড়ায় কুয়োমিনটাং-দল দুড়দাড় পালাচ্ছে; মুক্তিবাহিনী এসে রুখল। সিয়ারের হবু-বর তা হল বাহিনীর নায়ক। তারপর তা গাঁয়ে এসে পড়ল। জমিদারি অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলছে সে চাষীদের। জমিদার ওদিকে ভয় ধরাচ্ছে প্রেতিনীর গল্প ছড়িয়ে। তা নিজেই ছুটল রহস্যের আস্কারা করতে। কত কাল পরে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে তা আর সিয়ারের মিলন হল।

গণ-আদালতে বিচার। মেয়েটা গান গেয়ে গেয়ে বলছে—তার মধুর নিষ্পাপ

জীবন কেমন করে ওরা পায়ে থেঁতলে দিয়েছে। জনতার ক্রোধ উদ্দাম হয়ে ফেটে পড়ে শয়তান জমিদারের দিকে।

গল্পটা এই। বাঁধুনি আহা-মরি নয়; বিশ্বাস করতে বাধে অনেক জায়গায়। আর, বক্তব্য ওরা সাদামাঠা ভাষায় বলে না, কেবলই গান। ছবি দেখে তারিপ করতে পারি নি, খোলাখুলি বলছি।

সেই 'সাদা-চুলের মেয়ে' আজ রাত্রে অপেরায় করবে। নানান দেশের সজ্জনেরা জুটেছেন—আয়োজনটা বিশেষ করে তাঁদেরই জন্যে। আমি যাবো না, গোড়াতেই সাফ জবাব দিয়েছি। সেই যে শেয়াল-পণ্ডিতের কুমিরের বাচ্চা দেখানো। সবে-ধন একটিতে ঠেকেছে—সন্তানের খোঁজে যে কুমির আসে, গর্ত থেকে তুলে তুলে ঐ এক বাচ্চা দেখিয়ে দিচ্ছে। তোমাদেরও হয়েছে সেই ব্যাপার। এক পালা কতবার দেখব বাপু? কাজকর্ম না থাকে তো পড়ে পড়ে ঘুমবো ঐ সময়টা।

তা কাজও জুটে গেল—যার চেয়ে ভাল কাজ আর হয় না, আড্ডা দেবার আমন্ত্রণ। সন্ধ্যাবেলা হাত-মুখ ধুচ্ছি। এমনি তাড়া, রমেশচন্দ্র সেইখানে এসে হাঁকডাক লাগিয়েছেন। হাত চালিয়ে নিন একটু—

অ্যানিসিমভের সঙ্গে সেদিনের মোলাকাতটা উপাদেয় হয়েছিল। চেহারায় জাঁদরেল হলে কি হয়, মানুষটি বড় ভালো। তাই বলেছিলাম, কোন একদিন নিরিবিলি একটু বসতে পারা যায় না? শুনেছি, বাংলার চর্চা হয় রাশিয়ায়, অনেকে বাংলা জানে। বাঙালি গিয়ে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেছেন, লোক জুটেছে রুশভাষায় তর্জমা করবার। এখানকার মতন বঙ্গজ্ঞের দুর্ভিক্ষ নয় সেখানে। ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে রীতিমত নাড়াচাড়া হয় নাকি। এই সমস্ত শুনতে চাই একটু জমিয়ে বসে। সেদিন সপ্তরথী ব্যূহবেষ্টনে ঘিরে প্রশ্ন-বাণে ঘায়েল করবার তালে ছিলাম—এবারে হবে ধরণীর দুই প্রান্তবাসী লিখিয়ে দু-জনের আজেবাজে গল্পগুজব। জ্ঞানান্বেষণের মহতী আকাঙ্ক্ষা নেই, কোন তত্ত্বরসিক অতএব উৎকর্ণ হবেন না। রমেশচন্দ্রকে বলেছিলাম, এমনি কোন ব্যবস্থা হয় না?

তাই হয়েছে। এক্ষুণি। একা অ্যানিসিমভে হবে না, চাই পোপোভকেও। আমার ইংরেজি বাক্য যিনি অ্যানিসিমভকে সমঝে দেবেন, অ্যানিসিমভের রুশ ইংরেজিতে হাজির করবেন আমার কাছে। এখন যোগাযোগটা ঘটেছে—তাঁরা

দু-জনে অপেক্ষায় আছেন। একটা জামা চড়িয়ে নিন তো গায়ে। ব্যস, ব্যস —উঠে পড়ুন।

খানকয়েক বই হাতে করে গেলে কেমন হয়? বাংলা পড়ার মানুষ আছে ওদের দেশে, বাংলা বইও আছে। কোন এক লাইব্রেরির বাংলা তাকের উপর অধমও সম্ভবত ঠাঁই পাবে। ভিড় নেই, থাকা যাবে আরাম করে দিব্যি গতর ছড়িয়ে। বইগুলো যখন দিলাম, অ্যানিসিমভও ঠিক সেই ভরসা দিলেন। তা দেখে এলাম এবারে মস্কো শহরে, কথা রেখেছেন তিনি। জায়গা হয়েছে গোর্কি ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্লড লিটারেচার্সে রবীন্দ্রনাথের ঠিক পাশেই। বুঝুন, ফাঁকতালে সুদূর দেশে এই কায়দায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। দেশে আপনাদের কাছে বিস্তর ঝামেলা—কেমন লিখছেন, সেটা বিবেচ্য নয়। পোঁ ধরে থাকবার সানাই-ওয়ালা আছে তো? আর কানে তালা-ধরানো ঢাকী? তাঁরা বহাল তবিয়তে থাকলে নাম-যশ ঠেকায় কেডা?

যাক গে, যাক গে—কথাটা কি হচ্ছিল? রমেশচন্দ্র নিয়ে গিয়েছেন অ্যানিসিমভের ঘরে—ঐ পিকিন-হোটেলেরই পাঁচতলায়। হাজির করে দিয়ে তিনি কেটে পড়লেন। বই ক'খানা টেবিলের উপর রেখে একটু ভূমিকা করি—টেগোরের বাংলা ভাষার আমি এক লেখক; রুশ-ভারতের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন হচ্ছে, অধম কাঠবিড়ালি সেই ব্যাপারে মুঠোখানেক বালুর জোগান দিতে এসেছি।

কতবার যে ধন্যবাদ দিলেন অ্যানিসিমভ—পোপোভ তাই তর্জমা করে করে বলছেন। পরম সমাদরে রেখে দেওয়া হবে আপনার বইগুলো; যারা বাংলা জানে, বই পেয়ে তারা খুব খুশি হবে।

সামান্য কয়েকখানা বই—তাই নিয়ে এমন উচ্ছ্বাস! লজ্জায় সঙ্কোচে তাড়াতাড়ি একথা-ওকথায় চলে যাই।

খাসা জমেছে, দিব্যি গদিয়ান হয়ে বসা গেছে। পোপোভ সহসা ব্যস্ত হয়ে বলেন, ইতি করা যাক এবারে। অপেরা আছে।

হাত নেড়ে বলি, যেতে দাও। ওরা তো এক পালাই শিখে রেখেছে—এক কথা কতবার শুনব?

না হে, খুশি হবে। আমি বলছি, ঠকবে না।

আমি না গেলেও, বোঝা যাচ্ছে, ও'রা না দেখে ছাড়ছেন না। অনিচ্ছার সঙ্গে তাই উঠে পড়তে হল। খালি ঘরে একা একা বসে লাভ কি?

দেরি হয়ে গেছে, নিজের ঘরে যাবার আর সময় নেই। ও'দেরই সঙ্গে বের্‌লাম। লিফটের মুখে দাঁড়িয়েছি ভূতলে নামবার জন্য। গ্রহ এমনি, দুটো লিফটই নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠানামা করছে। অনেকবার চেষ্টা করা গেল—তিন-তিনটে গতর কিছুতে সেঁধোনো যায় না ওর ভিতর। আরে, নেমে যাওয়া তো! সিঁড়ি ভাঙা যাক—কতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকব?

লনে বাস নেই, মানুষজনও দেখছি না ড্রইংরুমে। সবাই বেরিয়ে পড়েছে। পোপোভ বলে, আমাদের গাড়িতে চলো—

অগত্যা। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, দোভাষি এলো ছুটতে ছুটতে। টিকিট আছে তো আপনার? টিকিট নইলে ঢুকতে দেবে না।

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বালা করে। টিকিট কেটে নাকি পিকিন শহরে অপেরা দেখতে হবে! কাজ নেই মশায়, নেমে যাচ্ছি—

কিন্তু তৎপূর্বেই মানুষটি টিকিট জুটিয়ে এনে হাতে গুঁজে দিলেন। যতগুলো সিট আছে, তারই হিসাব মতন টিকিট। আপনার টিকিট রয়ে গেছে আপনাদের দলের সেক্রেটারির কাছে।

হলের ভিতর ঢুকলাম—তখন আলো নিভিয়ে দিয়েছে, কনসার্ট বাজছে। তারপরে এক সময় দেখি, দুর্যোগ নিশায় আবছা অন্ধকারের মধ্যে থপথপ করে ক্লান্ত পায়ে এক চাষী চলেছে...

অবহেলা ও অবজ্ঞার ভাব নিয়ে এসেছি নিতান্তই পোপোভের জেদে পড়ে। খাতা-কলম আনি নি—টুকবার কি আছে—ঘণ্টা কয়েকের অপব্যয় শুধু মাত্র। কিন্তু একটুখানি দেখেই ছটফটানি মনের মধ্যে। হারাতে দেওয়া হবে না এ বস্তু—কি করি, কি করি! প্রোগ্রাম দিয়েছে—ভাগ্যক্রমে তার পৃষ্ঠা দুই সাদা। সন্তোষ খাঁ-এর কলমটা চেয়ে নিলাম। বাইরে-থেকে-আসা কয়েকটা দিনের অতিথি আর নই তখন,—মহাচীনের অজানা এক গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, মিলেমিশে গিয়েছি স্টেজের ঐ চরিত্রগুলোর সঙ্গে। অন্ধকারে আন্দাজি কলম ছুটেছে। এত দিনের পরে আজকে তার পাঠোদ্ধারে বসলাম।

স্টেজের তক্তার ছাউনির ঠিক নিচে বাজনার দল। সামনেই আমরা—তাদের কাজকর্ম পুরোপুরি নজরে আসছে। আমাদের চেয়ে বেশ খানিকটা নিচুতে তারা। গুণতিতে বত্রিশ। নাটকের চরিত্রগুলোর মনোভাব টেনেটুনে জাহির

করে দিচ্ছে বাজনায়। নিসর্গ পরিবেশ, এমন কি এক দৃশ্য থেকে ভিন্ন দৃশ্যে চলে যাওয়া—বাজনা যেন সুরের কথায় বলে বলে যাচ্ছে।

এমনি তো দেখি, অপচয় মানা—কাঁচি চালানোর দাপট সর্বক্ষেত্রে। ঝিক-মিকে মেয়েগুলো একটু বাহারের পোশাক পরতে পায় না। কিন্তু অপেরায় এ কি কাণ্ড—দু-টাকার জায়গায় দশ টাকা খরচ করে বসে আছে। নাচের আসরেও দেখেছি এমনি দরাজ হাত। এ যেন হল—রুইমাছ যখন খাবে ঘিয়ে ভেজেই খাও, সর্ষের তেলে নয়। অপেরা হাজার বছরের ঐতিহ্য টেনে আসছে। নিজেদের উপর দিয়েই যত কঞ্জুষপনা—বাপ-ঠাকুর্দার বস্তুর তিলেক অঙ্গ-হানি ঘটলে ও-জাত রক্ষে রাখে না।

কত উঁচু দরের শিল্পী, সিনসিনারি থেকেই মালুম পাই। ভোঁতা নজর-ওয়ালা দর্শকের জন্য রংচঙে সিন নয়। পর্দা খাটানো, তার এদিকে কুড়েঘরের চালের মতো করেছে—ঐটে হল চাষী ইয়াঙের বাড়ি। আবার একসময়ে দেখি, রংবেরঙের অনেক পর্দা—সামনে চেয়ার কতকগুলো। জমিদারের ঘর এটা। পয়সার সাশ্রয় ? আজ্ঞে না—সাজপোশাকে আলোয় বাজনায় যে প্রকার বাহুল্যের ঘটা, তার মাঝে দু-দশটা থিয়েটারি কাটা-সিন ও উইংস বানানো নিতান্তই নস্যি। চিরকাল ধরে ক্লাসিক অপেরার এই ঢং চলে আসছে—তার থেকে এক চুল এদিক-ওদিক হতে দেবে না। আমাদের যাত্রাগানের সঙ্গে খানিকটা যেন মিল—দর্শকের কল্পনার অবাধ প্রসার সেখানেও। সামিয়ানা ও ঝুলানো-লণ্ঠনের নিচে এই রাজসভা বসল, পর মুহূর্তে ভয়াল অরণ্য—হিংস্র শ্বাপদকুল বিচরণ করছে। গেঁয়ো দর্শকেরা প্রায়ই তো নিরক্ষর, কিন্তু রসের স্রোতে তাঁরা অবাধে ভেসে বেড়ান, একটিবারও কোথাও ঠোক্কর খেতে হয় না। বরঞ্চ সিনে-আঁকা চ্যাপ্টা স্তম্ভ ও কাপড়ে দেয়াল দেখেই রাজসভা মানতে শরম লাগে।

ঘরবাড়ি এমনি। আর, পাহাড়-জঙ্গলের যে রচনা দেখাল, চক্ষে তাতে পলক পড়ে না। পর্দার আকাশ—চাঁদ-তারা ঝিকমিক করছে। ইতস্তত পাথর ছড়ানো। সরল সমুন্নত দেওদার একটি। চাঁদের আলোয় বিশাল পাহাড় তন্দ্রাচ্ছন্ন রয়েছে যেন।

আমাদের দু-দুজনের মধ্যে একটি ছেলে বা মেয়ে। অভিনয় বুঝিয়ে দেবার জন্য এসে বসেছে।...একা-একা কি সব স্বগত উক্তি করছে ঐ লোকটা ? আমার নাম হল ইয়াং পাই-লাও, পালিয়েছিলাম জমিদারের ভয়ে, এখন বাড়ি ফিরছি।

পালার গোড়ার দিকে নতুন চরিত্র স্টেজে ঢুকে আত্মপরিচয় দেবে, এই হল অপেরার রেওয়াজ। (আমাদের পুরানো সংস্কৃত নাটকেও অনেকটা এই রীতি) পথ চলছে—তখন ঝড় হচ্ছে, বরফ পড়ছে। বাজনায় ঝড় বহাচ্ছে—বরফগুঁড়ির মতো সাদা সাদা কি ফেলছে উপর থেকে। দ্রুত চলেছে লোকটা, কিন্তু পা দিয়ে তেমন নয়—অঙ্গভঙ্গিতে চলন বোঝাচ্ছে।

ছেলেমেয়েগুলো বকবক করছে অজ্ঞজনদের বোঝাবার প্রয়াসে। পালা জমে উঠলে বিরক্ত হয়ে তাড়া দিই, থামো দিকি বাপু। ওদের বোঝানোয় ছন্দ কেটে যাচ্ছে যেন। সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় হচ্ছে, মুখের কথা আর কতটুকু? কথা আদপে না হলেও ক্ষতি ছিল না।

পর্দা খাটিয়ে জমিদারের যে ঘর হয়েছে, এক বিশাল বাঘের ছবি তার মাঝামাঝি। বাজনা বাজছে ভয়াবহ রকমের—বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে। বাঘের ছবি আর বাজনা থেকেই আতঙ্ক হচ্ছে—কি কাণ্ড ঘটবে রে এখুনি! পরক্ষণে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। বেশবাস বিশৃঙ্খল, চেহারাই পালটেছে এক লহমার ভিতর। মুখ দেখাবে না সে জনসমাজে। পালার গোড়ার দিকে হবু-বরের সঙ্গে মুখের আনন্দ-দীপ্তি দেখেছিলাম—কে বলবে সে আর এই একই মেয়ে। গান গাইছে—গানের মানে ক'জনই বা বুঝি—কিন্তু হলসুদ্ধ নরনারী ফোঁতফোঁত করছে, চোখ মুছছে রুমালে। আর সামনে তীক্ষ্ম নখ-দ্রংষ্ট্রা রক্তদৃষ্টি সেই বাঘ। একই বাঘের ছবি—কিন্তু মনে হচ্ছে, বাঘটার চেহারা হিংস্রতর হয়ে উঠেছে এবার।

জ্যোৎস্নাপ্রমত্ত রাত্রি—আলো ফেলে কি অপরূপ জ্যোৎস্নাবিস্তার! পর্দার আকাশে চাঁদ উঠেছে। রূপালি মেঘে মেঘে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ছে—তার মাঝখানে, যেমন দেখে থাকেন, হাসছে পূর্ণচন্দ্র। তারপর ঘোর হয়ে আসে ধীরে ধীরে মেঘের রং। বিদ্যুৎ চমকায় এক-একবার কালো মেঘ কেটে কেটে। বিদ্যুৎ আকাশময় ছুটোছুটি করছে। প্রবল ধারায় জল নামল। স্টেজের খুব কাছে আমরা—এত বৃষ্টি, কিন্তু সত্যিকারের জল পড়ছে না এক ফোঁটাও কোন দিকে। অথচ সেই ছায়াচ্ছন্ন কালো পাহাড়, অন্ধকার আকাশ, মেঘ-গর্জন, বিদ্যুৎ-চমক, ঝরঝর জলের আওয়াজ—সমস্ত মিলে আমরা তাবৎ দর্শকজনও বিষম দুর্যোগের মধ্যে পড়েছি, ভিজে জবজবে হয়ে গেলাম বুঝি! পরের দিন বন্ধুদের বর্ণনা দিয়েছিলাম, অন্ধকার হলের মধ্যে বাঁ-হাত হাতড়ে আমি ছাতা খুঁজছি—ছাতা মেলে মাথায় ধরব...

দেখুন দেখুন, দাড়িওয়ালা লোকটা ঐ আত্মগোপন করছে। স্টেজের বাইরে গেল না, নড়লই না জায়গা থেকে। পিছন ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আর অপর লোক-গুলো ঠিক সামনে এসেও দেখতে পাচ্ছে না তাকে। দেখবে কি করে, পাঁচিলের এধারে সে, ওপাশে ওরা। পাঁচিলও আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। স্টেজের কিনারা থেকে খানিকটা অবধি পাঁচিল, তার পরেই হঠাৎ কেটে দেওয়া হয়েছে। পাঁচিলটা পুরোপুরি থাকলে এদের দু-পক্ষের মাঝ দিয়েই যেত। কিন্তু পাঁচিল থাকতে পারে না—পাঁচিলে ঢাকা পড়ে গিয়ে তাহলে তো ওদিককার লোকের অভিনয় নজরে আসত না। পাঁচিলের অবস্থান অতএব আন্দাজ করে নিন। অপেরা-দর্শকের চোখ-কান শুধু নয়, মনেরও কাজ রয়েছে দস্তুরমতো; দৃশ্য-পটের ফাঁকগুলো মনে মনে পরিপূরণ করে নিতে হবে।

চরিত্রগুলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, অথচ সময়ক্ষেপ সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে আলো এবং বাজনা বদল করে। দিন দুপুর কাটিয়ে দিয়ে এখন রাত দুপুরে এসেছি—বুঝতে একটুও আটকায় না। ঘুরন-মঞ্চ নয়, দৃশ্য-বদল তবু আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় হয়ে যাচ্ছে। একবার পর্দা একটুখানি আটকে গিয়েছিল—কত লোক ছুটোছুটি করে ভিতরে কাজ করছে, ওরে বাবা!

আর ঐ কনসার্ট। অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির মতন একটু একটু আলো প্রতিটি বাজনার সঙ্গে—স্বরলিপি দেখছে সেই আলোয়। ছায়ামূর্তি বাজন-দারগুলো—ব্যাণ্ডমাস্টার মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে চালনা করছে। নাটকের চরম ভাবাবেগের সময় মানুষটি ক্ষেপে যাচ্ছে যেন। কণ্ঠ মিশিয়ে দিচ্ছে এক এক সময় বাজনার সঙ্গে। সেগুলো অর্থময় কথা কিনা জানি নে, কিন্তু সুরঝঙ্কারে অন্তর্লোক কাঁপিয়ে তোলে।

বিরামের সময় আলো জ্বলে উঠল। ব্যাণ্ডমাস্টারের সঙ্গে ছুটে গিয়ে সেকহ্যাণ্ড করি, তাজ্জব দেখালে বটে ভায়া! দেরি করে এসেছি, হলে তখন আলো ছিল না। এবারে চেয়ে চেয়ে দেখছি, সামনে পিছনে কে কোথায় বসল। কি আশ্চর্য, পিছন দিকে গোটা তিনেক সারির পরে—উঁহু, আমার চোখেরই ভুল...তাই কখনো হতে পারে? প্রায় একই প্যাটার্নের গোলালো মুখ এখানকার মেয়েদের—তাঁদের একের জায়গায় অন্যকে ভেবে বসা বিচিত্র নয়। আমার কেশব-জেঠার সাহেব দেখা আর কি—দশ-দশটা বছর শহরে কাটানোর পরেও এক সাহেব

থেকে অন্য সাহেবের তফাৎ ধরতে পারতেন না। সুন-চিন-লিঙ অর্থাৎ সান-ইয়াৎ-সেনের স্ত্রী চুপচাপ আমাদের পিছন দিকে বসে—এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা? নতুন-চীনে মাও সে-তুঙের পরেই বলতে গেলে তাঁর পদ-মর্যাদা। সাজসজ্জা নেই এবম্বিধ বিশিষ্টার, দেহরক্ষীই বা কোন দিকে? তার পর দেখি, কো মো-জো মাও-তুন ইত্যাদি বাঘা-বাঘা নেতারাও পিছন সারিতে গা এলিয়ে মজাসে পালা দেখছেন।

লাউঞ্জে গেলাম। বসে বসে ধকল হয়েছে তো! সেই কষ্ট-নিরাকরণের ব্যবস্থা—যেমন সর্বক্ষেত্রে হয়ে থাকে। দোভাষি মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে; অপেরা নিয়ে তাকে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করি। সিয়ারার পাঠ বলছে, তার নাম ওয়াং কুন; এমন আশ্চর্য অভিনয় কোথায় সে শিখল? দোভাষি গড়গড় করে বোঝাতে লেগে যায়। এই পিকিনে অভিনয়ের ইস্কুল আছে দস্তুরমতো—এক্স-পেরিমেন্টাল স্কুল অব ক্লাসিক্যাল ড্রামা। মুফতে শেখা যায় সেখানে। তারই ফাঁকে একবার বলে, কমলার রস একটু চেখে দেখুন না।

আমিও খাপছাড়া ভাবে প্রশ্ন করি, তোমরা এত ভালো কেন, বলো তো?

জবাব দেয়, আমরা শান্তি ভালবাসি। শান্তির দূত তোমরা—এত ভাল-বাসি তাই তোমাদের।

কত রকমের প্রশ্ন—মাথামুণ্ডু থাকে না অনেক সময়। নিরিবিলি সময়ে ভাবতে গিয়ে নিজেরই লজ্জা লাগে। তারা কিন্তু হাসিমুখে জবাব দিয়ে যাচ্ছে। না বলতে পারলে লজ্জিত হাসি হাসে। না বুঝতে পারলে বলে, ইংরেজি আমি কম জানি। সর্বক্ষণ হাসিমুখ। হোটেলে পরিবেশন করে, সেই মেয়েগুলোই বা কি! শত শত লোকের হাজারো বায়নাক্কা—একে এ দাও, ওকে তা দাও। ছুটোছুটি করে কূল পায় না। হাসতে হাসতে ছোটে। হাসে তাদের চোখ-মুখ, হাসে গতিভঙ্গিমা।

এক কলেজি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলতে পারো—কেমন করে তোমায় রাগানো যায়?

আমি রাগব না।

কেন?

তোমরা বিদেশি, আমাদের অতিথি। তোমাদের কাছে কিছুতেই রাগতে পারি নে।

ওয়াং সিয়াও-মিই-র কথাটা সেই আর একদিন বলতে গিয়ে বলা হয় নি।

পিকিন সিনওয়াল য়্যুনিভার্সিটির মেয়ে। বুদ্ধি প্রতি কথায় ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তাকে বললাম, মেয়েরা যেন বেশি বুদ্ধিমান ছেলেদের চেয়ে?

একটি ছেলে তার পাশে—চেন-চি, সাংহাই-য়্যুনিভার্সিটির। স্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ওয়াং বলে, ছেলেরা মেয়েদের মতোই বুদ্ধিমান।

জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি বিনয়?

না, এটাই সত্য।

কথা পড়তে পায় না। সভ্য সংযত জবাব—মৃদু হাসি খেলে যায় মুখে। চেনের দিকে সকৌতুকে তাকাচ্ছে এক একবার।

মাঝে মাঝে কিন্তু রাগ হয়ে যেতো দুরন্তপনায়। হিংসাও হতে পারে। জন্মাতে মাণিক পঞ্চাশটা বছর আগে, মজা টের পেয়ে যেতে! জন্ম থেকে লোহার জুতো এঁটে পা ছোট করে রাখত, কাঙারুর মতন থপথপ করে চলতে সেই পায়ে। বড় ঘরে বিয়ে হলে দু-শো পাঁচশো বউয়ের একজন; নিতান্ত গরিব-ঘর হল তো পাঁচ-সাত গণ্ডার ভিতরে রইলে। বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ হাঁড়িপানা মেয়ে জন্মানোর পর। আগাছা গোড়া থেকে সাফ করলে হাঙ্গামা কম—বাচ্চা মেয়েকে তাই জলে ডুবিয়ে মারত, গলা টিপে মারত।

আহা, আমাদের—এই বেটাছেলেদের—কি সত্যযুগই ছিল সেকালে! সাত চড়ে মেয়েগুলোর রা কাড়বার জো ছিল না। সব পুরাণো দেশের এক গতিক। তাই ওদের বলতাম, পুরুষজাতটা কি বোকা! তোমাদের পায়ের শিকল ভেঙে দিলাম আমরাই তো! খোঁড়া পায়ে ঘর-উঠোন করতে, দেবতা হয়ে বসে রাতদিনের সেবা নিতাম। দিব্যি ছিলাম। আর এখন যা কাণ্ড, শ্রীমতীরা উল্টে আমাদেরই না শিকলে বাঁধতে লেগে যাও!

১৯১২ অব্দ—তিন বন্ধন কেটে ফেলল ওরা। পয়লা নম্বর হল পুরুষের মাথার লম্বা টিকি। পুরোণো ছবিতে দেখেন নি? আরে মশায়, মাথার চুল হল বাপ-মায়ের সম্পত্তি। কোন হিসাবে সে বস্তু কাটা চলে, কেটে ফেললে গুনাহ্ হবে না? সমস্ত চুল রাখলে বড় ঝাঁকড়ামাকড়া হয়, তাই বেশ ওজনদার একটি গোছা নমুনা রেখে দিত। মাতৃগর্ভ থেকে যে চুল নিয়ে এসেছে, সেই আদি অকৃত্রিম বস্তু হওয়া চাই। দুই নম্বর হল, ঐ যে বললাম—লোহার জুতো পরিয়ে মেয়েদের পা ইঞ্চি পাঁচেকের ভিতরে রাখা। চলতে গিয়ে টলবে, রূপ ফেটে ফেটে পড়বে সেই চলনে! আর তিন নম্বর—কাউ-তাউ। উঠ-বোস করে ভারি এক মজার অভিবাদন-প্রথা।

কোথায় ছিলে সেদিন আনন্দমতীরা—উল্লাসে বীর্যে কর্মিষ্ঠতায় নতুন-চীনের ছেলেদের যারা সমভাগিনী? ওয়াং ঘাড় নাড়লে কি হবে—বেশি উজ্জ্বল, দেখতে পাচ্ছি, মেয়েরাই। ছেলেরা কাজ করে; মেয়েগুলোর কাজ করা শুধু নয়, আনন্দের তুফান বইয়ে দেওয়া ঐ সঙ্গে। যত শক্ত কাজই হোক, গান গেয়ে বেড়াচ্ছে মনে হবে।

ঘরগৃহস্থালীর চেহারা বিলকুল পালটেছে। আগেকার দিনের কর্তা মশায়, এবং পোষা মুরগি ও পোষা রমণীদল নয়। ঘর এখন আনন্দ-নিকেতন; নতুন ছেলেমেয়েদের জন্মের সূতিকাগার। ভূমি-সংস্কারের পর মেয়েরাও জমির মালিক, পুরুষের সমান হকদার। তাদের সমাদর আর সম্মান তাবৎ চীনদেশ জুড়ে।

(২৬)

দু-বেলা কনফারেন্স—সকালের দিকটা একটু আগেভাগে তাই ছুটি মিলেছে। ঘরে ঢুকে দেখি, রকমারি প্যাকেটে টেবিল ভর্তি। গরম সোয়েটার, পাজামা, ছাপা-সিল্কের স্কার্ফ—ব্যাপার কি হে, কোত্থেকে এলো এত সমস্ত?

সুইং বলে, শীত পড়ে গেছে বড্ড কি না!

চটে গিয়ে বলি, কি ভেবেছ বলো দিকি? ঈশ্বরের দেওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলোই মাত্র দেশ থেকে নিয়ে এসেছি—শীতের পোশাক দেবে, রোদের ছাতা দেবে...না না, এ সমস্ত হবে-টবে না, ফেরত নিয়ে যাও বলছি।

সুইং নিতান্ত গোবেচারি ভালমানুষ।

আমি তার কি জানি—যারা দিয়ে গেছে, তাদের ডেকেডুকে ফেরত দিনগে—

শুধু কি পোশাক! প্যাকেট খুলে খুলে তাজ্জব হয়ে যাই। হৃষ্টপুষ্ট ছবির বই, গ্রামোফোন-রেকর্ড, কারুকর্ম-করা কোটো—সে কোটো খুললে আর এক কোটো—তার ভিতরে আর একটা—তার ভিতরে—তার ভিতরে......সাতটা এই প্রকার। আরও কত কি বস্তু—মনে পড়ছে না এত দিনের পরে।

একেবারে কিচ্ছু জানো না সুইং, চুপিসাড়ে কোন চোর এসে এত সমস্ত রেখে গেল?

না—বলে মেয়েটা সরে পড়বার ফিকিরে আছে।

নিশ্বাস ফেলে বলি, দিয়ে গেল বটে কিন্তু পাজামাটা বড্ড ছোট। কাজে আসবে না। মাপসই হলে পরে আরাম পাওয়া যেত। তা কার জিনিস কে-ই বা বদল করে দেয়! থাকুক গে পড়ে এমনি।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে সুইং শুনে নিল, মুখে কিছু বলল না।

ক্ষিতীশের ওদিকটা ভারি জমজমাট। নতুন দুই ভদ্রলোক।

আসুন দাদা, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন মি ল্যান-ফ্যাং। আর ইনি সাও ইয়েই।

ওরে বাবা, মি এসে পড়েছেন আমাদের ঘরে! নাম শুনছি এসে অবধি। পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—ক্লাসিকাল অপেরার রাজ্যে সার্বভৌম সম্রাট। আরও বড় পরিচয়, পরম লাঞ্ছনার দিনেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই মহাশিল্পী। দেশ জাপানিদের তাঁবে—মি'কে তারা হুকুম করল, নাট্যশালার দরজা খুলে দাও; নাচ-গান-অপেরা চলুক আগেকার দিনের মতো। না, কক্ষণো না—পরাধীনতা আনন্দের সময় নয়। স্ফূর্তির নেশায় মানুষ ভুলিয়ে রাখতে বলছ, সেটা হবে স্বদেশদ্রোহিতা। টাকাপয়সা দেখিয়ে হল না তো জোরজবরদস্তি। ঘর-বাড়ি জায়গাজমি বাজেয়াপ্ত। সারা চীনের মানুষ মি'র নামে পাগল—এর অধিক জাপানিরা এগুতে সাহস করল না। নতুন আমলে নবীন যুবার বল-শক্তি নিয়ে মি আবার অপেরা খুলেছেন। তাঁর লেখা অভিনয় সম্বন্ধে একটা বই আমায় দিয়েছেন নিজহাতে নাম লিখে। পড়বার বিদ্যে নেই, কিন্তু এ সম্পদ আমি বুক-বুক করে রেখেছি।

আর এই সাও ইয়েই। ছোকরা মানুষ—নাটক লেখেন। ইংরেজি জানেন বলে সঙ্গে এসেছেন, কথাবার্তায় দোভাষির কাজ করবেন।

তা আমিও তো দলের বাইরে নই—নাটক লিখি, থিয়েটারে নাটক হয়েছে। একটা নাটক উপহার দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাব করে ফেললাম মি'র সঙ্গে। খাতা-কলম নিয়ে আসছি—বসুন।

কলম বাগিয়ে জমিয়ে বসা গেল ওঁদের মধ্যে। অপেরার সম্বন্ধে শুনতে চাই। আপনার মতন কার জানাশোনা? বলুন আমায় দু-চার কথা।

চীনা অপেরা কি আজকের? অনেক শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে। লোক-জনের মনের সঙ্গে গাঁথা। চল্লিশ বছরের উপর স্টেজের সঙ্গে সম্পর্ক আমার। কুয়োমিনটাং আমলে দেখেছি, আর এই নতুন আমলেও দেখছি।

সেকালে যারা নাটক করত, সমাজে ইজ্জত ছিল না তাদের। লোকে মুখ বাঁকাত, বেটা পালা গেয়ে বেড়ায়। পালা শুনতে কিন্তু মানুষ ভেঙে পড়ে—রাজা রাণী বা সেনাপতি সেজে যখন অ্যাক্টো করছে, তখন মানুষ মাতোয়ারা। ব্যস, ঐ অবধি—আসরের সীমানাটুকুর মধ্যেই সমাদর। এখন দিন পালটেছে। আপনি সাহিত্যিক—আপনারই সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছি আমরা ইদানীং। আপনি লিখে বলেন, আমরা গান গেয়ে অ্যাক্টো করে বলি।

কাজেই দায়িত্ব এসে পড়েছে—বলার কথা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে এখন। এবং শুধু কথাগুলোই নয়, বলা হবে কোন কায়দায়। আজকে, দেখতে পাচ্ছেন, যে যার কাজ নিয়ে ধেয়ে চলেছে—মুখে না বলুক, দস্তুরমতো পাল্লাপাল্লির ব্যাপার। দেশের কাজের কাজী সকলেই আমরা—কোন মানুষ আজ হেলা-ফেলার নয়। হাজার হাজার লোকে আমাদের কথা শোনে—মনে মনে তাই বড্ড ভাবনা, আজে-বাজে কথা শুনিয়ে দেশের উন্নতি পিছিয়ে না দিই।

শুনুন তবে। সেই মান্ধাতার আমলের বিস্তর পালাগানই চলছে আজও। গোটাকয়েক মাত্র বাদ গেছে। পুরাণো বস্তু নিয়ে বড্ড দেমাক আমাদের। পাঁচ সাত শ' বছর ধরে যা চলে আসছে, বাপ-ঠাকুর্দা যা শুনে গেছেন, এক কথায় তা বাতিল করবার জো নেই। তবে কি বলতে চাও, তাঁরা বোকা—রুচি ও রস-বোধ ছিল না তাঁদের? ঐ যে বললাম—এমন গোড়া বামনাই দুনিয়ায় অন্য কোন জাতের যদি দেখতে পান!

পালা ঠিকই আছে, অভিনয়ের ঢংটা শুধু বদলেছি। একালের মানুষকে নয়তো খুশি করা যায় না। যেমন ইয়াং কুই-ফি'র জীবন নিয়ে লেখা নাটক। ঐতিহাসিক ঘটনা—ইয়াং ছিল এক সম্রাটের উপপত্নী। তার আশ্চর্য রূপ আর অহঙ্কারের গল্প চীনের বাচ্চা-বুড়োর মুখে মুখে। হুবহু সেই একই নাটক—কিন্তু আগেকার অভিনয়ে ফুটে উঠত ইয়াঙের প্রমোদ-লাস্য, আর এখনকার অভিনয়ে রূপসী দুর্ভাগিনীর নিঃসহায় একাকীত্ব। প্রায় একই কথাবার্তা—কিন্তু অভিব্যক্তির রকমফেরে আজকের শ্রোতা রাজ-অন্তঃপুরিকার বন্দীত্ব-বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। নতুন পালাও অবশ্য বিস্তর লেখা হচ্ছে। কিন্তু নতুন অর্থ বিকীরণ করছে অতি-প্রাচীন কাহিনীগুলোও।

সুইং ঝড়ের বেগে এসে পড়ল।

গল্প শেষ করুন। পাকিস্তানিদের আপনারা নেমন্তন্ন করেছেন, মনে নেই ?

ঠিক বটে! আজকে দ্বিতীয় দফা। সেই যে কথা চলছিল, ভারত-পাকিস্তানে গণ্ডগোল করব না, আপোষে ফয়শালা করে নেবো সমস্ত—তারই পাকাপাকি সিদ্ধান্ত হবে আজকে খাওয়ার সময়। যাচ্ছি সুইং, ও'রা গিয়ে বসতে লাগুন, এক্ষুণি গিয়ে হাজির হবো।

মানুষ কি রকম বদলে গেছে শুনবেন ? একটা পালায় রাজার পার্ট করে আসছি আমি আজ তিরিশ বছর। লড়াইয়ে হেরে এসে বলছি—"আমি চেষ্টার কসুর করিনি, কিন্তু বিধাতা বিমুখ—রাজ্য আমার ধ্বংস হবেই।" অ্যাক্টো করছি গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। সেকালে দেখতাম, এই শুনে হলের তাবৎ মানুষ চোখ মুছছে। এখনকার শ্রোতারা হাসে সেই একই কথায়—বিধাতার আক্রোশে রাজার লড়াই হারবার কথা শুনে। সেকেলে এক নাটকের এক জায়গায় আছে—"মেয়েলোকের ব্যাপার তো! বোলো না, বোলো না, ওতে আবার কেউ কান দেয় নাকি ?"...কথাগুলো এখন উচ্চারণ করবার জো নেই স্টেজের উপর। গুঞ্জন উঠবে—ঝাঁঝাল প্রতিবাদ হবে। মেয়েরা নয় শুধু, পুরুষছেলেদেরও অমন কথায় ঘোরতর আপত্তি। একটা পালা ছিল—সেনাপতি তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে মেরে ফেলল মায়ের তুষ্টির জন্য; মা বউকে মোটে দেখতে পারত না। মেরে ফেলে তারপর বিষম শোকার্ত হয়েছে সেনাপতি। মাতৃ-ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠায় হৈ-হৈ করত সেকালের শ্রোতারা। এখন পালাটা বাতিল—লোকে দু-কানে আঙুল দেয় শোনাতে গেলে। ভাঁড়ামি করে লোক হাসানো হত সেকালের অনেক পালায়; এখনকার মানুষ হাসে না, চটে আগুন হয়। কি ভাবো আমাদের, রুচি নোংরা করে দিতে চাও এই সব শুনিয়ে ? কাগজে চিঠিও বেরোয় এই রকম পালা গাইলে।

রকমারি সাজপোশাকে রঙবেরঙের আলোর মধ্যে চল্লিশটা বছর রাতের পর রাত কেমন বেশ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে এলাম। স্টেজ বিনে আর-কিছু জানিনে। দেশের মানুষ কি বেগে এগিয়ে চলেছে, ওখান থেকেই মালুম হচ্ছে; বাইরে এসে চতুর্দিক নিরীক্ষণের দরকার হয় না। নেচেকু'দে স্ফূর্তির যোগান

দেওয়া নয় শুধু, দশজনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও সকলের সঙ্গে আমরা কাঁধ পেতে নিয়েছি। মাও-তুচির কথা—পুরাণো বনেদের উপর নতুন ইমারৎ গড়ে তোল। আমাদের নাটুকে ব্যাপারও ঠিক তাই। সারা চীন ব্যেপে অগণ্য অপেরা-দল আছে—১৯৫০ অব্দে সবাই এসে পিকিনে জমল। আলাপ-আলোচনা হল—কারা কোন দিকে চলছে, সকলে এক সঙ্গে বসে তার নমুনাও দেখলাম। মোটামুটি একটা পথ ছকে নেওয়া গেছে সবাই যাতে পাশাপাশি চলতে পারি। আবার শিগগিরই আমরা মিলছি, যত অপেরা-দল আছে। কারা কদ্দুর কি করল, তার হিসাবনিকাশ হবে...

অমিয় মুখুজ্জে এক সেক্রেটারি—খোদ সেই প্রভু এসে হাজির। সবাই হাত কোলে করে বসে, আর দিব্যি আপনারা গল্প জমিয়ে বসেছেন। আচ্ছা মানুষ!

তাড়া খেয়ে উঠতে হল—বাপরে বাপ, সেক্রেটারির তাড়া! ভোজনই শুধু নয়, উদ্গীরণ-ক্রিয়াও আছে আজ আমাদের—আমার বক্তৃতা, ক্ষিতীশের গান। কিন্তু গুণীজনদের ছেড়ে যাই কেমন করে?

আপনারাও আসুন না—খাবেন আমাদের সঙ্গে। খেতে খেতে আরও কথা শুনব।

এমন দরের মানুষ—কিন্তু প্রস্তাবমাত্রেই উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাঙ্কুয়েট-হলে ক্ষিতীশ আর আমি দুই মান্য অতিথিকে মাঝে নিয়ে বসেছি। খাওয়া অন্তে গান হচ্ছে, আবৃত্তি হচ্ছে। মি'কে বলি, আপনার কিছু হবে না?

মি ঘাড় নাড়েন। উঁহু, এখানে কেন? ছিটেফোঁটায় সুবিধে হয় না আমার। আপনাদের জন্য পুরো পালার ব্যবস্থা করেছি। আমি তার নায়িকা। পরশু নাগাত দেখাবো।

নায়িকা মনে বিশ-বাইশ বছরের ফুটফুটে রাজকন্যা। ষাট বছরের বুড়ো তরুণী রাজকন্যা সেজেছেন। বুঝুন। সামনের সিটে আমরা স্টেজের হাতখানেকের মধ্যে। বারম্বার নজর হেনেও কিন্তু ধরতে পারছি নে। মি বোধ হয় ফাঁকি দিলেন শেষ পর্যন্ত। ছাপা প্রোগ্রাম উল্টেপাল্টে দেখছি, রাজকন্যা তিনিই বটে। কিন্তু এই চেহারা বড়ো মানুষটার কি করে হতে পারে?

পাশের দোভাষি ছেলেটা হেসে খুন। ঐ তো মজা! মেক-আপ গলার

স্বর এখন এই রকম দেখছেন—আবার যেদিন উনি রাজা সাজবেন, দেখতে পাবেন, বিলকুল আলাদা। এমনি না হলে ওঁর নামে এত মেতে ওঠে মানুষ!

পুরুষমানুষ রাজকন্যা সেজেছে, কিন্তু কন্যার সখিবৃন্দ—গুণতিতে জন ত্রিশেক—তারা সবাই সত্যিকার মেয়ে। সেকালের রেওয়াজ—মেয়ের পার্টে পুরুষ নামত। মি যত পার্ট করেছেন, বেশির ভাগ মেয়ে। মেয়ে মিলত না, সেই জন্যে নাকি? আমাদের দেশেরই মতন আর কি! এখন দেদার মেয়ে—কত নেবেন?

যাকগে, যাকগে। কোথায় যেন ছিলাম? ব্যাঙ্কুয়েট-হলে ভোজ খাচ্ছি পাকিস্তানি ভায়াদের সঙ্গে। গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি আসরের মাঝখানে। চতুর্দিকে একনজর তাকিয়ে নিই।

আজকে ছাড়ব একখানা বঙ্গভাষায়। সুবোধ বন্দ্যো সেই যে বলেছিলেন, দেখা যাক কেমনতরো দাঁড়ায় এই ঘরোয়া সম্মেলনে। সামনেই তরুণ বন্ধু মুজিবর রহমান—আওয়ামী-লীগের সেক্রেটারি। জেল খেটে এসেছেন ভাষা-আন্দোলনে; বাংলা চাই—বলতে বলতে গুলির মুখে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদেরই সহযাত্রী। আর রয়েছেন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান; দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন; যুগের দাবীর সম্পাদক খোন্দকার ইলিয়াস। বাংলা ভাষার দাবি এঁদের সকলের কণ্ঠে। বাঁ-দিকে দেখতে পাচ্ছি ইউসুফ হাসানকে—আলিগড়ের এম. এ., উর্দুভাষী হয়েও বাংলা ভাষার প্রবল সমর্থক। এই বিদেশে বাংলায় বলবার এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায়?

গোড়ায় একটুখানি ভূমিকা করে নিই ইংরেজিতে। মশাইরা অবধান করুন। আমি ভারতীয় বটে, কিন্তু জন্মস্থান পূর্ব-পাকিস্তানে। আজকে আমার নিজ ভাষা বাংলায় কিছু বলব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ভাষা। নিখিল-পাকিস্তানের বড় হিস্যাদার যে পূর্ব-বাংলা, তারও ভাষা এই।

খুব হাততালি। পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে যাঁরা এসেছেন, উৎসাহ তাঁদেরই উত্তাল। মিঞা ইফতিকারউদ্দীন হৈ-হৈ করে উঠলেন উল্লাসে...

সেই রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মজিবর রহমান এসেছেন আমার ঘরে। এমনি চলত আমাদের—কোন দিন আমি যেতাম ও'দের আস্তানায়, কোন দিন বা আসতেন ও'দের কেউ কেউ। খাস-বাংলায় অনেক রাত্রি অবধি গল্পগুজব চলত। বক্তৃতার আসরের ঐ হাততালির কথা উঠল। কিগো ভায়া, পশ্চিম-পাকিস্তানিদের খুব তো নিন্দেমন্দ করেন বাংলা ভাষার শত্রু বলে। অমন সম্বর্ধনা কি জন্যে হল তবে ?

মজিবর বললেন, ভাষা-আন্দোলনের পর থেকে ওরা আমাদের ভয় করে। গুঁতোয় পড়ে বাংলা ভাষার এত খাতির।

আবার বললেন, যে ক'টি এসেছে—এর লোক ভালো, আমাদের মনের দরদ বোঝে। এদের দেখে সকলের আন্দাজ নেবেন না।

দেশে থাকতে শুনে গিয়েছিলাম, দুই বাংলার মধ্যে যাতায়াতের পাশপোর্ট হচ্ছে। একদিন সেই কথা উঠল। মজিবর বললেন, কেন বলুন দিকি ?

আমার বিদ্যাবুদ্ধি মতো জবাব দিই। ভাষা-আন্দোলনের পর কর্তারা বোধ হয় সন্দেহ করেছেন, পশ্চিম-বাংলা থেকে অবাঞ্ছিত মানুষ গিয়ে উস্কানি দেয়। সেই সব মানুষ আটকানোর মতলব।

হল না। মজিবর রহমান বলতে লাগলেন, এ হচ্ছে—পূর্ব-বাংলার যতগুলো হিন্দু আছে, তাদের তাড়াবার ফিকির। পাশপোর্ট চালু হবার মুখে আবার একদফা পালানোর হিড়িক পড়ে যাবে, দেখতে পাবেন।

অবাক হয়ে গেছি। মজিবর জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, তাই। হিন্দুরা চলে গেলে পূর্ব-বাংলায় আমরা গুণতিতে কম হয়ে যাবো পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে। তখন আর এন্তাজারি খাটবে না, ও-তরফ থেকে যা বলবে 'জো হুকুম' বলে মেনে নিতে হবে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, ভিটেমাটি ছেড়ে যাঁরা চলে গেছেন, আমি পশ্চিম-বাংলায় গিয়ে হাতে-পায়ে ধরব তাঁদের। নিজের দেশভুঁই কি জন্যে ছাড়তে যাবেন ? আর এই শুনে রাখুন—হাঙ্গামা যতই হোক, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা পূর্ব-বাংলায় কোন দিন আর হবে না।

বক্তৃতাটা আজকে কি রকম উতরাল—তাই কি খেয়াল আছে ছাই ? খুব মেতে গিয়েছিলাম এই মাত্র জানি। আমার সাত-পুরুষের ভিটা আজকের ভিন্ন রাজ্য হয়ে গেছে। সীমানা পার হতে হাজারো বায়নাক্কা। কর্তা হয়ে যারা জাঁকিয়ে বসেছে, তাদের সঙ্গে চেহারায় মেলে না, কথায় মেলে না, কথাবার্তা বোঝে না

তারা কিছু। মনে দুঃখ হয় না, বলুন? এদেশ-ওদেশ হয়ে আলাদা দল করে এসেছি বটে, চীনে আসবার পরে তাবৎ বাঙালি এখন তো কাঁধ-ধরাধরি করে বেড়াই। পাকিস্তানের এবং ভারতের অপর প্রতিনিধিরা থ হয়ে গেছেন আমাদের রকমসকম দেখে। বাংলা বক্তৃতা বুঝলেন ক'জনই বা! কিন্তু সব ক'টি মানুষ আগাগোড়া চুপ হয়ে ছিলেন। একটু-আধটু মনেও ধরেছে মালুম হচ্ছে—কথা না বুঝেও আমার মনের ব্যথা ছুঁয়েছে যেন তাঁদের মনে।

রমেশচন্দ্র এগিয়ে এসে বাহবা দিলেন, ভারি চমৎকার বলেছেন—

কি বলেছি বলুন দিকি?

আমতা-আমতা করেন তিনি। দেখুন, বাংলা মোটে যে বুঝি নে, এমন নয়। তবে ঝড়ের বেগে এমন ছুটলেন যে পিছু পিছু ধাওয়া করা গেল না।

(২৭)

শান্তি-সম্মেলনে মোট ছেয়াশিটা বক্তৃতা। রিপোর্ট ও ঘোষণা ইত্যাদিতে আরও গোটা চল্লিশ। একুনে কতগুলো দাঁড়াল, তবে কষে দেখুন। শুনিয়ে দেবো নাকি তার থেকে ভারী গোছের ডজন দুই? আঁতকে উঠবেন না পাঠক-কুল—সাদামাঠা একটু রসিকতা। এর তুলনায় হাইড্রোজেন-বোমা তাক করাও দয়ার কাজ। দু-তিনটে বক্তৃতার যৎসামান্য নমুনা ছাড়ব। পুরো বস্তু নয়, এখান থেকে একটা লাইন, ওখান থেকে দুটো। এতে আর মুখ বাঁকাবেন না, দোহাই!

নারীর অধিকার ও শিশুমঙ্গল সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেন তাহিরা মজহর। সর্দার সেকেন্দার হায়াত খাঁর কথা মনে পড়ে—অখণ্ড-পাঞ্জাবের যিনি প্রধান-মন্ত্রী ছিলেন? তাঁরই মেয়ে। স্বামী মজহর আলী খাঁ পাকিস্তান-টাইমসের সম্পাদক—তিনিও এসেছেন। মেয়েটির অতি সুন্দর চেহারা, কণ্ঠস্বর ও ইংরেজি বাচনভঙ্গি অতি চমৎকার। সাঁইত্রিশটা দেশের পৌনে চার শ' মানুষ—আহা-ওহো করছেন। বক্তৃতা অন্তে দলে দলে সে কি অভিনন্দনের ঘটা! অধমও দলের বাইরে নয়।

"মেয়েদের কথা বলতে উঠেছি আমি। তারা লড়াই করে না, লড়াইয়ে মারা পড়ে অসহায়ের মতো। এখনকার লড়াই শুধু সৈন্য মারে না, নিরীহ মানুষের

ঘর-গৃহস্থালী ভাঙে, যুগ যুগ ধরে গড়ে-তোলা মানুষের সমাজ ও সভ্যতা উৎখাত করে দেয়।

মা ছেলেকে বিদায় দিচ্ছেন, কোন দিন আর চোখে দেখবেন না সেই ছেলে; হাস্যোচ্ছলা তরুণী নিঃসহায় বিধবা হয়ে আকাশ-ফাটা আর্তনাদ করছে; মনে মনে ভাবুন দিকি এই সব ছবি। কোন অজ্ঞাত সুদূর রণক্ষেত্রে হাজার হাজার মায়ের বাছার উপর সঙ্গিনের ধার পরীক্ষা হচ্ছে; ফিরে যদি আসে কখনো, আসবে পঙ্গু-বিকলাঙ্গ হয়ে। একটা সত্যি ঘটনা শুনুন। বেরিয়েছে আমেরিকারই এক কাগজে। দক্ষিণ-কোরিয়ার দারুণ শীতে খোলা প্লাটফরমে শ'খানেক বাচ্চা আশ্রয় নিয়েছে। বাপ-মা আত্মীয়জন সবাই লড়াইয়ে মরেছে —ধরণীতে আপন বলতে কেউ নেই। আমেরিকান ভদ্রলোক একটিকে গিয়ে ধরলেন, এর পরে কি করবে, ভেবেছ তুমি কিছু?

মরব—আবার কি! গেল শীতে আমার দাদা গেছে, এবারে আমি—

মরার ক্ষণ অবধি কোন গতিকে কাটিয়ে দেওয়া—তা ছাড়া ঐ বাচ্চা ছেলের আর কোন লক্ষ্য নেই জীবনে। এ ছেলে একটি নয়—হাজার, হাজার। প্যারিসে শান্তি-কংগ্রেস হয়েছিল—পাকিস্তানে সাড়া দিয়েছিলাম আমরা মেয়েদের দলই সকলের আগে। পাঞ্জাব উইমেনস ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশন। কেন জানেন? নিজেদের ভাবনা তত ভাবি নে—মায়ের জাত, ছেলেমেয়ের কষ্টে দুঃখে স্থির থাকা অসম্ভব আমাদের পক্ষে। তাই বলছি, লড়াই থামাও বন্ধুরা সকলের মিলিত চেষ্টায়—নইলে তোমার বুকের মাণিক আমার বুকের মাণিক নিঃসহায় নির্বান্ধব পথে দাঁড়িয়ে অমনি বলবে, আমি মরব এবারের শীত এসে পড়লে। ধরণীর সকল আলো-আনন্দ নিঃশেষে নিবে গেছে এক ফোঁটা ঐ বাচ্চা ছেলের চোখে..."

স্বর কাঁপছিল তাহিরা মজহরের। ব্যাকুল বেদনার্ত মাতৃকণ্ঠ, মনে হল, করজোড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে হল-ভরতি তাবৎ মানুষের চোখের সুমুখ দিয়ে।

আর একজনের দু-এক কথা বলি। আমাদের রবিশঙ্কর মহারাজ। সত্তর বছরের বুড়ামানুষ—অঙ্গে অম্লান খদ্দরের ভূষা, নগ্নপদ, মাথায় গান্ধিটুপি। আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন-ক্ষেত্রে ভারতের পুণ্যবাণী উদ্‌গীত হল মহারাজের কণ্ঠে। মহারাজের বক্তৃতার পর এই কথাগুলোই বললাম অধ্যাপক শুকলার কাছে।

মহারাজকে গুজরাটিতে বুঝিয়ে দিতে সলজ্জ হাসি হেসে তিনি আমায় নমস্কার করলেন।

"সম্মেলন তিনটে কারণে অতি পবিত্র। সম্মেলনের শুরু মহাত্মা গান্ধির জন্মদিনে। সৃষ্টির আদি থেকে যত মানুষ জগতের শান্তি-সৌহার্দের জন্য কাজ করে গেছেন, মহাত্মার চেয়ে বড় কেউ নেই। দ্বিতীয় কারণ, সুপ্রাচীন চীনভূমির উপরে এই অনুষ্ঠান। মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে পর্বতপ্রমাণ দুঃখ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মহাজাতি। তিলেক সংকল্পভ্রষ্ট হয় নি; শ্রমে অবসাদ আসে নি। তিন বছরের মধ্যে অসাধ্য সাধন করে পীড়িত অবমানিত মানুষের চিত্তে নতুন আশা জাগিয়েছে। আর তৃতীয় কারণ হল—সম্মেলনের পুণ্য লক্ষ্য, জগতের মধ্যে—বিশেষ করে এশিয়ার দেশে দেশে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাবের অচল প্রতিষ্ঠা।

বারম্বার মহাত্মাজীর কথা মনে পড়ছে। শেষ নিশ্বাস অবধি তিনি জগতের শান্তি কামনা করে গেছেন, সংকীর্ণ জাতীয়তা বা গণ্ডি-ঘেরা স্বদেশপ্রেমের প্রশ্রয় দিতেন না কখনো তিনি। জগতের যা-কিছু ভালো, নিখিল মানবজাতির তা ভোগ্য হবে, কয়েকটি মানুষের কুক্ষিগত হয়ে থাকবে না—এই তাঁর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের সাধনা অহিংস পথ ধরে।

শান্তি আকাশ থেকে পড়বে না—শান্তির জগৎ গড়ে উঠবে সকলের প্রতি যদি ন্যায় আচরণ হয়। যেখানে জোরজবরদস্তি, বাধা সেখানে দিতেই হবে। অহিংস-পথিক আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের শান্ত চরিত্রই কেবল শান্তির সহায়ক হতে পারে। তবু যেখানে যে-কেউ অন্যায়ের প্রতিরোধ করে—তা সে যে উপায়েই হোক—আমার শ্রদ্ধা স্বতই তার প্রতি উৎসারিত হয়ে ওঠে।

প্রতিটি মানুষ নিজ শ্রমের ফল ভোগ করবে। জাগতিক ভোগ-সুখ নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে কখনো বিশ্বশান্তি আসবে না। ত্যাগের মনোভাব চাই। ভোগলিপ্সা থেকেই অপরকে বঞ্চনা, সম্পদের লালসা—এবং শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের প্রবৃত্তি জাগে।"

(২৮)

ছুটি, ছুটি! তারিখটা ৮ই অক্টোবর। আট-আটটা দিন একটানা কনফারেন্স হল, তাই বুঝি করুণা করে কর্তারা বিকেলটা মাপ করেছেন। রাত

ন'টায় সাংস্কৃতিক কমিশন—তাক বুঝে গা-ঢাকা দিলে ওটাও ফাঁক কাটানো যাবে। খানাঘরের ক্রিয়া জবর রকমে সমাধা করে মনের স্ফূর্তিতে লেপ মুড়ি দিয়েছি। ডবল খিল লাগাও ক্ষিতীশ-ভায়া, ছোঁড়াছুঁড়িগুলো দুয়োর ভেঙে ফেললেও চারটের আগে সাড়া দিচ্ছি নে।

হায় রে কপাল! এ বিজ্ঞান-যুগে দুয়োরে খিল দিয়ে শত্রু ঠেকানো যায় না, ঘরের মধ্যে শিয়রের পাশেও শত্রু ওৎ পেতে থাকে। মনোরম আমেজ এসেছে, আর অমনি ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং—। হাত বাড়িয়ে ফোনের মুখ চেপে ধরব, কিন্তু শীতের দুপুরে লেপের তলা থেকে হাত বের করা চাট্টি কথা নয়। পারেন? আরে, আমরা কি—লড়াইয়ের তা-বড় তা-বড় যোদ্ধাও হার খেয়ে যায়।

তোমার ফোন ক্ষিতীশ, কোন গাইয়ে-বন্ধু ডাকছে—

উঁহু, ফোন আপনার—

বেশ খানিকটা ঠেলাঠেলি চলল দু-জনে। নাছোড়বান্দা ফোন বেজেই চলেছে। ক্ষিতীশ অগত্যা বেজার মুখে রিসিভার কানে তুলে নিল। পরক্ষণে বলে, কানে নিলেন না। ফোন আপনারই।

আমারই বটে! চালাকি করে সুখতন্দ্রা ভাঙলে খুনোখুনি হয়ে যেতো ক্ষিতীশের সঙ্গে। ভারতীয় দূতাবাস থেকে পরাঞ্জপে বলছেন। আজ সন্ধ্যায় সময় আছে আপনার? তাহলে যাই।

যান মশায়, আরও দু'দিন এমনি বলেছেন। হা-পিত্যেশ বসে রইলাম, মশায়ের টিকি-দর্শন হল না। সামান্য ক'দিন আছি, যদ্দুর পারি দেখে শুনে যাবো—তার মধ্যে দু-দুটো সন্ধ্যের ঘণ্টা দুই আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন।

আজ নির্ঘাৎ। রাত্তির বেলাটা পুরোপুরি ফাঁক করে নিয়েছি। দেদার গল্প—কত শুনবেন? আসছি তাহলে কিন্তু—সাড়ে-ছয় থেকে সাতের মধ্যে।

উঠতেই যখন হল, আর লেপ নয়—ওভারকোট গায়ে চাপানো যাক। ওঠো ক্ষিতীশ, বেরিয়ে পড়ি। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ নয়—দু-জনের দু-জোড়া পায়ের উপরে নির্ভর। যে দিকে খুশি, নিয়ে চলে যাক তারা—

কিন্তু হবার জো আছে? লনে দেখি ভারি এক দল। সুবোধ বন্দ্যো আছেন—আর ওখানকার অনেকগুলি।

কোথায়?

চলুন না। হাঙেগরির একজিবিসন হচ্ছে। কর্মীদের সাংস্কৃতিক প্রাসাদও দেখে আসা যবে অমনি।

চীনা বন্ধুটি বলেন, দাঁড়ান—গাড়ির কথা বলে আসি।

আজ্ঞে না। বিশ্বাস করুন, পা নামক এক প্রকার অঙ্গ আছে আমাদের—আমরাও কিঞ্চিৎ হাঁটতে পারি। কিন্তু যা গতিক, অব্যবহারে যন্ত্রটাকে বিকল না করে দিয়ে আপনারা ছাড়বেন না।

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। ততক্ষণে নেমে পড়েছি, দ্রুত পায়ে হাঁটছি। কলকাতার চৌরঙ্গির মতো সুপ্রশস্ত পথ। পথের ধারে গাছপালা—ছায়ায় ছায়ায় চলেছি। এক সংস্কৃতের পণ্ডিত দলে জুটেছেন। পণ্ডিত বলতে যে রকমটা আন্দাজ করছেন, তা নয়। ছোকরা-ছোকরা চেহারা—মুখ-ভরা হাসি। অথচ পড়ান য়ুনিভার্সিটিতে, এবং গীতা-উপনিষদের আধাআধি তাঁর মুখাগ্রে।

পণ্ডিত এক কাণ্ড করে বসলেন। কি লজ্জা, কি লজ্জা! অনেকেই খেয়াল করে নি; আমার নজরে পড়ল। ধরণী দ্বিধা হলেন না, নির্বিঘ্নে তাই পথ হাঁটতে লাগলাম। আমাদের একজন সিগারেট খাচ্ছিলেন—গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেটের গোড়াটুকু ফেলে দিয়েছেন পথে। পণ্ডিত আমাদের দিকে আড়চোখে চেয়ে সেই মহামূল্য বস্তু নিচু হয়ে তুলে নিলেন। হাতের মুঠোয় নিয়ে চলেছেন—তার পর ডাস্টবিন পেয়ে সুড়ুৎ করে কাছে গিয়ে তার মধ্যে ফেলে দিলেন। পণ্ডিতমানুষ হলে কি হবে—জাতে চীনা! অন্যের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিতে আটকাল না। কিন্তু এ ভারি বিপদ তো! সর্বজ্ঞ বন্ধুরা বলে থাকেন, ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই ওদেশে। কথা ঠিকই। পোড়া-সিগারেট-টুকুও পথে ফেলা যায় না। স্বাধীনতা তবে আর রইল কোথায় বলুন?

তিয়েন-আন-মেনের তলা দিয়ে নিষিদ্ধ-শহরে ঢুকলাম। সেকাল হলে—ওরে বাবা, চোখ তুলে এদিকে তাকাবারই কি তাকত হত! বেশ খানিকটা ছায়াচ্ছন্ন জায়গা। সেটা পার হয়ে সিঁড়ি উঠে এক বড় ঘর। ঘরের ভিতর দিয়ে পথ—ঘরে না ঢুকে আনাচ-কানাচ দিয়ে যে ওদিকে যাবেন, সে উপায় নেই। ঘর ছাড়িয়ে উঠোন—পাথরে বাঁধানো। সারা উঠোন ভরতি দৈত্যদানোর মতো যন্ত্রপাতি। রেল-ইঞ্জিন, ট্রাক্টর, মোটরকার—কোন্ বস্তু যে নেই, বলতে পারব না।

ভারতের মানুষ? অহো, কি ভাগ্য—কি ভাগ্য! তাই দেখলাম, বাইরের ভুবনে আমাদের বিস্তর ইজ্জত। খাতির পেয়ে পেয়ে মাথা প্রায় আকাশ-ছোঁয়ার

দাখিল হয়েছিল। ঐ এখন বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দেশে ফিরেও খাড়া মাথা আর নিচু হতে চাচ্ছে না।

উঠোনের দেখাশুনো শেষ হলে সামনের ও ডানদিককার ঘরগুলোয় নিয়ে চলল। কত রকম যন্ত্রপাতি বানিয়েছে রে ঐটুকু দেশ হাঙ্গেরি! হাসতে হাসতে বলে, চাই তোমাদের? তা হলে বলো। চাওয়া না-চাওয়ার মালিক যেন আমরা! হাসি থামিয়ে তার পর বলল, সত্যি, খদ্দের খুঁজছি আমরা। যে দেশের নেই, তাদের জোগান দিতে পারি।

শুধু যন্ত্রপাতি? চাষবাস ও ঘরোয়া শিল্পে কত উন্নতি করেছে—থরে থরে তার নমুনা সাজানো। সমস্ত ঘর ঘুরিয়ে তবু ছেড়ে দেবে না। তাই কি হয় মশায়, খেয়ে যান কিছু। খাবার-দাবারও খাস-হাঙ্গেরির আমদানি—এখানকার একটি জিনিষ নয়।

পাকড়াও করে নিয়ে বসাল একটা ঘরে। রকমারি মদ—ও-বস্তু আমার নয়। আচ্ছা, আরও আছে—টিনের মাংস, চকোলেট, কফি—কি বলবেন এবারে শুনি! এটা-ওটা অগত্যা মুখে ফেলে, চিত্রবিচিত্র ভারী এক এক ক্যাটালগ বগলদাবায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এবারে পশ্চিম দিকে একটু। সাইপ্রেস গাছের ঘনকুঞ্জ—মাঝখানে লাল দেয়ালের ঘর, হলদে টালির ছাত। গাছ আর এই ঘরবাড়ি প্রায় একই বয়সি—পাঁচ শ' পেরিয়েছে। দক্ষিণের গায়ে ঝিরঝিরে একটু—আজ্ঞে হ্যাঁ, নদীই বলতে হবে; খাল বললে ওঁরা গোসা করবেন। সুদূর-পাহাড়ের উদ্দাম মেয়ে নিষিদ্ধ-শহরের অন্দরে এসে নিরুদ্যম নিস্তরঙ্গ ক্ষীণদেহ হয়ে গেছে। আরামে আছে অবশ্য। মার্বেল-পাথরে বাঁধানো দুই তটের শুভ্র শয্যা—মার্বেলের সাতটা সাঁকো কুলবধূর সাদা শাঁখার মতো পর পর যেন হাতে পরানো। সেকালে মস্ত কাজ ছিল নদীর—আগুন-নেবানোর যাবতীয় তোড়-জোড় এই বাঁধানো নদীতটে।

বাড়িটা ছিল পিতৃপুরুষের মন্দির। রাজারা এখানে অতীত মুরুব্বিদের পূজা দিতে আসতেন। রাজার রাজত্ব ফৌত হয়ে গেলে তারপর আরশুলা-চামচিকেয় বাসা বেঁধেছিল। এখন ভাল করে সেরে-সুরে নতুন ভাবে সাজিয়ে-গুজিয়ে সাংস্কৃতিক প্রাসাদ হয়েছে। নামকরণ মাও সে-তুঙের—তিনি নিজের হাতে নাম লিখে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৫০ অব্দে। যারা খেটে খায়, তাদের নিজস্ব জায়গা। দলে দলে এসে জোটে এখানে—পড়াশুনো খেলাধুলা আমোদ-

স্ফূর্তি করে।

কারুকর্ম ও আসবাবপত্রের চেহারা দেখে নয়ন ফেরানো দায়। রাজরাজড়ার বানানো বস্তু—ধরুন, একেবারে খাস এলাকা তাঁদের, রাজার মূল-প্রাসাদেরই অংশবিশেষ বলা চলে। যতক্ষণ বেঁচে রয়েছ, থাকো রাজপ্রাসাদের ভিতর। মরবার পর একটু সরে এসে এখানে মন্দিরের মধ্যে জায়গা নাও। মিং আর চিং দু-দুটো রাজবংশের যাবতীয় প্রেতাত্মা ছিলেন এখানে; অদৃশ্য বায়বীয় দেহ বলেই কম জায়গায় গুঁতোগুঁতি হতে পারত না। প্রেতাত্মাবর্গ বিরক্ত হয়ে এখন নিশ্চয় সরে পড়েছেন। গায়ে খেটে-খাওয়া সামান্য লোকেরা দিন-রাত হৈ-হল্লা করছে, হেন সংসর্গে রাজন্যেরা কি করে থাকবেন?

পূব দিকে খেলার মাঠ; পশ্চিমের মাঠে স্টেজ—খোলা জায়গায় থিয়েটার হয়। দুটোই নতুন তৈরি। সামনের হলগুলোয় বারো মাস তিরিশ দিন একজিবিসন চলছে। জিনিষপত্র পালটাপালটি হয়, পিকিনের জিনিষ বাইরে চলে গেল, বাইরের জিনিষ এলো এখানে। তাই মানুষের আনাগোনা কমে না। পিছনের একটা হলে গান-বাজনা হয়, আর একটায় নাচ। সকলের পিছনে তাস-দাবা ইত্যাদি, এবং আড্ডা জমানোর জায়গা। ফুল-লতা-পাতা ও সাইপ্রেসের আলো-আঁধারি উপবনে অহরহ দেখবেন মেয়ে-পুরুষ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, গান গেয়ে গেয়ে উঠছে। খালের উপর ছোট ছোট নৌকো বেয়ে বেড়াচ্ছে; ক্ষণে ক্ষণে নৌকো বেমালুম হয়ে যায় সাত-সাঁকোর তলায়।

ইস্কুল আছে কাছাকাছি কোথাও। ছুটি হয়ে গেছে, বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা বাড়ি ফিরছে। এস গো—একটু আলাপ করি তোমাদের সঙ্গে। কি বুঝল কে জানে—জোরে হেঁটে সরে পড়বার তালে আছে। সামনে গিয়ে হাসতে হাসতে পথ আটকে দাঁড়াই। হাত ধরব, তা পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে। একেবারে শিশু কিনা—ভয় পাচ্ছে হয়তো আমাদের অভিনব পোশাক ও আলাদা ধরনের চেহারা দেখে। অবশেষে একটিকে ধরে একটু আদর করলাম। পোষা-হরিণের মতো মাথা চেপে রইল গায়ে। নতুন-চীনের ভাবী নাগরিক, দেখ দেখ, কেমন আমার গা লেপটে দাঁড়িয়ে আছে।

যাবার সময়টাও, ভেবেছিলাম, পায়ে হেঁটে হেলতে দুলতে যাওয়া যাবে। কিন্তু হোটেল থেকে এক ভগ্নদূত এসে হাজির হয়েছেন, দন্ত মেলে হাসছেন তিনি।

কি করে টের পেলে ভাই, আমরা এখানে? গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছ?

না এলে ফিরতেন কি করে? বাস নিয়ে এসেছি, হয়ে গিয়ে থাকে তো উঠে পড়ুন।

সবাই চটে উঠলেন। কক্ষণো না। বিস্তর ঘুরবো আমরা। তোমার বাসে তুমিই চড়ে ফিরে দাও।

আমি ভেবে-চিন্তে ক্রোধ সম্বরণ করে নিই। পরাঞ্জপের সময় হয়ে এলো—ওদের সঙ্গে আমার টহল দেওয়া চলবে না। অত বড় বাসখানায় তবু যা হোক একটি চড়নদার হল—একেবারে শূন্যগর্ভ ফিরতে হল না।

সন্ধ্যায় একা হোটেল-ঘরের মধ্যে। কি করি, কি করি! বোতাম টিপে ওয়েটারকে ডেকে কফির অর্ডার তো দিই সর্বাগ্রে। আঙুর-আপেল-চকোলেটের ছোট টেবিলটা ঘড়-ঘড় করে টেনে নিলাম পাশে। এবং তিন-চার দিনের জমে ওঠা খবরের কাগজ।

দরজায় ঠক-ঠক। আসুন, ভিতরে চলে আসুন। আসা হল তবে সত্যি সত্যি?

কি মুশকিল—পরাঞ্জপে নয়, চক্রেশ জৈন। ব্রজরাজ কিশোর কিছু সওদা করতে দিয়েছিলেন বুঝি মেয়েটার কাছে—একগাদা জিনিষ নিয়ে এসেছে। তড়বড় করে এক নিশ্বাসে বলে, নেই বুঝি তিনি? এগুলো তাঁর খাটের উপর রেখে যাচ্ছি। বলবেন।

আমাকেও তো কেনাকাটা করে দেবে বলেছিলে—

দেবো, দেবো। কথা বলতে পারছি নে এখন। এগুলো রইল। আবার আসব আমি। কেমন?

এই গতিক মেয়েটির। জমিয়ে বসল তো উঠবার নাম নেই। নয় তো ঝড়ের বেগে উড়ে উড়ে বেড়াবে এমনি। কফি এসে পড়েছে। চুমুকে চুমুকে তা-ও এক সময়ে শেষ হয়ে গেল। সাতটা বেজে যায়, আজকেও তো আসার গতিক দেখিনে। চাই যে আমার পরাঞ্জপকে। কুয়োমিনটাং পিঠটান দিল, পাঁচতারার নিশান উড়ল এই পিকিন শহরে—সমস্ত তাঁর চোখের উপরে ঘটেছে। সেই সব গল্প শুনতে চাই তাঁর নিজ মুখ থেকে।

এলেন পরাঞ্জপে শেষ পর্যন্ত। নানান কাজে দেরি হল। কিন্তু এখানে নয়—এ জায়গায় হবে না। আমার বাড়ি চলুন।

খাওয়ার সময় হয়ে গেল যে!

খাওয়াটা আমার সঙ্গে হবে। সে অবশ্য না খেয়ে থাকারই সামিল। এদের রাজসূয় যজ্ঞের সঙ্গে পাল্লা দেবো কেমন করে?

রাস্তার উপরে এসেছি দু-জনে। পরাঞ্জপের সাইকেল আছে, সাইকেলে যাবেন উনি। হাত নাড়তে সাইকেল-রিক্সা এসে দাঁড়াল আমার জন্য। আগেকার মানুষ-টানা রিক্সা এখন বাতিল। একটু কথা হল রিক্সাওয়ালা ও পরাঞ্জপের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম, কত নেবে?

দু' হাজার ইয়ুয়ান—

অর্থাৎ আমাদের প্রায় সাত আনা?

পরাঞ্জপে হেসে বলেন, কারেন্সির জটিলতা আপনি বেশ সড়গড় করে নিয়েছেন দেখছি—

কিন্তু দরাদরি করতে হল—এই যে ওরা দেমাক করে, সব জিনিষের বাঁধা-দর।

পরাঞ্জপে বললেন, রিক্সার বেলা চলে না। কোথায় কোন্ অলিগলিতে কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে, হিসেব করে তার দর বাঁধা চলে না। কিন্তু বেশি চায় না এরা। চেয়েছিল আড়াই হাজার। পথ ভাল করে বুঝিয়ে দিতে নিজেই দু'-হাজারে নেমে এলো।

এখানকার রিক্সায় এক জনের বসবার জায়গা। রিক্সা যাচ্ছে, সাইকেল চেপে পরাঞ্জপে চলেছেন আমার পাশে পাশে।

ডায়েরিতে লেখা আছে দেখছি, 'স্মরণীয় রাত্রি!' তার এই শুরু হয়ে গেল। পরাঞ্জপে না হলে রিক্সা চড়ে পিকিনের অচেনা গলিঘুঁজি দিয়ে যাওয়া হত না কখনো। পরাঞ্জপের পাশাপাশি এই রকমারি গল্প শুনতে শুনতে যাওয়া।

গলিপথও ঝরঝরে পরিষ্কার। কে যেন একটু আগে ঝাঁটপাট দিয়ে গেছে। পরিচ্ছন্নতা মানুষের স্বভাব হয়ে গেছে। তিনটে বছর আগেও, কি আর বলব, বিদেশি মানুষ এমনি রিক্সা করে যাচ্ছেন—ভিখারির দল পঙ্গপালের মতো ছুটত পিছু পিছু। এখন একটা ভিখারি খুঁজে বের করুন দিকি! এই রিকশাওয়ালারাই কি কান্ড করত লোকের সঙ্গে! টানাটানি, মারামারি, এক-রকম বলে গাড়িতে তুলে শেষটা অন্য রকম কথা—বিশেষ করে বাইরের লোক হলে তো কোন রকমে রক্ষে ছিল না।

আজকের চীনে ভিখারি নেই, পতিতা নেই। হাজার হাজার বছরের সামাজিক পাপ নাকি ঘণ্টা পাঁচ-ছয়ের মধ্যে সাফ-সাফাই। আরব্য উপন্যাসকে হার মানিয়ে দেয়। কিন্তু আজকে থাক, সে গল্প আর একদিন।

মুক্তি-সৈন্য ঘিরে ধরেছে পিকিন শহরকে। নানান দলে ভাগ হয়ে তারা আসছে। এসে পড়ল বলে। পাঁচ-সাত-দশ দিন বড় জোর—তার ওদিকে কিছুতে নয়। মানুষে কিন্তু তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না—ওদের হল বওয়া ঘাড়, এমন বিস্তর দেখা আছে। এই সেদিন অবধি গোটা চীনের তিন ভাগের এক ভাগ জাপান দখল করে বসে ছিল। পিকিন শহরটাই কতবার হাতফেরতা হয়েছে, বিবেচনা করুন। লড়াইয়ে হেরে জাপানিরা সরে পড়ল তো কুয়োমিনটাং প্রভুরা আবার গদিয়ান হলেন। এ'রাই বা কি রামরাজত্ব রেখেছেন গো! এর উপর কমিউনিস্টরা এসে কি করে, দেখা যাক। ঘা খেয়ে খেয়ে এমনি দার্শনিক নির্লিপ্ততা এসেছিল সকলের মধ্যে। চিয়াঙের সৈন্য মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। লড়াই করে না তারা, লড়াই করবার কারণ খুঁজে পায় না। বাইরে থেকে ভারে ভারে হাতিয়ার ও রসদপত্র আসছে—খবরাখবর নেয়, কবে এসে পে'ছিবে সেগুলো। তার পরে ষোলআনা রণসাজে সজ্জিত হয়ে টুক করে উল্টো দলে ভিড়ে যায়। চিয়াঙের হাতিয়ারপত্র চিয়াঙেরই দিকে তাক করে। সাধারণে রসিয়ে রসিয়ে এই সমস্ত গল্প করে, ভারি যেন এক মজার ব্যাপার! পথে ঘাটে লোক-চলাচল বেশ আছে—দোকানিরা একটু দেখেশুনে দোকান খোলে, এই যা। আর এক অসুবিধা—বাইরের জিনিস খুব কম আসছে শহরে। বাজারে তরিতরকারি মিলছে না। কয়লারও বড় টানাটানি।

পরাঞ্জপে যেমন-যেমন বললেন—তাই লিখছি। আরও একজন ছিলেন—অধ্যাপক উ সিয়ো-সিনিকা। তিনিও নিমন্ত্রিত—এক সঙ্গে খানাপিনা হবে, পরাঞ্জপের বাড়ি আগেভাগে এসে বসে ছিলেন তিনি আমার জন্য। শান্তিনিকেতনে ছিলেন এক সময়ে—হাস্যমুখ আনন্দময় মূর্তি। এ'র স্ত্রী উত্তম বাংলা জানেন—শান্তিনিকেতনে থাকার সময় নাম পেয়েছিলেন পার্বতী দেবী।

মুক্তি-সেনারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় রেডিওয় বলছে, আত্মসমর্পণ করো চিয়াঙের দল, প্রাচীন মহিমময় পিকিন—বোমা ফেলব না আমরা ওখানে, একটি ইটের টুকরো নষ্ট হতে দেবো না। আপোষে অস্ত্র ফেলে দাও নগররক্ষীরা।

নাগরিকদের অভয় দিচ্ছে, তোমাদের সেবক আমরা। কোন ভয় নেই। কুয়োমিনটাং নিন্দেমন্দ ছড়াচ্ছে—কান দিও না ও-সমস্ত বাজে কথায়।

পালানোর হিড়িক বড়লোকদের মধ্যে। কর্তাদের পেয়ারের মানুষ —জীবন ও টাকাপয়সা নিয়ে সরে পড়তে পারলে হয়। এরোড্রোম শহর থেকে খানিকটা দূরে—দমদম যেমন আমাদের কলকাতা থেকে। বড়-রাস্তায় সেই সময়টা দিনরাত দেখতে পেতেন, মোটরের পর মোটর ঊর্ধ্বশ্বাসে এরোড্রোমে ছুটছে। প্লেন হরবখত আসছে যাচ্ছে, আকাশে অবিরত আওয়াজ।

এরই মধ্যে শোনা গেল, এরোড্রোম থেকে বেশি দূরে আর নেই মুক্তি-বাহিনী। সে কি কাণ্ড! যারা তখনো পালাতে পারে নি, তারা একেবারে ক্ষেপে উঠল। প্লেনের এক-একটা সিটের অবিশ্বাস্য রকম দর—বিদেশি কোম্পানিগুলো দু-হাতে টাকা লুঠছে এই মওকায়। বড় বড় ইমারৎ শ্মশান-ভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছে, শৌখিন জিনিষপত্রের ছড়াছড়ি এখানে-সেখানে।

অধ্যাপক উ হাসতে হাসতে বললেন, আমার ভারি মজা সেই সময়টা। দুষ্প্রাপ্য বই—অনেকগুলোর কেবল নামই শুনেছিলাম, চোখে দেখবার ভাগ্য হয়নি—জলের দরে বিকোচ্ছে।

ঘুরে ঘুরে অধ্যাপক বই কিনে বেড়াচ্ছেন। পাঁচ-সাতটা দিনের মধ্যে বিশাল এক লাইব্রেরি। তারই মধ্যে ইদানীং ডুবে থাকেন। ভাগ্যিস গোল-মালটা ঘটেছিল, নইলে সারা জীবন ঢুঁড়েও তো এমন সব বস্তুর নাগাল পেতেন না।

শেষটা শহরের ভিতরে, ঐ পিকিন হোটেলেরই কাছাকাছি, মাঠের উপরে প্লেন উঠানামা করছে। উপায় কি—যা হবার হোক, এরোড্রোম অবধি যাওয়া কোন মতে সাহস করা যায় না। অবস্থা ক্রমশ আরও সঙিন হল—আলো আর কলের জল বন্ধ। কি কষ্ট লোকের! জ্বালানি নেই; কুয়োর জল তুলে রান্না-খাওয়া। কেরোসিন যৎসামান্য মেলে—সন্ধ্যা হতেই চতুর্দিক অন্ধকার। অথচ পাওয়ার-হাউস কিম্বা ওয়াটার-ওয়ার্কসের ত্রিসীমানায় আসেনি তারা তখনো। গোলমাল বুঝে বড় বাবুরা সরে পড়েছেন, দেখাদেখি মেজো-ছোট সকলেই। যন্ত্রপাতিও বিগড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ওরা এসে সহজে আবার চালু করতে না পারে।

মুক্তিসৈন্য তার পর এসে পড়ল ঐ দুই ঘাঁটিতে। সেই সন্ধ্যায় শহরময় আলো জ্বলে উঠল। পরের দিন সকালে কলের মুখে জল। রেডিও বলছে, আলো-জল পেয়ে কুয়োমিনটাঙের সুবিধা হল। কিন্তু তোমরা যে কষ্ট পাচ্ছ

—তোমাদের লোক আমরা। ফয়শালা না হতেই আগে-ভাগে তাই আলো-জল দিয়ে দিচ্ছি।

আর কর্তাদের উদ্দেশ্যে বলছে, রাখতে পারবে না পিকিন; হাতিয়ার ফেলে মিটমাট করো এসে। তিনজিন বন্দরটাও দখল করে নিয়েছে, খবর এসে গেল। পিকিন শহর থেকে সমুদ্রে বেরুবার ঐ পথ। কি হে, এখনো আশা রাখো শহর ঠেকাবার? বাইরে বেরুনো বন্ধ—এবারে যে খাঁচার ইঁদুরের মতো মরবে তিল-তিল করে।

আর ভরসা নেই—কুয়োমিনটাং-সেনাপতি অতএব আত্মসমর্পণ করল। যতই হোক, শাসনকর্মটা বোঝে কুয়োমিনটাং—এরা এতকাল তো খালি লড়াই করেছে, দুঃখকষ্ট সয়ে নিজেদের কথা প্রচার করে বেরিয়েছে মানুষজনের মধ্যে। ঠিক হল, আপাতত এক মাস চলবে কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্টদের এজমালি শাসন-ব্যবস্থা। কাজকর্ম রপ্ত করে নিয়ে তার পরে পুরোপুরি ভার নেবে। কিন্তু তার আর দরকার হয় নি। কুয়োমিনটাঙের মানুষগুলোই শেষ অবধি এদের দলে ভিড়ে গেল। দেশ-গঠনে আজকে তারা তিলেক পরিমাণ খাটো নয় কারো চেয়ে। শান্তি-শৃঙখলায় দিব্যি কাজকর্ম চলে আসছে—শত্রুরা যত জগঝম্পই পেটাক, হাঙগামা বা রক্তপাত হয়নি কোন দিন পিকিন শহরের কোথাও।

পকৌড়ি এলো প্লেটে প্লেটে। আর ব্যাসমে-ভাজা আলুর টুকরো। হাতে-গরম—এক ফুরোচ্ছে, আবার এনে এনে দিচ্ছে। কত দিন পরে স্বদেশি বস্তু জিভে পড়ল! এদের খাদ্য খেয়ে খেয়ে মুখ পচে আছে। এনে দিচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে প্লেট খালি। পাচকটি জাতে চীনা—কিন্তু ভেজেছে ঠিক আমাদের মেয়েদের মতন। পরাঞ্জপে হাতে ধরে শিখিয়েছেন। লোকটা পরিবেশন করছে, এঁটো বাসন সরিয়ে নিচ্ছে—পরনে কিন্তু সদ্য পাট-ভাঙা ধবধবে পোশাক, হাতে ঘড়ি।

তেলে-ভাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার জমে উঠল। ঐ আসে—ঐ আসে—সেই আমলের সব গল্প। আসছে মুক্তিসৈন্য—দেরি নেই, এসে পড়ল বলে—এসে গেছে অত্যন্ত কাছাকাছি, পিকিনের দশ-বারো মাইলের ভিতর।

কয়লার ভারি কষ্ট—সোনা হেন দুর্লভ হয়ে উঠেছে। খাবার এক বেলা

না হলে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকা যায়, কিন্তু হাড়-কাঁপানো শীতে আগুন বিহনে প্রাণ টেকে না। কুয়োমিনটাং দুড়দাড় পালাচ্ছে 'চাচা আপনা বাঁচা' এই মহানীতি অনুসরণ করে। যাবার মুখে বজ্জাতি ভোলেনি। জুত পেলেই রেল-লাইন ভাঙছে, খনি ভরাট করে দিয়ে যাচ্ছে কাদামাটি ও আবর্জনায়। খনিগুলো আগে তো সাফসাফাই করো, কয়লা তুলো তারপরে; রেললাইন ঠিক-ঠাক করে তবে কয়লা-চালানের কথা! কয়লার কড়া রেশন—অল্পস্বল্প যা মজুত আছে, তাতেই চালিয়ে নিতে হবে সকলের।

নানান রকম রটনা—কমিউনিস্টরা এ করছে, তা করছে। যারা বলছেন, প্রত্যক্ষদর্শী নন যদিচ, তবু প্রায় সে নিজ চোখে দেখার সামিল। মাসতুত ভাইয়ের সাক্ষাৎ পিসশ্বশুর—তিনি তো আর মিথ্যে বলবার মানুষ নন। এমনি সব চলছে মুখে মুখে।

তা হলেও—লোকে যে খুব বেশি গা করছে, তা নয়। এক সাবান-কারখানা। কারখানার বড়-দরজায় খিল এ'টে দিয়ে ভিতরে অল্পস্বল্প কাজ চলছে। সৈন্য-দের গতিক ভাল করে না বোঝা অবধি মানুষজন পথে বেরুবে না।

দরজা বন্ধ তো দেয়াল টপকে দু'টি সৈন্য কারখানার উঠোনে লাফিয়ে পড়ল। ফটক খুলে দিল তারা। সর্বনাশ করেছে—মার-কাট লাগায় বুঝি বাইরের দলবল জুটিয়ে এনে! অত দূর করল না—লোভ অধিক-কিছু নয়। টব ভরতি কয়লা ছিল উঠানে—দু-জনে ধরাধরি করে কয়লার টব বের করে নিয়ে গেল। যাকগে, যাকগে—কি আর হবে! নতুন জায়গার এই বাঘা শীতে ধর্মা-ধর্ম জ্ঞান থাকে ? তবু যা হোক, কয়লার উপর দিয়ে গেল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে কারখানায় লোকে দরজায় হুড়কো তুলে দিল আবার।

সন্ধ্যাবেলা এই ব্যাপার—পরের দিন ভোর না হতে আবার দরজা ঝাঁকাচ্ছে। ফাঁড়া কাটবে এত সহজে ? কাল দু-জনে দেখে-শুনে গেছে, পুরো দল এসেছে আজকে। লোকগুলো নিঃশব্দ—মড়ার মতো হয়ে আছে। ঝাঁকানি বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ—দুয়োর ভেঙে ফেলে বুঝি! কার্নিশ বেয়ে উঠে একজনে বাইরে উঁকি দিল। আরে সর্বনাশ—সৈন্যদের প্রভুস্থানীয় একজন দোরগোড়ায়। সাধারণ ফৌজ এসেছিল কাল, তাই চাট্টি কয়লার উপর দিয়ে গেছে। খোদ ফৌজদার মশায়ের শুভাগমনে আজ কারখানার ধুলোবালি অবধি লুঠ হয়ে যাবে। কপালে যাই থাক, রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না তো বিজয়ী

প্রভুকে! দন্তে কিঞ্চিৎ হাসির ছটা বিকীরণ করে আনন্দ-আহ্বান জানাতে হয়, আসতে আজ্ঞা হোক—কি ভাগ্যি আজকে আমাদের!

দরজা খুলে কিন্তু তাজ্জব। কালকের সে দু'টিও আছে পিছনে—কয়লার টব পুনশ্চ বহন করে নিয়ে এসেছে। ফৌজদার বললেন, লজ্জার অবধি নেই—নিজে আমি তাই মাপ চাইতে এসেছি। কয়লা ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বিচার হবে এদের—কি শাস্তি হল, যথাসময়ে আপনারা জানতে পাবেন।

আর ঐ যে বললাম, তিনজিন বন্দর দখলে এসে গেছে—সেই তিনজিনেরই এক ব্যাপার। সৈন্যদের উপর কড়া হুকুম—জিনিষপত্র কিনে সঙ্গে সঙ্গে ন্যায্য দাম দেবে; যে সব বাড়িতে থাকবে, নির্গোলে তার ভাড়া চুকিয়ে দেবে। জনগণের ভাল করতে এসেছি—এইটে যেন সবসময় সকলে বোঝে।

জনকয়েক এক বাড়িতে এসে উঠল। হোটেল ছিল আগে সেখানে। তার পরে যে দিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, কম্যান্ডার বাড়িওয়ালাকে ডাকলেন। দেখে নিন মশায়, আপনার জিনিষপত্তোর সমস্ত ঠিকঠাক আছে কিনা।

ফর্দ হাতে মালিক জিনিষপত্র মিলিয়ে নিচ্ছে। সব ঠিক আছে—একটা মগ শুধু কম পড়ছে। আবার গুণে দেখে, তাই বটে!

যাক গে, কতই বা দাম!

কিন্তু শুনবে না কম্যান্ডার। সৈন্যদের লাইনবন্দি দাঁড় করিয়ে হ্যাভারসাক তল্লাসি হচ্ছে। সেই মগ পাওয়া গেল এক জনের কাছে। কোন কথা নয়—বন্দুক তুলে দুম করে সোজা তাকে গুলি!

এমনিতরো ব্যাপার। মানুষের মনোহরণ করেছে এমনি গোড়া থেকেই। ভারি চালাক—কি বলেন? সকল দেশের প্রভুগণ এবম্বিধ চালাকি শিখে নিন, এই কামনা করি। সৈন্যরা ওখানে উপরওয়ালা নয়—জনসেবক। গটমট মার্চ করে পেঁছিল ধরুন এক গ্রামে। পেঁছেই পোশাক-আশাক খুলে ফেলে দশজনের একজন। সকালবেলা হয়তো বা দেখছেন, জলকাদার মধ্যে চাষাভুষোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ধান কাটছে। কিম্বা কোদাল মেরে রাস্তা বাঁধছে মজুরদের সঙ্গে। শখের ব্যাপার নয়—গাঁয়ে যতক্ষণ আছ, করতেই হবে গাঁয়ের কাজকর্ম। এই হল বিধি। গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার—পুনশ্চ ঐ টুপি-পোশাক না করা অবধি আলাদা করে ধরবার জো নেই।

বৌদ্ধমন্দিরে সেদিন দেখলাম, ভারা বেঁধে মিস্ত্রিরা কাজে লেগেছে। এলাহি ব্যাপার—টাকার শ্রাদ্ধ। কথাটা মনের ভিতর আনাগোনা করছিল, অধ্যাপক

মশায়কে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, নানান দিকে এত জরুরি কাজ আপনাদের—তার মধ্যে মন্দির-মেরামতের শখ আসছে কিসে?

অধ্যাপক হেসে বললেন, জরুরি এটাও—

বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কম্যুনিস্ট দেশ—ধর্মের সঙ্গে লড়াই ওদের, মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভেঙে ভূমি চৌরস করে ফেলছে, এই তো শুনে আসছি বরাবর।

কুয়োমিনটাংদের তাড়াল বটে কম্যুনিস্টরা একাই, তারপরে ডেকেডুকে সকলকে একত্র করে শাসন-ভার নিল। শাসন-ব্যবস্থার নাম নতুন-গণতন্ত্র। কাগজপত্র মেনে নিচ্ছে না, দেশটা কম্যুনিস্ট। সে যাই হোক—প্রতিপক্ষরূপে ভাল ভাল লড়নেওয়ালারা রয়েছে; কোন দুঃখে তবে নিরীহ নির্বিরোধ ধর্ম-ধ্বজীদের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে?

আজ্ঞে হাঁ, ধর্মের সম্বন্ধে মতিগতি ওদের ঐ প্রকার। অধ্যাপক উঁর সঙ্গে বিস্তর ধর্মালোচনা হল—ধর্মের তত্ত্ব নয়, তথ্য। বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক পার হয়ে এসেছি—বিজ্ঞানের গুঁতো খেয়ে ধর্ম কি জোরদার আছে এখন? ধুঁকছে। মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া শক্তির অপব্যয়। এই এক মোক্ষম নীতি মশায় জেনে রাখুন, ধর্ম ও ধার্মিকদের সোয়াস্তি থাকতে দিতে হয়। ধর্ম নিয়ে পায়তারা কষতে গেলে হরেক সমস্যা অহেতুক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সত্যিই অনেক কাজ আমাদের এখন—ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কই?

চীনা জাতটা চিরকালই অধিক পরিমাণে ঐহিক। ধর্ম নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করেনি কখনো। আজকের দিনেও নানান ধর্ম রয়েছে পাশাপাশি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নামটাই শুধু। কনফুসিয়ানরা গুণতিতে সকলের চেয়ে বেশি। বৌদ্ধও বিস্তর আছেন। আছেন তাউ—সাধুসন্ত উদাসীন সম্প্রদায়। মুসলমানরা সংখ্যায় কম—কিন্তু নিষ্ঠা ওঁদেরই সকলের চেয়ে বেশি; মসজিদে নমাজ পড়েন, নীতিনিয়ম মানেন; তাঁরা সংঘবদ্ধও বটে—এক এক অঞ্চল নিয়ে বসতি। উত্তর-পূর্ব দিকে এক একটা জায়গার লোক আগাগোড়া মুসলমান। কিন্তু নাম শুনে মালুম পাবেন না—খাঁটি চীনা নাম, আরবি-পারসির গন্ধমাত্র নেই। চেহারা এবং পোশাকেও পুরো চীনা। সভাশোভনের সময়টা সাদা টুপি পরেন, এইমাত্র দেখেছি। আর নাম করতে হয় রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের—তাঁরাও ধর্ম-কর্ম করে থাকেন। অন্য সবাই—এই আপনি আমি যে পরিমাণ ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাই।

মজা হল একদিন। ভুলে যাব, এইখানে বলে রাখি। ডাক্তার ফরিদিকে জানেন—লক্ষ্ণৌয়ের সেই যে জাঁদরেল ডাক্তার। সম্মেলনে আমার ডানদিকে যিনি বসতেন গো—নিচু গলায় গল্পগুজব হত। একদিন ধরে ফেললাম, আপনি পিকিন-মসজিদে গিয়েছিলেন ডাক্তার সাহেব—

ডাক্তার অবাক হয়ে যান, কে বলল ?

আপনি, পাকিস্তানের ও'রা, নানান দেশের আরও অনেকে, এবং এখানকার মোল্লা-মৌলবিরা একসঙ্গে নমাজ পড়ে এসেছেন। কাগজে ফলাও করে দিয়েছে।

বটে, কোন কাগজে বেরিয়েছে বলুন তো ? দেবেন মশায় কাগজখানা আমাকে; যত্ন করে দেশে নিয়ে যাবো। বাড়িতে কেউ মানতে চায় না, আমি নমাজ পড়তে পারি—এবং পড়ে থাকি কখনো-সখনো। কাগজ মেলে অবিশ্বাসীদের মুখের উপর ধরব...

চীনা কর্তারা বলেন, যার যেমন খুশি ধর্ম-কর্ম করুকগে; ইচ্ছে না হল তো করবে না। নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—স্টেটের কোন মাথাব্যথা নেই এ সম্বন্ধে। ধর্ম এ যুগে কোন জাতকে বাঁচিয়ে রাখবে না—ধর্মোন্মাদনা স্বাভাবিক ভাবেই মারা পড়বে, এই ওরা সার বুঝে নিয়েছে। মুসলমান দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, হাসিখুশিই দেখলাম তাঁদের। মসজিদ গড়বার কথা সরকারকে জানালে এক কথায় জমি পেয়ে যাই; কোন রকম ঝামেলা নেই। শুধু মুসলমান বলে নয়—চার্চের পাদরিও হাত পেতে কখনো নিরাশ হয়ে ফেরেননি। মন্দির-প্যাগোড়া যে আবার ঝকঝকে করে তুলছে—ওসব হল ওদের প্রাচীন পুরুষদের কীর্তি, অতি-বড় গর্বের ধন; সে বস্তু নষ্ট হতে দেবে না। দিন পেয়েছে যখন, মন্দিরের উঠোনের টালিখানা অবধি অবিকল সেকালের মতো করে বসাবে।

খাওয়া-দাওয়া চুকল। দেশি পদও ছিল ক'খানা—পুরি, আলুর দম ইত্যাদি। খেয়েদেয়ে ফের জমিয়ে বসেছি।

শিক্ষার কি অবস্থা এখানে ? ছেলেপুলে ইস্কুলে পাঠাতেই হবে, আইন আছে নাকি এ রকম ?

আইন-টাইন নেই। গোটা দুনিয়া জুড়ে যত মানুষ, তার সিকি ধরুন

এই একটা দেশে। ষেটের বাছা কতগুলি অতএব আন্দাজ করে নিন। আইন করে সবসুদ্ধ এনে জোটালে তো হবে না—তার জন্য চাই বাড়ি বইপত্তোর পণ্ডিত-মাস্টার। বাচ্চা পড়াতে পারেন—এমনি পাকা মাস্টারেরই বেশি অকুলান। লেখাপড়াটা আগে ভদ্রলোকের একচেটিয়া ছিল—চাষাভুষো মুটে-মজুর কিম্বা মেয়েলোকের জন্য ও-বস্তু নয়। ইস্কুলের দায়ঝক্কি কুলানো সাধ্যের বাইরে ছিল সাধারণের। এই সেদিন অবধি শতকরা আশি জনের উপর নাম সই করতে পারত না।

কিন্তু তিন বছরে যা গতিক দাঁড়িয়েছে, শিক্ষা বাবদে আইনের বাঁধাবাঁধি কোন দিন দরকার হবে না। বাপ-মায়েরা ছেলেপুলেদের আপোষে ইস্কুলে নিয়ে দিচ্ছে। কেন দেবে না বলুন! একপয়সা মাইনে লাগে না; বই-খাতা-কলমও দিয়ে দেয় ইস্কুল থেকে। গার্জেন গরিবানা জানিয়ে যদি দরখাস্ত করে, খাওয়ার ব্যবস্থাও মুফতে হয়ে যায়। এর পরে কোন্ আহম্মক তবে ছেলেপুলে ঘরে আটকে রাখবে? এক সংসারে, ধরুন, বিস্তর কাচ্ছাবাচ্ছা—দিনরাত কুরুক্ষেত্তোর। নিখরচায় ঘরবাড়ি ঠাণ্ডা হবে—অন্তত এই বাবদেও বাপ-মায়েরা টুঁটি ধরে ওগুলোকে ইস্কুলে দিয়ে আসবেন। আরও আছে। অবস্থা আজকে এমন হয়ে উঠেছে, ছেলে-মেয়ে পাঠশালায় না পাঠালে বাপ-মা নিচু হয়ে যান দশ জনের চোখে। দেখ, দেখ, অমুকের ছেলে বাড়ি বসে বসে বখামি করে। যেন বিষম এক সামাজিক পাপ!

শুধু ছেলেপুলে বলি কেন, বুড়োরাও ক্ষেপে গেছে। বই পড়া শিখতে হবে, হাতের লেখা লিখতে হবে। ইস্কুলের জন্য ঘরবাড়ি মিলল না তো লাগিয়ে দাও বাড়ির রোয়াকের উপর, কি মন্দিরের চাতালে কিম্বা গাছতলায়। সকাল-সন্ধ্যা-দুপুরে সময় না হল তো রাত দুপুরে। শহরে গাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে এমনি কত অধ্যবসায় আমাদের চোখে পড়েছে। চীনা-লিপি রপ্ত করা—সে যে কি কাণ্ড, আপনারা জানেন। ওখানকার ভাষা-তাত্ত্বিকেরা আদা-জল খেয়ে লেগেছেন, সহজ রাস্তা বের করবার জন্যে। তাঁদের কাজ তাঁরা করতে থাকুন—গাঁয়ে গাঁয়ে ওদিক দেখতে পাবেন, গাছের ডালে পিচ-বোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে, তাতে সেই অক্ষরটা—যার মানে হল 'গাছ'। গরুর পিঠে ঐ রকম 'গরু'-অক্ষর সেঁটে দিয়েছে। পুকুরের ধারে সাইনবোর্ড তুলেছে—তাতে লেখা 'পুকুর'-অক্ষর। দেখে দেখেই কত অক্ষর শিখে ফেলছে এমন। আহা, কত সর্বনাশ হয়ে গেছে এই লেখাপড়া না জানার দরুন! খানিকটা

হিজিবিজি লেখার নিচে সরল মনে টিপসই দিয়েছে—তারপর টের পেলো ক্ষেতখামার সমস্ত বিক্রি করে দিয়েছে মহাজনকে। মেয়ের ফ্যাক্টরিতে চাকরি হবে—আনন্দে মা দরখাস্তের উপর টিপসই দিল। তারপর জানা গেল, টিপ-সইর জোরে মেয়েকে নিয়ে তুলেছে পতিতাবাসে।

বারো বছর বয়সে প্রাইমারি পেরিয়ে ছেলেমেয়েরা ঢুকবে জুনিয়ার মিডল ইস্কুলে। তারপরে সিনিয়ার মিডল ইস্কুলে। বই মুখস্থ নয়। খাবে পরবে, আর দেশব্যাপ্ত পরিগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে সর্ব-শক্তিতে—সেই সমস্ত তালিম দেওয়া হয় ঐ তখন থেকেই। বৃত্তির কাজে উৎসাহ দেয় বেশি। বিস্তর কর্মী চাই, যত সব ছেলেমেয়ে ধেয়ে যাও সেই দিকে। আঠারো বছর অবধি এদিককার পড়াশুনোর পর য়ুনিভার্সিটি। তার পরেও আছে—দুরূহ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা। এসব অতি-মেধাবীদের জন্য, সংখ্যায় তারা কম। সাধারণ ছেলেমেয়েরা উচ্চ বিদ্যার্জনে প্রাণপাত করবে, এটা ওরা চায় না। উপর দিককার ছাত্রের এদিক-ওদিক খরচপত্র আছে বটে, কিন্তু একটু এলেম দেখাতে পারলেই স্কলারশিপ। স্কলারশিপ জুটিয়ে নিয়ে নিজের খরচ-খরচা চালানো শুধু নয়, উপরি দু-চার পয়সা বাড়িতেও পাঠাতে পারো।

তাই বেরুমলের একটা কথা মনে পড়ছে। আমাদের স্বদেশীয় বেরুমল —মরিশন স্ট্রীটের সিল্কের ব্যাপারি। ব্যাপার-বাণিজ্যে সে-কালের মতো জুত নেই, ভদ্রলোক সেই জন্য নতুন গবর্নমেন্টের উপর খাপ্পা। মুখ ফুটে তেমন-কিছু না বললেও—দেশোয়ালি মানুষ তো—ভাবে-ভঙ্গিতে মালুম পাই। এক-দিন তোড়ের মুখে উষ্মা ও বেদনা ভরে বলে ফেললেন, আরে মশায়, চিয়াং কাইশেকের সাধ্যি আছে আর এখানে ঘাঁটি গাড়বার? বিষম চালাক এরা—একেবারে গোড়া ধরে বন্দোবস্ত। যত পড়ুয়া ছেলেমেয়ে দেখতে পান, সবাই নতুন সরকারের নামে পাগল—সবাই নতুন ভাবের ভাবুক। বাচ্চা বয়স থেকে গড়ে-পিটে তুলছে। তোয়াজ কত ছেলেমেয়েদের—ডাইনে-বাঁয়ে স্কলারশিপ ছড়ানো, দয়া করে তুলে নিলেই হল। পড়া শেষ হতে না হতেই কাজ মুকিয়ে আছে। এখন তো এই দেখছেন—আর এই সব ছেলেমেয়ে যখন মুরুব্বি হয়ে উঠবে, সেই ভাবী আমলের আন্দাজ নিন দেখি। তাই তো বলি, তামাম দুনিয়া জোটপাট করে চিয়াংকে যদি আবার গদিতে বসিয়ে দেয়, একটা বেলাও সে এখানে টিকতে পারবে না।

চীনের দক্ষিণ ভাগটা সকলের পরে এসে মিশেছে। সে অঞ্চলে যদিই বা

দু-পাঁচ জন থাকে, আর কোথাও বেকারের নাম-গন্ধ নেই। বরঞ্চ লোকের জন্যই মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি। দেশ গড়ে তোলবার জন্য হাজার দিকে হাজার রকমের কাজ—পোক্ত লোকের অভাবে রামা-শ্যামাকে দিয়ে চালানো হচ্ছে। কাজ-জানা লোক লাখে লাখে এখন দরকার।

(পরাঞ্জপের বাড়ি ছেড়ে মাঝে একটু এখানকার কথা বলে নিই। চীন থেকে সাংস্কৃতিক দল এসেছিলেন। পশ্চিম-বাংলার এক কর্তাব্যক্তি ডেলিগেশনের দলপতিকে শুধালেন, কি আশ্চর্য—এত শিক্ষা ছড়াচ্ছেন, বেকার বাড়ছে না তবু আপনাদের দেশে? আমরা যে মরে গেলাম মশায়—যত উৎপাতের মূলে কাজ-না-পাওয়া বেকার ছোকরাগুলো। দলপতি জবাব দিলেন, শিক্ষা আমরা এলোমেলো ছড়াই নে, রীতিমত তার হিসাব আছে। কি রকম শিক্ষায় শিক্ষিত কত জন কারিগর লাগবে, সব কারখানা তার ফিরিস্তি দিয়েছে; জানা আছে, কত ডাক্তার কত মাস্টার কি ধরনের কত কেরানি চাই। আগামী চার-পাঁচ বছর দেশের কোনখানে কোন গুণের কি রকম কর্মী কত সংখ্যায় লাগবে, সমস্ত ছকে ফেলা হয়েছে মোটামুটি। শিক্ষালয়গুলো সেই হিসাবে ছাত্র নেয়। তাই একটা বিষয়ে পাশ করে দশ-বিশ হাজার বেকার বসে রইল, আর একটা বিষয়ে মোটে গুণীলোক পাওয়া যাচ্ছে না—এমনটা হতে পারে না। কথাগুলো ডেলিগেশন-দলপতির স্বমুখ থেকে শুনেছি।)

গল্পের পর গল্প। হাতে ঘড়ি-বাঁধা, কিন্তু ফুরসৎ কোথা ঘড়ি তাকিয়ে দেখবার? অধ্যাপক হঠাৎ এক সময় উঠে দাঁড়ালেন, আর নয়—যাওয়া যাক এবার।

সর্বনাশ, বারোটা বেজে গেছে যে! পরাঞ্জপে সেই রাঁধুনি লোকটাকে কি বলে দিলেন। রিক্সা এসে পড়ল। আমায় বললেন, আপনার হোটেলে নিয়ে পেঁছে দেবে। সমস্ত বাতলে দেওয়া আছে, কিছু আপনাকে বলতে হবে না।

যেন চীনা ভাষায় ওস্তাদ ব্যক্তি আমি, মনে করলেই গড়গড় করে পথঘাট বুঝিয়ে দিতে পারব। নমস্কার করে রিক্সায় উঠে বসলাম।

রাত্রির এই কয়েক ঘণ্টা আমার মনের উপর দাগ কেটে রয়েছে। সে কি জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নায় ফিনকি ফুটছে! আঁকাবাঁকা অতি সংকীর্ণ পথে নিয়ে চলেছে। আমাদের মোটরগাড়ি বড়, নিতান্ত-পক্ষে মেজো, রাস্তাগুলোয় বিচরণ করে। পরাঞ্জপের উদ্যোগ না হলে পিকিনের গলিঘুঁজি অঞ্চল এমনি ভাবে

দেখা হত না। জায়গায় জায়গায় এমন সরু যে রিক্সার পাশে একটা মানুষের যাবার পথও থাকে না।

নিষুপ্ত শহর। কদাচিৎ একটা-দুটো মানুষ অতিক্রম করে যাচ্ছে আমাকে। তারপরে দেখি, একটা রোয়াক মতো জায়গায় জন পাঁচ-সাত ষণ্ডামর্ক মানুষ গুলতানি করছে। রাত দুপুরে কলকাতা শহরেও অমন দেখতে পাবেন। মানুষগুলো হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায়। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বিদেশি লোক একা একা রিক্সা চেপে চলেছে, কৌতূহলে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ছোটবেলা লুকিয়ে চুরিয়ে ডিটেকটিভ বই পড়তাম (সবাই পড়ে; আপনারাও পড়তেন কি না, যথাধর্ম বলুন)। যত লোমহর্ষক খুন-ডাকাতি-রাহাজানি—দেখা যায়, চীনে বোম্বেটেরাই করছে। অভিভাবকের চটিজুতা ফটফট করে ওঠে—ডাকাত-বোম্বেটেরা সঙ্গে সঙ্গে অমনি জ্যামিতির তলায়। এবং প্রবল চিৎকার—ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান হইলে...। চটিজুতা অতএব নিঃসংশয় হয়েছেন, ছেলেটা অতিশয় সাচ্চা। ফটফট আওয়াজে খুশি জ্ঞাপন করে চটি ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে চললেন দাবার আড্ডায়। জ্যামিতির ঢাকা সরিয়ে বোম্বেটের দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আবার। সে স্মৃতি আজও ঝিকমিক করছে। কি সব সাংঘাতিক গল্প! কি আশ্চর্য বেপরোয়া কল্পনা! নিজে এখন গল্প লিখতে লিখতে লজ্জায় মরি। সাধ্য আছে অমন গল্প রচবার? কারা পড়ে আমাদের এই সব ঘরব্যাভারি জোলো কাহিনী—কেন পড়ে তা-ও জানি না।

চীনের মানুষ সেই তখন জেনেছিলাম। যেমন গোঁয়ার, তেমনি নৃশংস। ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম মানে না। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেয়াড়া জায়গা তবে চীন! বইয়ের মধ্যে ছবিও থাকত বোম্বেটের। মাথার সুদীর্ঘ টিকি—মেয়েদের বিনুনির মতো। কিন্তু চীনা মাটির উপর এই যে এতদিন বিচরণ করছি, সে চেহারার একটি তো চোখে পড়ল না! মুসড়ে যাচ্ছি—ছোট্টবেলার সেই সব ছবি একেবারে ভূয়ো? জাত ধরে বদলে গিয়েছে—তা বলে একটা-দুটো নমুনাও কি থাকতে নেই এত বড় দেশের ভিতর?

দু'ধারের প্রাচীন রহস্যময় বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি। কোন এক চোরকুঠুরির দুয়োর খুলে হঠাৎ ধরুন বেরিয়ে এলো—হাতে ছোরা, মাথায় টিকি, আমার সেকালের ডিটেকটিভ বইয়ের এক বোম্বেটে। অপরিচিত দেশে নিশিরাত্রে নিঃসহায় আমি—পকেটে কোন না দশ-বিশ লাখ

রয়েছে—ছোরাটা সে আমার বুকের উপর এনে ধরল। তারই বা গরজ কি—রিক্সা থামিয়ে সামনে এসে শুধু হাত বাড়ালেই হল। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকব। চেঁচিয়ে সাহায্য চাইব, সে উপায় নেই—কেউ আমার কথা বুঝবে না। কাঁদছি, হয়তো ভাববে চেঁচাচ্ছি স্ফূর্তির চোটে।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। গলি ছাড়িয়ে নির্বিঘ্নে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। বোম্বেটেবর্গের গুঁড়োটুকুও আর পড়ে নেই। বড় রাস্তাও প্রায় জনশূন্য। একটা ট্রাম জোরে হাঁকিয়ে ডিপোয় ফিরছে। তাতে চড়ন্দার দু-চার জন।

হোটেলের সামনে নিয়ে এসেছে—নামতে যাবো, ইসারায় নিষেধ করে। রিক্সা ভাল করে ফুটপাথের গায়ে লাগিয়ে তবে নামতে দিল। ভাড়া মিটিয়ে দেবো—রাত দুপুরে বয়ে নিয়ে এসেছে, কিছু বেশিই ধরে দেওয়া যাক—তিন হাজার?

কথায় তো বুঝবে না, তিনটে আঙুল দেখাই। রিক্সাওয়ালা ঘাড় নাড়ে। মানুষটার লোভ কম নয় তবে—চার? যাকগে, পুরোপুরি পাঁচ হাজারই দেবো না হয়।

পাঁচটা আঙুল দেখিয়েও রাজি করা যায় না, তখন সন্দেহ হল। আমার কথা বুঝতে পারছে না। মনিব্যাগ খুলে পাঁচ হাজারের নোট সামনে মেলে ধরি। কি হে?

রিক্সাওয়ালা তড়াক করে তার সিটে লাফিয়ে বসল। একটু সেলাম ঠুকে সাঁ-সাঁ করে চালিয়ে দিল গাড়ি। এক ইয়ুয়ানও নিল না। পিকিন-হোটেলের সামনে বড় রাস্তার উপর ভুবনপ্লাবী জ্যোৎস্নার মধ্যে হতভম্ব হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। রাগ করে চলে গেল বোধ হয়—আচ্ছা মানুষ!

সকালবেলা পরাঞ্জপেকে ফোনে ধরলাম। কি কাণ্ড মশায়, ভাড়া না নিয়ে সরে পড়ল!

পরাঞ্জপে বললেন, আমার লোক ভাড়া দিয়ে দিয়েছিল রিক্সাওয়ালাকে ডেকে আনবার সময়। একবার ভাড়া নিয়েছে, আবার আপনার কাছ থেকে নিতে যাবে কেন?

অজানা এক রিক্সাওয়ালা—পথ থেকে এনেছে। পরাঞ্জপের লোকও কোন দিন পাবে না আর তাকে, বিদেশি মানুষ আমি তো নয়ই। আমার চোখের আড়ালে ভাড়া দিয়েছে কি না দিয়েছে—নিষুপ্তরাত্রে কোন দিকে কেউ নেই—আমি নগদ পাঁচ হাজার মেলে ধরলাম, তা মানুষটা চোখ তুলে তাকাল

না একবার। সামান্য সাধারণ লোকগুলোও এমনি যুধিষ্ঠির হয়ে গেছে, আর আপনারা কিনা মুখ সিঁটকে বলছেন—নতুন-চীনে ধর্মকর্ম নেই!

(২৯)

স্বর্গ-মন্দির (Temple of Heaven) দেখতে গেলাম। মন্দির একটি নয়—বড় ছোট অনেকগুলো। মন্দিরের লাগোয়া বিস্তর কুঠুরি। শহরের দক্ষিণ ধারে হাজার হাজার অতি-বৃদ্ধ সাইপ্রেস গাছ—বিপুলায়তন গৃহগুলি তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ১৪২০ অব্দে তৈরি—বয়স, তবে তো, পাঁচশ' ছাড়িয়ে গেছে।

একটা হল শস্য-প্রার্থনার মন্দির। পৌষের শেষাশেষি ওদের নতুন বর্ষ। বছরের পয়লা দিনে রাজা গিয়ে আকাশের কাছে হাত মেলে যাচ্ঞা করতেন, ভূরি পরিমাণ ফসল যাতে ফলে। মন্দিরটা তাই আকাশের মতন করে বানানো। ছাতের নিচে নীল রঙের টালি—ঐ যেন হল নীল আকাশ। সেই আকাশ-ছাত দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌদিকে ঘোরানো আঠাশটা থামের উপর—অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র আর কি! ঠিক মাঝখানে ড্রাগনমুখো আরো চারটে থাম—চার ঋতু ওরা। (চীনে চার ঋতু—জ্যোতির্বিষক হিসাবেও তাই বটে!) চার থাম ঘিরে লাল রঙের আরো বারোটা থাম—বারো মাস হল ওগুলো।

সূর্য চন্দ্র বাতাস আর বৃষ্টি—ও'রা হলেন দুনিয়ার চালক, ফসল দেবার কর্তা। পুজো পেতেন ও'রাই। ডাইনে বাঁয়ে অগুন্তি ঘর। মন্দির ছেড়ে উপরমুখো চলে যান পাথরে-বাঁধা প্রশস্ত চত্বর ধরে। উপরে উঠছেন। আরও উপরে—উঠেই যাচ্ছেন—সত্যি সত্যি স্বর্গলোকে উঠে চললেন, এমনি মনে হবে।

অনেক ঘর সেদিকেও। রাজারা এদিকটায় ঘুরে ঘুরে পুজার আয়োজন দেখতেন। ভোগরান্নার ঘর। বলির জায়গা—পশু বলি দেওয়া হত স্বর্গের প্রীতি-কামনায়। পুজোর হরেক জিনিষপত্র—রুপোর প্রদীপ, নানা রকম রুপোর বাসন, হাজার হাজার বছর আগেকার ঢঙে তৈরি। খাবার পাত্র, সুরাপাত্র, মাংস রাখার পাত্র। ফল রাখার ঝুড়ি—সেই কতকাল আগেকার। কত রকমের বাজনা—তারের যন্ত্র, বাঁশি, ঢাক-ঢোল জাতীয় পেটাবার বাজনা। গুণী পাঠক, নানান দেশের রকমারি বাজনা নিয়ে তো নাড়াচাড়া করে থাকেন—

পাথরের বাজনা দেখেছেন কখনো? আজ্ঞে হ্যাঁ—একখানা পাথর মাত্র। তার এখানে-ওখানে ঘা দিন, মিষ্টি আওয়াজ বেরোবে; সেতার-এসরাজ হার খেয়ে যায়। একটা ঘরে নাচের সরঞ্জাম,—হায় রে, পাঁচশ' বছর আগেকার নাচুনে মেয়েগুলো কোথায় ফৌত হয়ে গেছে, তাদের অঙ্গের সাজপোষাক আর পায়ের ঘুঙুর রেখে দিয়েছে কাচের বাক্স বোঝাই করে!

গোল বেদি-ঘর। বেদি হল স্বর্গের প্রতীক—তার সামনে রাজা দাঁড়িয়ে পুজো করবেন। অনেকটা উঁচু গোলাকার জায়গা—তিন থাক পর পর। সকলের উঁচু থাকের উপরে বেদি। বেদির উপর দাঁড়িয়ে কিছু বলুন—আহা, বলুন না, মজা দেখবেন—চতুর্দিক থেকে শত শত কণ্ঠ আপনার সেই কথা ফিরিয়ে বলবে। এমন মজার প্রতিধ্বনি শোনেন নি আর কখনো।

বেশি মজা আর এক জায়গায়। উঠানের একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আওয়াজ করুন—দূর থেকে একবার প্রতিধ্বনি আসবে। পরের পাথরখানায় গিয়ে করুন দিকি আওয়াজ—প্রতিধ্বনি দু-বার। তার পরের পাথরে—তিন বার। আওয়াজ করে পরখ করে দেখে তবে এই লিখছি।

গোল পাঁচিল আছে বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তার একটা প্রান্তে গিয়ে পাঁচিলে মুখ করে ফিসফিসিয়ে বলুন তো কিছু—দূর প্রান্তের অপর জন সব কথা শুনতে পাবেন। টেলিফোন করেন যেমন ধারা। কোন আমলের কথা—ধ্বনিবিজ্ঞানের যাবতীয় কচকচানি সেই তখনই মাথায় এসেছিল ওদের। আর মাথায় আসার ব্যাপারই শুধু নয়! বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিহনে এমন সূক্ষ্ম হিসাবের বস্তু কোন্ কায়দায় গড়ে তুলল—তাজ্জব হতে হয় কিনা বলুন!

উনিশ শতকে একবার বাজ পড়ে মন্দিরের অনেকটা ভেঙে যায়। আগাগোড়া মেরামত হয়েছে ঠিক পুরানো ধাঁচে। জ্ঞানী-গুণীরা ঠাউরে বলেন, আমাদের সাঁচির আদল আছে মন্দিরের কতকগুলো গেটে। তখন তো ভারি দহরম-মহরম আমাদের সঙ্গে—প্রভু বুদ্ধের নীতিধর্মের সঙ্গে আমাদের শিল্প-রীতিও চলে গিয়েছিল হিমালয় পার হয়ে। যেতে যেতে এই পিকিনে এসে হাজির হয়েছে। পিকিন ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর গিয়েছে, শুনলাম। ওসব দেশে থেকেও এসেছে আমাদের এখানে। এমনি লেনদেন চলেছে আদিকাল থেকে।

শান্তি-সম্মেলন দোর্দণ্ড বেগে চলছে। শুধু মাত্র বক্তৃতা নয়—বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে আর যা হচ্ছে, চোখ শুকনো রাখা দায় হয়ে ওঠে অনেক সময়।

আমেরিকার প্রতিনিধিরা একটা চারাগাছ দিল কোরিয়ানদের। সমুদ্র-পার হতে বয়ে নিয়ে এসেছে। এই চারা নিয়ে পুঁতো তোমাদের দেশের মাটিতে—প্রসন্ন বায়ু ও সূর্যালোকে গাছ বড় হবে, ছায়া, শান্তি ও আনন্দ দান করবে। আরও তারা দিল ফুল, কাপড় আর কম্বল। আমেরিকান সৈন্য বোমা ফেলে মানুষ মারছে, ঘরবাড়ি চুরমার করছে—আর সেই রণজর্জরদের কম্বল বিলোচ্ছে আমেরিকারই মানুষ।

ভারত ও পাকিস্তানের যুক্ত-ঘোষণা পড়া হল একদিন। মারামারি-কাটাকাটি করব না ভাই সকল, নিজেদের মাঝে। সকল বিরোধের আপোষনিষ্পত্তি করব। লড়াই দুনিয়ার কোথাও আর হবে না। বিশেষ করে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের আমরা সবে মাত্র স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে ধরেছি—আমাদের মধ্যে নৈব নৈব চ। বিস্তর সুহৃদজন উতলা হয়ে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছেন,—চোখ টিপে দিলেই টাকাকড়ি আর অস্ত্রসম্ভার নিয়ে পড়েন;—কিন্তু খবরদার, খপ্পরে পড়েছ কি বিলকুল খতম! কাশ্মীর এবং অন্যান্য গোলমাল জিইয়ে রেখে তৃতীয় পক্ষই সুবিধা করে নেবে। কোন রকম আস্কারা দেবো না তাদের।

তাই দু-তরফে ভেবেচিন্তে শান্তি-চুক্তির খসড়া হয়েছে। কো-মো-জো ঘোষণা করলেন, চুক্তিপত্রে সই হচ্ছে এবারে। ঘর ফেটে যায় এমনি হাততালি। ঘোষণা পাঠ করলেন এক ডেপুটি-সেক্রেটারি। গম্ভীর বাজনা। সইয়ের জন্য ডাক হল প্রধানদের। চলেছেন ভারত-দলের নেতা ডক্টর কিচলু ও পাকিস্তান-দলের নেতা পীর মানকি শরিফ পাশাপাশি হাতধরাধরি করে। হল সুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। (তালে তালে দীর্ঘক্ষণ ধরে হাত পড়ত। তার শেষ নেই। পাকিস্তানের আতাউর রহমান সাহেব আর আমি বলাবলি করতাম—ছাদ পেটানো। অবিকল সেই আওয়াজ) প্লাটফরমের সামনে অবধি একত্র গিয়ে দু-দল দু-দিক দিয়ে উপরে উঠলেন। সই হয়ে যাবার পর কিচলু ও পীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন পরস্পরকে। এ দিকেও কি মাতামাতি আমাদের দু-দলের মধ্যে! পাকিস্তানের মেয়েরা ফুল ছড়াচ্ছেন আমাদের দিকে। আমাদের মেয়েরা ওদিকে। এ তরফ থেকে ও-দলের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে, ও-তরফ থেকে এই দলে। ডক্টর কিচলু পীরকে উপহার দিলেন গালার কাজ-করা কাশ্মীরি বাক্স আর সিল্কের উপরে 'পিকিনের গ্রীষ্মপ্রাসাদ'-বোনা ছবি। পীর কিচলুর মাথায় পরিয়ে দিলেন জরিদার টুপি (পাঞ্জাব অঞ্চলে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন ওটা), আর চীনের কারুকর্ম-করা কাঠের বাক্স। এদিকে

পাকিস্তানিরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়লেন ভারতীয়দের মধ্যে। কোলাকুলি প্রচণ্ড আবেগে। পাকা দাড়িওয়ালা সৈয়দ মুত্তালাবি—পাক-পাঞ্জাবের নাম-করা কবি, আমাদের সর্দার পৃথ্বী সিং-এর সুদীর্ঘ কালের বন্ধু। দেখলাম, দু-চোখে জল গড়াচ্ছে বুড়োমানুষটির। দেশ ভাগ হবার সময় এতদূর ধারণায় আসেনি—আজকে নাড়ি-ছেঁড়া টান মর্মে মর্মে বুঝছি সকলেই।

(৩০)

সম্মেলন চলে সকাল, বিকাল এবং কখনো কখনো রাত্রে। তার উপরে কমিশন আছে। কমিশনের মীটিং সারা হতে এক-একদিন রাত্রি দুটো-তিনটে বেজে যায়। ব্যাপারটা তাই ভয়ের হয়ে উঠেছে, জুত পেলেই ডুব দিই। আমি আছি সাংস্কৃতিক লেনদেনের কমিশনে। প্রস্তাব তৈরি হচ্ছে ঐ সম্পর্কে—তাই নিয়ে তর্কাতর্কির অবধি নেই। কমিশনের সভাপতি ভারতীয়—আলিগড়ের ডক্টর আবদুস আলিম। মনে পড়ছে না? কি বলেন, আপনাদের সঙ্গে অনেকবার মোলাকাত হয়ে গিয়েছে তো! রাত দুপুরে পীত-সাগরের কনকনে হাওয়া দিয়েছে—ঘরে গিয়ে লেপের তলে ঢুকতে পারলে বাঁচি, প্রস্তাবটাও পাশ হয়ে যায়-যায়—হেনকালে কোত্থেকে এক নতুন ফ্যাচাং তুললেন ব্রেজিলের ভদ্রলোক। লড়াইবাজ (warmonger) কথাটা খুব চালু—তার দেখাদেখি আমরা ভদ্রলোকের নাম দিয়েছিলাম শান্তিবাজ (peacemonger)।

উৎকর্ণ হোন পাঠক সজ্জন—এই অধম এবারে মঞ্চারোহণ করছেন। দেশ-বিদেশের তা-বড় তা-বড় লোকের বক্তৃতা শুনলেন—গোটা দুনিয়া দু-আঙুলে চোখের উপর তুলে ধরেন তাঁরা, বলেনও খাসা—বিস্তর জ্ঞানলাভ হয়। আমি সাহিত্যিক ব্যক্তি নিতান্ত সাদামাঠা কথা বলব, শুঁকে শুঁকে নাক ক্ষয়ে ফেললেও পাণ্ডিত্যের গন্ধ পাবেন না তার ভিতর।

জবানটা বাংলায় ছাড়ি, কি বলেন? বেশির ভাগ লোক নিজ নিজ ভাষা শুনিয়ে দিচ্ছে—আমার কি লজ্জা, আমার ভাষা কম নয় কারো চেয়ে! কর্তাদের জানানো হল যে বাংলায় বলব। তা বেশ তো, আপত্তির কি আছে? তবে বক্তৃতার একটা ইংরেজি তর্জমা দিতে হবে কয়েকটা দিন আগে। তাই থেকে আরও তিনটে ভাষায় তর্জমা হবে—সে কাজ ও'রাই করবেন। মূল বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আরও চারটে ভাষায় সমান তালে ছাড়া হবে—ইংরেজি,

চীনা, রুশ ও স্প্যানিশ। আপনারা নয়ন ভরে বক্তার হাত-মুখ নাড়া দেখুন—আর যে ভাষাটা বোঝেন, তাতেই বক্তৃতা শুনে যান যথাস্থানে হেড-ফোনের প্লাগ ঢুকিয়ে। শুনতে না চান, সে কায়দাও বাতলে দিয়েছি আগে।

কিন্তু বাংলা বলেই মুশকিল হয়েছে। ভাষাটা ও'দের মধ্যে কেউ জানে না। তাই বাংলা-জানা এক জনকে চাইল বুঝে-সমঝে দেবার জন্যে। নইলে হয়তো দেখবেন, বক্তৃতা চুকিয়ে আমি প্লাটফরম থেকে নেমে গেলাম, স্প্যানিশওয়ালা ভীমবেগে ছেড়ে যাচ্ছেন তখনো। বাংলানবিশ গিয়ে তালিম দিয়ে দেবেন, মূল-বক্তৃতা ধাপে ধাপে কখন কদ্দূর এগুলো। তর্জমাগুলো যথাসম্ভব সেই বেগে ছাড়বে। আমাদের নন্দী গেলেন এই কাজে—ফিরে এসে তাজ্জব বর্ণনা দিলেন। এলাহি কাণ্ড ভাই, দস্তুরমতো অফিস বসিয়েছে, শ'খানেক লোক খাটছে। বক্তৃতাদি চারটে ভাষায় এক সঙ্গে প্রচার করা, সমস্ত লেখার অনুবাদ করে সঙ্গে সঙ্গে কাগজে পাঠানো, নিজেদের সচিত্র বুলেটিন বের করা, পুরো রিপোর্ট বানিয়ে নানান ভাষায় তর্জমা ও টাইপ করে সকলের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া—সমস্ত সমাধা হয়ে যাচ্ছে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে। মানুষগুলোর নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই।

বক্তৃতাটা দিই পুরোপুরি? লেখক হওয়ার এই বড় সুবিধে, আপনারা পাল্লার মধ্যে পাচ্ছেন না। না হয় লাইন চারেক পড়ে ছেড়ে দেবেন—অধিক কি করতে পারেন? কিন্তু মুশকিল হয়েছে, অন্যের বক্তৃতা ভেঙে চুরে পরিবেশন করেছি—নিজের বস্তু আস্ত রাখলে তাঁরা যে মাথায় মুগুর ভাঙবেন। কিছু কিছু বাদ দিয়ে ছাড়ছি, তবে শুনুন—

"ভারতের লেখক আমি—এশিয়া ও প্রশান্তসাগরীয় অঞ্চলের সমাগত বন্ধুজনকে সাদর-সম্ভাষণ জানাচ্ছি। সভ্যতার আদি যুগ থেকে ভারতবর্ষ সর্ব মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এসেছে। ভারতের সৈন্য কখনো পর-সীমান্ত লঙ্ঘন করে নি—শান্তি, প্রীতি ও পরম-আশ্বাসের বার্তা দিকে দিকে পরিকীর্ণ করেছেন ভারতীয় ধর্মাত্মা বিদগ্ধমণ্ডলী। অস্ত্র নিয়ে যারা আক্রমণ করতে এসেছিল, উদার ভারত-সংস্কৃতি গভীর আলিঙ্গনে তাদের অন্তরে গ্রহণ করল। বহু মানবের বিচিত্র সমবায়ে এমনি ভাবে অনেক শতাব্দী ধরে মহিমময় মহা-ভারত পরিগঠিত হয়েছে।

সেকালের সেই শান্তি-দূতদের পদাঙ্ক বেয়ে আমরা আজ সমুদ্র ও পর্বত-পারের পুরানো বন্ধুদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। বহু দুঃখ ও দুর্যোগ

গিয়েছে আমাদের উপর দিয়ে—সেই ঘনান্ধকারে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। আজ নূতন প্রভাত। বৃটিশের কবলমুক্ত আমরা এক সর্বসুখী অভিনব ভারত-রচনায় সংকল্পবদ্ধ। নানা দেশের মানবপ্রেমী নরনারীর এই পবিত্র মহাসংগম থেকে অঞ্জলি ভরে আমরা নূতন আশা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে ফিরে যাবো।

মারণাস্ত্র মানুষ মারে, কিন্তু মন মারতে পারে না। লক্ষ-কোটি মানুষের মন দোলায়িত করি আমরা লেখক-সম্প্রদায়—অসীম আমাদের শক্তি। সাহিত্য আজ মানুষের অতি-কাছাকাছি—বিশিষ্ট কয়েকজনের বিলাসমাত্র নয়। জন-চিত্তে আনন্দ ও জীবনের প্রতি ভালবাসা জাগাবে আমাদের সাহিত্য, তাদের আত্ম-সচেতন করবে। সাধারণ মানুষ সংসার পেতে শান্তিতে থাকতে চায়। তারা আনন্দ চায়, পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অংশভাগী হতে চায়। মুষ্টিমেয় চক্রান্ত করে তাদের কামানের মুখে পাঠিয়ে দেয় নিজেদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। সমাজ-শত্রুদের চিনিয়ে দিক নূতন কালের সাহিত্য—তারা একক, শক্তিহীন সর্বজনঘৃণ্য হয়ে নিশ্চিহ্ন মিলিয়ে যাক। সকল দেশের মানুষ পরস্পর জানাশোনায় প্রীতিপর গোষ্ঠীতে পরিণত হোক।...

রণজর্জর বসুমতী আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আমাদের দিকে। প্রভু বুদ্ধ, অশোক, গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যবাহী আমি ভারতীয় সাহিত্যিক—এশিয়া ও প্রশান্তসাগরীয় জাতিপুঞ্জের সকল লেখকের সংগে সমকণ্ঠে ঘোষণা করছি, আমাদের সুন্দরী শ্যামা ধরিত্রীর রক্তকলংক বিদূরণ করব—এই আমাদের অমোঘ সংকল্প।”

চার-পাঁচটা মাইক এদিকে-ওদিকে। ডাইনের টেবিলে কাচের গ্লাস। ফুলে ফুলে এমন সাজিয়েছে, যেন ফুলবাগানের ভিতর দাঁড়িয়ে। ব্যবস্থা অতি উত্তম। দপদপিয়ে ফ্লাশ-লাইট জ্বলে উঠছে—ছবি তুলছে। কামানের মতন মোভি-ক্যামেরা হাঁ করে গিলতে আসছে এক-একবার। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে; কারা শুনছে, কিম্বা শোনার ভাণ করে ঘুমুচ্ছে—আলোর জন্যে সামনে তাকিয়ে দেখবার উপায় নেই। তা ছাড়া দেখবোই বা কেমনে—মুখের বক্তৃতা নয়, লেখা জিনিষ পড়ে যাওয়া। কাজ শুধু মুখের নয়, চোখেরও।

পড়া শেষ করে হাততালির মধ্যে নেমে এলাম। এক মহিলা সেকহ্যান্ড

করলেন সকলের আগে। তাঁর এপাশে-ওপাশের আরো জন চার-পাঁচ। চোখ ধাঁধিয়ে আছে তখনো, কোন দেশের মানুষ ঠাহর করে দেখিনি। মাঝের রাস্তা দিয়ে ফিরে চলেছি নিজের সিটে। খান তিনেক চেয়ারের ওদিক থেকে অ্যানিসিমভ, দেখি, উঠে এসে হাত বাড়ালেন। এ সমাদরের মানেটা কি? ওজনদার বস্তু নেই, ঐ তো দেখলেন—(সে বুদ্ধি আছে, বিদ্যে ফাঁস হয়ে না পড়ে!)—কোন রকম ধরা-ছোঁওয়া দিইনি। সাহিত্যিকের সামান্য সহজ কথা, তাই তাঁর মনে ধরল?

গভীর প্রীতিতে সেকহ্যান্ড করলেন, পাকিস্তানের মজিবর রহমান। মজিবর বললেন, বড় ভাল বলেছেন দাদা—

মজিবর রহমানের বক্তৃতা হল মাঝে আরো কতকগুলো হয়ে যাবার পর। ইনিও বললেন বাংলায়। ছেয়াশি জন বক্তার মধ্যে বাংলায় মোট দু-জন—পাকিস্তানের মজিবর আর ভারতের এই অধম। ভারি এক মজা হল এই নিয়ে। গল্পটা বলি। এক ভদ্রলোক গুটিগুটি এসে বসলেন আমার পাশের খালি-চেয়ারে। মার্কিন মুলুকের মানুষ বলে আন্দাজ হয়। চুপি চুপি শুধালেন, মশায়, আপনি বলেছেন—আর ঐ যে উনি বলছেন, দু-জনের একই ভাষা নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাংলা।

একই রকম অক্ষর?

এক ভাষা, তা দুই অক্ষর হবে কি করে?

বুক চিতিয়ে দেমাক করি, বাংলার নাম জানো না—কে বট হে তুমি?—টেগোর যে ভাষায় লিখলেন!

কদ্দুর কি বুঝল, মা-সরস্বতী জানেন। আমতা-আমতা করে বলে, সে তো বটেই! কিন্তু উনি এক দেশের মানুষ আপনি অন্য দেশের, অথচ দুটো দেশের ভাষা এক রকম—

বুঝতে পারলে না, বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশ-সেদেশের মানুষ ঐ এক ভাষায় কথা বলে, এক রকম অক্ষর তাদের, মা বলে ভাবে ঐ ভাষাকে, তার জন্য জান কবুল করে। তোমাদের ইংরেজির মতন আর কি!

খুব হাসতে লাগলাম। হাসতে হাসতে স্তব্ধ হয়ে যাই। বাংলা দেশ

দু-টুকরো হয়ে গেছে আজকে। তবু একই ভাষা। বাংলাভাষা বেঁধে রেখেছে আমাদের। রাডক্লিফের খড়্গ মাটি কেটে ভাগ করে দিয়েছে, ভাষার উপরে তার কোপ পড়ে নি। সাতসমুদ্র পারের বিদেশি চোখেও এই ঐক্য ধরা পড়ে গেছে।

(৩১)

সম্মেলন শেষ হয়ে এলো। এটা-সেটা উপহারের জিনিষ আসছে প্রায়ই। এ-সমিতি পাঠাচ্ছেন, ও-ফাক্টরি পাঠাচ্ছেন। যাবে তো চলে এবার—এই ক'দিন কত আনন্দ দিয়ে গেলে, তারই সামান্য স্মৃতি। কিছুই নয়—দেবার সামর্থ্য কি আছে আমাদের? দেশে গিয়ে এই সমস্ত দেখো কখনো-সখনো, তখনই মনে পড়ে যাবে আমাদের কথা।

বাঘা শীত পড়েছে। এখন এই—আর শোনা গেল, দিন কতক পরে বরফ জমবে নাকি পিকিনের রাস্তায়। সুইং একদিন আমার গরম পাজামা বদল করে নিয়ে এলো। কেমন হে, কোন চোর-চূড়ামণিরা খাটের উপর এইসব ফেলে দিয়ে গিয়েছিল কিচ্ছু নাকি তুমি জানো না—একেবারে ভিজে-বেড়ালটি! কী মিথ্যুক মেয়েটা দেখুন, ধরা পড়েও লজ্জা নেই। হাসে—হাসি ছড়িয়ে যত অপরাধ ধুয়ে দেয়।

আজ ক-দিন দেখতে পাচ্ছি জনকয়েক ফিতে-টিতে নিয়ে হোটেলে ঘোরা-ঘুরি করছে। কারা ওসব, কি মতলব—জানো নাকি সুইং?

কিচ্ছু নয়, ওরা শুধু গায়ের মাপটা নিয়ে চলে যাবে।

ইতিমধ্যে ঠাহর হল, নানান দেশের বহুতর ব্যক্তি উত্তম কাটছাঁটের নতুন নতুন পশমি পোশাকে বাহার করে বেড়াচ্ছেন। মাপের প্রত্যাশীরা ভারতীয়দের কাছেই আমল পাচ্ছেন না। হবে-টবে না বাপু, ভাগো। আমাদের পোশাকের বাবদে এক আধলা আর খরচ করতে দেবো না।

শেষটা প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা তাদের। আর দেরি করিয়ে দেবেন না। পিকিন ছাড়বার দিন হয়ে এলো—এর পরে কবে কি হবে? দরজিরা সরবরাহ দেবেই বা কেমন করে?

বলে দিয়েছি তো আমরা—

কার্তিক একাই সকলের সঙ্গে লড়ে বেড়াচ্ছে। দেখুন দিকি, আমাদেরই

মাথা মোটা সর্বব্যাপারে! খুশি মনে দিতে যাচ্ছে, অমন না-না করবার হেতুটা কি? লজ্জা লাগে—বেশ তো, বিস্তর আপত্তি জানানো হয়েছে, এবারে চেপে যান। গোটা দুনিয়ার মধ্যে আমরাই একমাত্র নির্লোভ—সে তো আচ্ছা করে জানান দেওয়া হয়ে গেছে সেই হাতখরচার টাকা ফেরত দেবার ব্যাপারে। আবার কেন? মানুষে আদর করে দিলে না নেওয়াটা অভদ্রতা—সেটা কেন বোঝেন না?

সুইং ইঞা-মি' মুরুব্বিয়ানা করে, সকলের হয়ে গেল, আপনারা ক'জন এত ভোগাচ্ছেন কেন বলুন তো?

ভারতীয়দের কেউ মাপ দেবে না—

ভারতীয় বলবেন না—আপনারা এই ক'টি—

কে দিয়েছে আমাদের দলের? নাম বলো।

মেয়েটা পটাপট অনেকগুলো নাম বলে দিল। বলে, যারা দেয় নি, সেই কয়েকটা নাম বলাই বরঞ্চ সোজা।

তবে আর কি হবে! দরজিকে বললাম, তোমাদের সকলের গায়ে যে পোশাক, তাই আমায় বানিয়ে দাও!

ওরা বলে, এ নিয়ে কি হবে? পরতে পারবে না তো দেশে গিয়ে!

গভীর কন্ঠে বললাম, সেই ভালো। পরলে তো নষ্ট হয়ে যায়—চিরকাল থাকবে তোমাদের এ পোশাক। বন্ধুজনদের ডেকে ডেকে দেখাবো—চীনে এসে ভালবাসা পেয়েছিলাম, তারই সুমধুর স্মৃতি।

বাসে উঠে বসেছি, বিকালের অধিবেশনে যাচ্ছি—সেই সময়ে কারসাজিটা ধরা পড়ে গেল। কী বজ্জাত! একই চাল সকলের সঙ্গে খেলেছে। সকলকে গিয়ে বলেছে, আর সকলে মাপ দিয়ে দিয়েছে, তাদের ঘরটাই বাকি শুধু। খিল-খিল করে হাসছে এখন মেয়েগুলো। মাপ একবার দিয়ে ফেলেছ, হা-হুতাশে ফল কিবা?

বাস দাঁড়িয়ে আছে, এসে পৌঁছচ্ছে না কেন সকলে? সেক্রেটারি ধরের উপর তদারকির ভার। জন তিনেকের পাত্তা নেই। যাত্রীরা গরম হয়ে উঠছেন, ধরও উদ্বিগ্ন। আপনারা কেউ খবর জানেন ওঁদের?

এক ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে নেমে পড়লেন। আমি যাচ্ছি, ধরে নিয়ে আসি। তারপরে ফৌত ব্যক্তিরা হাজির হলেন, কিন্তু যিনি খুঁজতে গেলেন তিনি ফেরেন না। ক্ষিতীশ চুপিচুপি বলে, আমি বলতে পারি দাদা। সকলের

মাপ নেওয়া হয়েছে শুনে বেজার মুখে নেমে গেলেন। উনিও ঠিক মাপ দিতে বসে গেছেন, দেখুনগে।

সত্যি মিথ্যে বলতে পারি নে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বাস শেষটা ছেড়ে দিল। তিনি পরে আসবেন অন্য গাড়িতে। সম্মেলনের কাজকর্ম সারা হয়েছে, শেষ অধিবেশন আজ রাত দুপুরে। নিয়ম মাফিক প্রস্তাব-গ্রহণ সেই সময়। বিকালবেলা এখন বড় কাজ—সবসুদ্ধ একটা গ্রুপ-ফোটো নেওয়া। আরও কিছু টুকিটাকি থাকতে পারে। সেজন্য গা এলিয়ে চলেছি। অন্য দিন হলে—বাপরে বাপ, ঘড়ির কাঁটা ছেলেমেয়েগুলো দাঁড়িয়ে থাকতে দিত এমন হলের বাইরে ?

সকলে গুলতানি করছি। পিছনের মাঠে শুনলাম, চেয়ার সাজানো হচ্ছে ছবি তোলার জন্য। পৌনে চার শ' প্রতিনিধি—কর্মী-উদ্যোক্তাদের নিয়ে মোটমাট শ' পাঁচেক। একটা ছবিতে এতগুলো লোক। এবং চেনা যাবে প্রতিটি মানুষকে। বুঝুন। সারা মাঠের চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাকারে চেয়ার সাজাচ্ছে। সকলের চেয়ারে বসা হবে না, সামনে এক সারি মাটিতে বসবেন, চেয়ারের পিছনে আর এক সারি দাঁড়িয়ে থাকবেন। চার-পাঁচটা ক্যামেরায় একসঙ্গে টুকরো টুকরো ছবি নেবে। পরে জুড়ে গেঁথে কি করবে ওরাই জানে। যোগাড়যন্ত্রের শেষ করতে ঘণ্টাখানেক এখনো।

মন ভারি সকলের। সাইত্রিশটা দেশের মানুষ বারো-বারোটা দিন এক ঘরে পাশাপাশি বসছি। ফাঁক পেলেই বাইরে এসে খাচ্ছিদাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, ছবি তুলছি। ইংরেজি জানো তো গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবো—নয়তো ঠারেঠোরে প্রীতি জানাবো। হলের মধ্যে যতক্ষণ জুড়ে অধিবেশন, হলের বাইরের অবসর-সময় হিসাব করলে প্রায় তার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অবসর-সময়টা বিনা কাজের ভাববেন না, মানুষে মানুষে আমরা চেনা-পরিচয় করি। কালা-ধলায় বাছবিচার নেই, তফাৎ নেই পোশাকআশাকের পার্থক্যের দরুন। পেঁচার মতন মুখ করে নিজ মহিমায় বিচরণ করবেন, কেউ তা হতে দেবে না। শেষবারের মতো একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করে নাও এই বিকালবেলাটা। দুপুর রাতের অধিবেশনে হয়ে উঠবে না, আর কাল থেকে তো একেবারেই ইতি।

হন্দুরাসের মেয়েটার দেখছি আজকে একেবারে সাদামাঠা পোশাক। রোজই রং বদলে বদলে আসত সম্মেলনে। কোনদিন লাল, কোনদিন কালো, কোনদিন বা সবুজ। নজর না পড়ে উপায় ছিল না। খাতায় লেখা আছে তার বর্ণনা—

আমার ঠিক সামনে দু-তিন সারি আগে বসত সে। মাথায় চুলের বোঝা, ঈষৎ সোনালি। চুল বাঁধার ঢং আমাদের মেয়েদের মতো। ফিতে বাঁধত চুলের উপর, আমাদের ইস্কুলের মেয়েরা যেমন বাঁধে। কানে দুল দুলছে—আমার পাঠিকাকুল দেখলে সেই প্যাটার্ন ঠিক পছন্দ করে বসতেন। চুলে ক্লিপ-আঁটা—ওটা আর এখন পরেন না আপনারা, সেকালে পরতেন। আর, বিষম ছটফটে মেয়েটা। সম্মেলনের বিরতি হতে না হতে দেখা যেত পিছনের ঘরে গিয়ে ফল-কেক-স্যাণ্ডউইচ-চা-অরেঞ্জড—হাতের কাছে যা পাচ্ছে, এক নাগাড়ে খেয়ে নিচ্ছে। তারপর এক ছুটে উঠোনে। কিবা রোদ কিবা শীত—পলকের মধ্যে দল জুটিয়ে নিয়ে তর্কাতর্কি হাসাহাসি অথবা ছবি তোলা। আজকেই দেখছি, পরম শান্ত। ভিন্ন দেশের এক সখীর সঙ্গে পপলারের ছায়ায় ধীর পায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ...ভিয়েটনামের একজন এসে সেকহ্যাণ্ড করলেন। সেই ভোজসভা থেকে চেনাশোনা এঁর সঙ্গে। নামটা মনে নেই, দেখা হলেই মধুর হাসি হাসেন। চতুর্নারায়ণ মালবীয় ক'দিন আগে ভারতের তরফ থেকে প্রীতি-উপহার দিয়েছিলেন এই স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের। ভালবাসা আরও এঁটেছে সেই থেকে। ...কত জনে এসে খাতা এগিয়ে দিচ্ছেন, নাম-ঠিকানা লিখে দাও! আমার ছোট্ট খাতাখানাও দুনিয়ার নানান মানুষের নামে নামে নামাবলী হয়ে উঠেছে। যাবেন আমাদের দেশে, যাবেন কিন্তু—হাসি-মাখানো কত অনুরোধ! হায় রে, সমুদ্র-পর্বতের ওপারে সেই সব হাসি-আনন্দ আজকে কত দুর্লভ হয়ে গেছে! খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে নিশ্বাস-ফেলা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

কোন দেশের এক অচেনা শিল্পী হুকুম ঝাড়লেন, দাঁড়াও ওখানে। হোসেন সাহেবের কাণ্ড—দরাজ-ভাবে বলেছেন আমার সম্বন্ধে। অতএব এই ভুবন-মনোরম মূর্তির স্কেচ হতে লাগল। তারপর ছবির নিচে সই করাতে নিয়ে আসেন। শুধু নাম নয়, কোন দেশ কি ঠিকানা—তা-ও। স্কেচ দেখে মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে তো! অবাক কাণ্ড—শিল্পী তা হলে এমন কিছু বড় দরের নন!

কার্তিক প্রায় তুড়িলাফ দিতে দিতে এসে হাত ধরে টানে, দেখে যান—

কি ব্যাপার?

রাতে সম্মেলন খতম হবার মুখে ভারি রকম কিছু দেবে।

জানলেন কি করে?

নজর খোলা রাখতে হয়, বুঝলেন? তাই দেখাবো বলেই তো ডাকছি।

হলের সামনে গাড়ি রাখবার জায়গায় দুটো লরী—ছোট্ট ছোট্ট রঙিন ঝুড়িতে

বোঝাই। হাসি-ভরা মুখ তুলে কার্তিক বলে, আন্দাজ পাচ্ছেন কিছু? ঝুড়িগুলো আমাদের তরে। তবে কোন কোন বস্তু ভরতি হয়ে আসবে, তার এখন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

১২ই অক্টোবরের কনকনে রাত্রি। এগারো দিন ধরে সম্মেলন চলল, আজকে শেষ। কত দেশের কত মানুষ এসে জমেছে! প্লেনে এসেছে, ট্রেনে এসেছে, পাহাড়-সমুদ্র পেরিয়ে জঙ্গলের পথে বুনো জানোয়ারের মতন হেঁটে হেঁটেই বা এসেছে কত দল! উৎসব শেষ করে আমাদের সুন্দরী ধরণীকে রক্তকলঙ্ক-মুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাল থেকে যে যার ঘরে ফিরবার ভাবনা।

খেয়ে-দেয়ে ঘরে ঘরে সবাই তৈরি হয়ে আছি। বড্ড শীত—পশমের পোশাকে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে দুয়োর-জানলা বন্ধ করেও সামলানো যাচ্ছে না। কাগজ-টাগজ পড়ছি, ফলটা-আসটা খাচ্ছি—আর কতক্ষণ রে বাপু? ন'টা বাজল, সাড়ে-ন'টা—এখনো খবর নেই।

আরও এক ঘণ্টা পরে সাড়ে-দশটায় বাসে উঠে কাচের দরজা-জানলা উত্তম রূপে এঁটে গায়ে-গায়ে ঠেসাঠেসি হয়ে বসলাম। শীতার্ত শহর ঘরের ভিতর ঢুকে লেপকাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েছে, পথের নিশ্চল শান্তি বিঘ্নিত করে লাইন-বন্দি আমাদের বাসগুলো ছুটল।

এক বাড়ির খোলা বারান্ডায় আলো। ভিতর থেকে তার টেনে এনে অস্থায়ী আলোর ব্যবস্থা হয়েছে—সেই আলোয় বুড়ো-আধবুড়ো জন দশেক মানুষ সাড়া-শব্দ করে পাঠাভ্যাস করছে। দিনমানে সময় পায় না—সামান্য কাজ-কর্ম করে, গভীর রাত্রের হাড়-কাঁপানো হিমে এই হল বিদ্যার্জনের জায়গা। এমনি কায়দার পাঠশালা আরও দেখেছি। য়ুনিভার্সিটি ও ইস্কুল-কলেজের বাইরে জনসাধারণের উদ্যোগে এই সমস্ত। মানুষ ক্ষেপে উঠেছে লেখাপড়ার জন্যে—নিরক্ষরতার চেয়ে বড় অপমান কেউ সেথায় ভাবতে পারে না।

সাড়ে-এগারোটায় অধিবেশন শুরু, তিনটেয় মোটামুটি শেষ। আবেদন ও প্রস্তাবে মোট এগারোটা। আজব ব্যাপার! নানা মত ও পথের এতগুলো মানুষ—সকলে একমত প্রত্যেকটি প্রস্তাবে। ভাবতে পারা যায়নি, সম্মেলন এত দূর সফল হবে। সমাপ্তি ঘোষণা হল। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বেজে উঠল গম্ভীর মন্দ্রে। তিনশ'-তিরিশ জন তরুণ শিল্পী রকমারি বাজনা নিয়ে তিন

সারিতে এসে উঠলেন প্লাটফরমের উপর। হোপিং ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক—কণ্ঠে কণ্ঠে এই ধ্বনি। বাজনারও সেই সুর।

বাজনা থামতে না থামতে হলের সমস্তগুলো দরজা খুলে গেল একসঙ্গে। খিলখিল খিলখিল হাসি। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল—পাখনা মেলে উড়ে এসে পড়ল পরীদেশের শিশুরা। ফুটফুটে চেহারা ধবধবে পোশাক—রূপ আর উল্লাস ফেটে চৌচির হয়ে পড়ছে যেন। ঝুড়ি ভরতি ফুল প্রতিজনের হাতে। চারিদিকে ফুল ছড়াচ্ছে ছুটোছুটি করে। প্লাটফরমের উপর উঠেছে কতক-গুলো—সেখানেও ফুলের হোলি। বুকে, মাথায়, গায়ে ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘায়েল করে দিচ্ছে। কার্তিক বিকালে এই সমস্ত ঝুড়ি দেখিয়েছিল। ঝুড়ি ওদের অস্ত্রের তূণীর।

আমরাও শেষটা ক্ষেপে গেলাম। ওরাই মারবে, আর পড়ে পড়ে মার খাবো! বিদেশ-বিভূঁয়ে আমাদের অস্ত্রসজ্জা নেই— তা যে ফুল ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের টেবিলে, আশেপাশে মেজের উপর—তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে মারি ওদের। ওরা যখন ফুরফুর করে আমাদের পার হয়ে যাচ্ছে, ওদেরই ঝুড়ির ফুল লুঠ করে ছড়িয়ে দিচ্ছি ওদের মাথায় মুখে। নিজ অস্ত্রে নিজেরাই ঘায়েল।

তার পরে আরও সাংঘাতিক আক্রমণ। ধরছি এক-একটিকে—বুকে টেনে নিচ্ছি। দু-হাতে উঁচু করে তুলে দিচ্ছি আমাদের টেবিলের উপর। টেবিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা হাততালি দিচ্ছে। আর শত শত কণ্ঠের আরাবে বিশাল হল রণিত হচ্ছে—হোপিন ওয়ানশোয়ে! আর ফুলের ছড়াছড়ি; পাহাড় প্রমাণ ফুল জুটিয়েছে—ডালার ফুল, আর ডালা বয়ে নিয়ে এসেছে দেবলোকের এই যত শতদল-পদ্ম। রাত্রির শেষ প্রহরে এইটুকু টুকু বাচ্চারা জেগে বসে রয়েছে, মা-বাপেরাও বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়েছে কেমন!

অফুরন্ত আনন্দের মেলা। ফুল ছড়ানো শেষ হল তো গান। দুনিয়ার তাবৎ ভাষায় যত রকম গান হতে পারে, সব এই একটা ঘরের মধ্যে। আর পেরে উঠছি না গো—চললাম আমরা একটা দল। পূবের আকাশে আলোর আভাস দেখা দিচ্ছে। পালাই।

সভা, সভা, সভা! পাঠশালার পড়ুয়ার মতো সকাল-বিকাল নিয়মিত সভায় গিয়ে বসা চুকল এতদিনে। আমি বাঁচলাম, পাঠকেরাও। প্রশ্রয়-মিশ্রিত

হাসি হাসতেন আপনারা, চোখে না দেখলেও বুঝতে পারি। আহা বলছে ভদ্রলোক—বলতে দাও। শান্তি-সম্মেলন কি প্রকার হয়েছিল, কোন কোন মহাজন কি প্রকার বুকনি ছেড়েছিলেন; কিম্বা ধরুন, মহাচীনের কথা—সে আমলে কেমন ছিল—এখনই বা কি রকমটা দাঁড়িয়েছে;—বইয়ে সব মোটামুটি বেরিয়ে গেছে, পড়ে পড়ে আপনারা ঘুণ হয়ে আছেন। নতুন কি শোনাতে পারি তার উপরে? ঠোঁট নাড়লেই তাবৎ বুঝে ফেলে দেন—জানি তো আপনাদের!

তাক লাগিয়ে দিতে পারি একটা খবরে। সেটা নিশ্চয় জানেন না। ভুবনময় ধুমধাড়াক্কা হল সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে—কিন্তু সাইত্রিশটা দেশের মানুষ আমরা যে এক পরিবারস্থ হয়ে ছিলাম, এ খবর ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির করেনি কেউ। করবার কথাও নয়—এ হল অন্তরের বস্তু। ভাষা বুঝি না—কেউ বলি হিন্দি-বাংলায়, কেউ স্প্যানিশে, কেউ ফ্রেঞ্চ, কেউ জাপানি, কেউ রুশীয়, কেউ চীনা—এবং ইংরেজি বলি অধিকাংশই। কিন্তু ভাষার তফাৎ আটকাতে পারল না। দোভাষি থাকে ভালো, নয়তো সেই অদ্ভুত উপায়ে—যাতে অন্ধেরা দেখতে পায়, কালারা কানে শোনে—সেই উপায়ে আমাদের আলাপসালাপ হত। সাদায় কালোয় তফাৎ আছে, সাদারা পছন্দ করে না কালা আদমিদের, আবার কালোদেরও দারুণ ঘৃণা সাদার উপর—কোন মিথ্যুক রটায় বলুন তো এ সব? ফরাসি ছিল, জর্মান ছিল—এরা সাদা-জাতির মধ্যে মহানৈকষ্য ফুলের মুখোটি। আর কালোর সেরা কালো নিগ্রো বংশাবতংসেরা ছিলেন—যাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে গাত্রবর্ণ বাবদে আমাদেরও আকাশচুম্বী অহংকার এসে যায়। কিন্তু স্বচক্ষে দেখেছি—ঐ মিশকালো মানুষ তিলেক হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে আছে, কুলীন শ্বেত অমনি তার পিঠে থাবা মেরে ভাবনা ভাঙিয়ে দিল। অর্থাৎ, কি হয়েছে? আড্ডা দিই এসো, গুলতানি করি—

কাজের খোঁজই রাখেন আপনারা, কিন্তু যে সময়টা কাজ থাকে না? পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে ভূগোল কমলানেবুর উদাহরণ দেয়; আয়তনেও পৃথিবী কমলা-নেবুর চেয়ে খুব বেশি বড় নয়—এমনি কোন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে এলে মালুম হয় সেই মহাতত্ত্ব। কনফারেন্সের বিরাম-সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা ইত্যাদি সেবন করছি, কেকটা বড় ভাল লাগল তো গুয়াতেমালার মানুষটি প্রেমভরে আধখানা ভেঙে দিলেন, খাও গো—খেয়ে দেখ। সত্যিই এইরকম ঘটেছে একদিন। খানাঘরের একটা টেবিলে উমাশঙ্কর যোশি আর আমি

পাশাপাশি খাচ্ছি—উমাশঙ্কর নিরামিষাশী, আমি নির্বিচার। বাকি দুটো খালি চেয়ারে বসে পড়লেন—একজন সুইস, অন্য জন অস্ট্রেলীয়।

কি খাচ্ছ? কেমন চিজ ওটা—ভাল লাগছে? ওহে বয়, আমাদের দাও দিকি ঐ বস্তু।

তার পরে গল্প—গল্প! তোমার কুলশীল নাড়িনক্ষত্রের খবর বলো, তাঁদেরও শোন আদ্যন্ত। আরে ছাই, ডার্লিং-ডাউনস কি ব্রেন্নার—নামগুলোই কি আগে ভাল করে শুনেছি? এখন তারা সত্যি হয়ে ফোটে চোখের সামনে—সেখানকার মানুষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বলছে।

ফোটো তোলা হত বিরামের সময়। কারা তুলত জানিনে। নিজে আমি যেতাম না—অনেক সময় টেনেটুনে দাঁড় করাতো দলের মধ্যে। ক্লিক করবার ঠিক আগের মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়াল হয়তো এক রঙিন মেয়ে—কিম্বা এক টেকো বুড়ো। কোন দেশের কে, জানবার দরকার নেই—মানুষ, এই তো ঢের! পৃথিবীর উপর গন্ডি কেটে এদেশ-ওদেশ করেছে—এ সব ভেদের কথা ভুলে বসেছিলাম নিখিল মানবজাতির মহামিলনের মাঝখানে।

তাই ভাবি, এত যেখানে স্বতোৎসারিত প্রীতি—মানুষ কেমন করে বন্দুক-বোমা তাক করে অপর মানুষের দিকে? এমন সহজ-সারল্য মানুষের মধ্যে—তাদেরও হিংস্র জানোয়ার বানিয়ে তোলা হয়, সভ্য সমাজ ক্ষমতা ধরেন বটে! সম্মেলনটা বড় বস্তু সন্দেহ নেই—আমার কিন্তু এই লিখতে লিখতে আনন্দময় অবকাশগুলো মনের উপরে বেশি ঝিকমিক করছে।

সমস্ত ইতি করে চলে যাওয়ার সময় এলো এবারে!

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টানা ঘুম দেবো এখন দশটা অবধি। তারপর স্নান ও সেবাদি অন্তে পুনশ্চ ঘুম। চারটেয় উঠে—অতঃ কিম্—তত্ত্বতালাশি করে দেখা যাবে।

তাই হতে দিল আর কি! ওদের ক্লান্তি নেই—আয়েশ বস্তুটি একেবারে ভুলে বসে আছে। আজকেও ঠাসা প্রোগ্রাম। দশটা নাগাত চোখ মেলে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার! কাগজে কাগজে ফলাও করে খবর বেরিয়েছে সম্মেলনের সাফল্যের কথা।

সাড়ে-দশটায় ডেলিগেটদের সভা। কবে ফিরে যাওয়া হবে, কে কোন পথে

যাবেন, যে সব প্রস্তাব নেওয়া হল দেশে গিয়ে তৎসম্বন্ধে কি করা হবে ইত্যাদি। বেলা দেড়টায় বিরাট সভা নিষিদ্ধ-শহরের প্রাসাদ-চত্বরে। এতদিন হলের মধ্যে সকলে মিলে সভা করেছ—পিকিনের অগণ্য নরনারী উৎসুক হয়ে আছে—কি করে এলে বাপু আমাদের খানিকটা শুনিয়ে যাও।

জনারণ্য। সেকালে রাজ-দরবার বসত পাথরে-বাঁধা এই উঠোনে। একতলার সমান উঁচু প্রশস্ত জায়গা সামনের দিকে—ওরই উপর রাজা ও হোমরাচোমরারা বসতেন। একেবারে তৈরি জিনিষ—বড় বড় সভা ডাকতে ওদের কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না।

দু-পাশে মানুষের সমুদ্র—মাঝখান দিয়ে পথ করে দিয়েছে। চলেছি আমরা দলে দলে। সেকহ্যান্ড করবার জন্য পাগল—করছিও। কিন্তু সব জিনিষের সীমা আছে। ইস্পাতের তৈরি হাত নিয়ে আমি নি, এটা রক্ত-মাংসের। হাতের পাতা এক সময় গরম হয়ে ওঠে, অসহ্য মনে হয়। ঠিক-মাঝখান দিয়ে চলি তখন আমরা। দু-দিক দিয়ে তারা বাহু বাড়িয়ে দিচ্ছে, যতদূর লম্বা করতে পারে। নাগাল পাচ্ছে না—একটু...আর একটু...হয়তো বা দেড় ইঞ্চি দু-ইঞ্চি...আর আমরা চলেছি দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেমন ভানুমতীর খেল দেখায়। তিলেক এপাশ-ওপাশ হলে ওদের হাতের কবলে যাবো। সেকহ্যান্ডেরও দরকার নেই—হাত ছুঁতে পারলেই যেন মোক্ষ। আর কি পাষণ্ড আমরা দেখুন—উভয় দিকে কড়া নজর রেখে সন্তর্পণে স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলছি। এইটুকু নিশ্চিন্ত যে লাইন ভাঙবে না মরে গেলেও।

স্বর্গধামে সেকালের রাজা-মহারাজাদের পুণ্য পাদপীঠে তো উঠে পড়লাম। নিচের বিপুল সমাবেশের দিকে নজর হেনে দেখি, কালো কালো নরমুণ্ডে একাকার। সেই কালো জমিনের উপর সাদায় চীনা অক্ষর লিখে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম, লেখাটা হল—'হো-পিন' অর্থাৎ শান্তি। ভিড়ের মধ্য দিয়ে আসবার সময় নজর হয়েছিল—সকলেরই খালি মাথা, তার মধ্যে খামোকা কতগুলো মাথার উপর সাদা টুপি। কি হেতু, বলুন তো? সবজান্তা কেউ কেউ তখন বলেছিলেন, মুসলমান এঁরা—উৎসব-ব্যাপারে সাদা টুপি পরা মুসলমানের রেওয়াজ। তা যেন হল—কিন্তু এই ভাবে যত্র-তত্র ছড়িয়ে থাকার মানেটা কি? মানে মালুম এল এবার। সাদায় সাদায় লেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে—উপর থেকে আমরা সেই লেখা পড়ছি।

ফুল আর শান্তির কবুতর—জাতীয় উৎসবের দিন সেই যেমন দেখেছিলাম।

পারাবতও দুইরকম—জীবন্ত আর ছবিতে আঁকা। জীবন্ত পায়রা মওকা বুঝে জনতার হাত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ল, ঘুরতে লাগল আমাদের মাথার উপর, তার পর আকাশের দূর প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। শান্তির তাৎপর্য বোঝালেন বক্তারা। তারপরে উপহার—সকল দেশের অতিথিরা নানান রকম উপহার দিচ্ছেন নতুন-চীনকে। কো মো-জো আর মাদাম সান ইয়াৎ-সেন হাত পেতে পেতে নিচ্ছেন। উপহার স্তূপাকার হয়ে উঠল। আমার লেখা বই নিয়ে গিয়েছিলাম পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য—প্রাচীন মহানগরের উদ্বেলিত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে সন্নত শ্রদ্ধায় উপহার দিলাম। তারপরে গান—আবেশমত্ত কণ্ঠে আমাদের ক্ষিতীশ গান ধরল।

এই কাণ্ড সন্ধ্যা অবধি। হোটেলে গিয়ে হাত-পা ধোওয়ার সময় দেয় না—পিকিনের মেয়র পেং চেন ভোজে ডেকেছেন। সাতটায় সেখানে। আর পারি না রে বাপু! রক্ষে করো, সমাদরের বেগটা থামাও একটু—দম বন্ধ হয়ে আসে!

খাওয়াটা সান ইয়াৎ-সেন পার্কে। পার্ক মানে শুধু মাত্র মাঠ বিবেচনা করবেন না। নিষিদ্ধ-শহরের ভিতরে এক এলাহী জায়গা। তিয়েন-আন-মেন পেরিয়েই ঠিক সামনে। হাজার বছর আগে মন্দির ছিল এখানে। প্রাচীন সাইপ্রেস গাছ অজস্র। আর আছে ফুল—ফুলে ফুলে রঙের বাহার। আছে বেণুকুঞ্জ ছোট-বড় টিলার উপরে। খাল আর পুকুর—খালের উপর পাথরের পুল, কাঠের পুল। চিড়িয়াখানা মতন একদিকে—বানর, ময়ূর, নানা রকমের পাখী আছে। প্রশস্ত হলওয়ালা পুরানো ঘরবাড়ি—দেয়ালে দেয়ালে বহু বিচিত্র ছবি। জায়গাটা নতুন রকমে সাজিয়ে-গুছিয়ে ১৯৩৮ অব্দে জাতির জনকের নাম জুড়ে দেওয়া হয়। বিকালবেলা দেখতে পাবেন, মানুষ দলে দলে এই মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চিড়িয়াখানা-মিউজিয়াম দেখছে, খেলাধুলা করছে।

পৌঁছবো আমরা হলগুলোর ভিতর—মেয়র মশায় যেখানে টেবিল সাজিয়ে ভোজের আয়োজন করে রেখেছেন। পৌঁছনো কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। এর চেয়ে সেই যে মহাপ্রাচীরে উঠেছিলাম—সে অভিযান অনেক হাল্কা ছিল। যত কলেজের ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে। কান-ফাটানো হাততালি। আর সেই দরবার—সেকহ্যাণ্ড, অন্ততপক্ষে হাতের ছোঁয়া একটুখানি। রক্ষা এই, অতি-বড়

নিয়মনিষ্ঠায় এদের পেয়ে বসেছে। পথের দু-ধারে অফুরন্ত সংখ্যায় গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু সেই যে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে, লোভ যত প্রচণ্ডই হোক, পা সেখান থেকে এক ইঞ্চি এগুবে না। অথচ খড়ি দিয়ে লাইন দেগে দেয়নি কেউ; এইও—হাঁক দিয়ে সপাং-সপাং বেতের আওয়াজও ছাড়ছে না কোন মাস্টার। শাসনের মানুষ কোন দিকে কাউকে দেখতে পাইনে। রেল-স্টেশনেও ঠিক এই ব্যাপার দেখেছি। দলে দলে স্টেশনে যেত সমাদর করে নিয়ে আসতে, অথবা বিদায় দিতে। কিন্তু গাড়ির গায়ে গিয়ে কেউ দাঁড়াবে না, হাতখানেক দূরে সারবন্দি হয়ে সব থাকবে। মাথায় হাতুড়ি পিটলেও সেই জায়গা ছেড়ে কেউ নড়বে না, যেন খুঁটো পুঁতে শক্ত করে পা বাঁধা।

খাওয়া আর কি—হুল্লোড়! ভদ্রলোকে মুখ এবং হস্ত দিয়ে ভোজ খায়—এদের ভোজ খাওয়া সর্বাঙ্গ দিয়ে। ডায়েরিতে দেখছি, ভোজের সম্বন্ধে লেখা রয়েছে—'উঃ, বিষম পচা মাছ আজকের টেবিলে!' এই নাকি ভারি এক উপাদেয় তরকারি! পরম তৃপ্তিতে সকলে পচা গজাল মাছ সাবাড় করছে। খাওয়া কতটুকুই বা—নাচ-গানই প্রবল। নটরাজের প্রলয় নাচন কোথায় লাগে! আমার তাগত নেই এ হেন বীরোচিত আহারের—প্রায় নিরম্বু উপোস সে রাত্রে।

খাওয়ার পরে—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যত রাত হোক আর যত ক্লান্তি লাগুক, যেতেই হবে। মি ল্যান-ফাং সেই যে কথা দিয়েছিলেন—তিনি নামছেন 'কুইফিন সান্ত্বনা' নাটকে। ফাউ হিসাবে আছে নাম-করা কতকগুলো ক্লাসিকাল নাচ-গান। আর দেশ-বিদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন—তাঁদেরও অনেকে নিজ নিজ লোক-সংগীত গাইবেন।

চললাম অপেরায়। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে, তা হোক—হেন শুভযোগ ছাড়তে পারিনে কিছুতে। নাট্যশালার জনক আমাদেরই খাতিরে স্টেজে নামছেন,—চীনে এসে তাঁর অভিনয় না দেখলে ছি-ছি করবেন যে আপনারা!

আরও মজা। যুবতী নায়িকা সাজবেন তিনি। পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো-মানুষ—বিশ-বাইশের সুন্দরী সেজে দাঁড়াবেন। বুঝুন। অপেরা শুধু নয়, ম্যাজিকও দেখে নিচ্ছেন এক পালার ভিতরে।

'নাচ-গানের সন্ধ্যা'—খাসা নাম দিয়েছে আজকের অনুষ্ঠানের। সন্ধ্যা অবশ্য নয়—সে পার হয়ে গেছে ঘণ্টা চারেক আগে। বাজনা, নাচ-গান আর আলোর

বাহার চলল একের পর এক। রকমারি লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, বাচ্চাদের নাচ-গান, শত শত বৎসর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে মুক্তি-সংগ্রাম চলেছে তারই নানা আলেখ্য। ভাল হচ্ছে, খুব তারিপ পাচ্ছে শ্রোতাদের। আমি অধীর ভাবে প্রোগ্রাম ওলটাচ্ছি, মূল-পালা আসবে কখন? কুই-ফির সান্ত্বনা?

এ পালা আজকের বাঁধা নতুন কিছু নয়—পুরো শতাব্দী ধরে এই ক্ল্যাসিক্যাল নাটক দর্শকদের মাতিয়ে আসছে। এর কথা আগে বলেছি, আবার শুনলেও দোষ নেই। চীন প্রবাদের নাম-করা রূপসী হলেন কুই-ফি। ঐতিহাসিক চরিত্র বটে—আমাদের যেমন পদ্মিনী কি নূরজাহান। সম্রাট তাং মিং-য়ুয়াঙের উপপত্নী। সেকালের দর্শক মুগ্ধ হয়ে দেখত রূপমতীর বিলোল-লাস্য—দেখে স্ফূর্তিতে ডগমগ হয়ে ঘরে ফিরত। এখনকার দর্শক ঐ একই পালা দেখতে দেখতে চোখের জল মোছে। অথচ পালার কথাবার্তা প্রায় কিছুই রদবদল হয়নি। আরও তাজ্জব, কুই-ফির পার্ট চল্লিশ বছর ধরে একই মানুষ করে আসছেন—মি ল্যান-ফ্যাং। অভিনয়ের ধারা পালটেছে, মানুষেরও রুচি বদলে গেছে।

কিন্তু এ কি, আজ যে ভিন্ন লোক! প্রথম সারিতে আমরা বসেছি, কুই-ফি স্টেজে এলে তীক্ষ্ম চোখে বারম্বার তাকাই। না, এ মেয়ে কক্ষণো মি নন। একসঙ্গে গল্প-গুজব করেছি, খেয়েছি পাশাপাশি বসে—ঠকালেন শেষ পর্যন্ত? দোভাষিকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি হে—অসুখ-বিসুখ করল নাকি তাঁর?

দোভাষি অবাক করে দেয়, ঐ তো মি। হ্যাঁ, তিনিই—

বলছে যখন, কি আর করি—কিন্তু সংশয় রয়ে গেল। বিলকুল এমন ভোল বদলানো যায় মেক-আপের গুণে? পিকিন ছাড়বার দিন মি ল্যান-ফ্যাং তাঁর লেখা একটা বই দিলেন আমায়। চীনা বই—আমি তার কি বুঝব? শেষ দিকে অনেকগুলো ছবি—বিভিন্ন রূপসজ্জায় মি। মেয়ে-পুরুষ, রাজা-ফকির, বুড়া-যুবা (হামাগুড়ি-দেওয়া শিশু কেবল নয়) নানান চেহারার ফোটো। এঁরা যে সবাই একই মানুষ, ছবি দেখে কে বলবে? তার মধ্যে স্টেজে দেখা সেই কুই-ফিরও ছবি পেলাম বটে!

সেকালে পুরুষেরা মেয়ের পার্ট করত। এই হল অপেরার ঐতিহ্য (সেই রীতিক্রমে মি এখনো মেয়ে সাজেন)। আমাদের যাত্রার মতো। সেকালে আসরে অভিনয়ের মেয়ে পাওয়া যেত না বলেই হয়তো! চীন-ভারত দুই পুরানো

জাতেরই এক গতিক। এখন তিন পালটেছে। কত চাই মেয়ে? গাদা গাদা মেয়ে নাচ-গান-অভিনয় করে বেড়াচ্ছে। কুই-ফি রূপী মি ল্যান-ফ্যাঙের ডাইনে-বাঁয়ে চার-পাঁচ গণ্ডা সখী—তারা সকলেই নির্ভেজাল মেয়ে।

জ্যোৎস্না-প্রমত্ত রাত—মনে মনে বড় সাধ, এই রাতে কুসুমমণ্ডপে কুই-ফি রাজার সঙ্গে আনন্দোৎসব করবে, ভোজ খাবে।—চলল সে মণ্ডপে। সাদা মার্বেলের সেতু চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে, য়ুয়েন-ইয়াং পাখী সাঁতার দিচ্ছে জলে। রঙিন মাছ দেখছে কুই-ফি সেতুর উপর দাঁড়িয়ে, উড়ন্ত বুনো হাঁস দেখছে। হায়, রাজা এলো না, সে এখন আর এক রাণীর অন্দরে। অবসাদে কুই-ফি ভেঙে পড়ছে। সুরার মধ্যে সে সান্ত্বনা খোঁজে। নাচছে—পানোন্মত্ত অবস্থায় টলে পড়ে যায় বুঝি বা! খোজা চাকরকে পাঠাল, কিন্তু সে-ও সাহস করল না রাজার কাছে হাজির হতে। হতাশ কুই-ফি আবার ঘরে ফিরে চলল।

রাত আড়াইটে। বেদনা-বিহ্বল মনে আমরাও হোটেলে ফিরছি। নারী ছিল খেলার সামগ্রী বড়লোকের কাছে। দুর্ভাগিনী কুই-ফি! রূপ হল অভিশাপ, বিলাস-কক্ষ বন্দিশালা।

লিফট থেকে ঘর অবধি গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ব—তা-ও আর পেরে উঠিনে। এত ক্লান্তি লাগছে। সকাল-সকাল উঠতে হবে, কাল ভোরে আমাদের বারো জন চলে যাচ্ছেন। ভারতের নানা অঞ্চলে ঘর, কিন্তু এখানে এসে এক পরিবারের হয়ে গেছি। আবার কবে দেখা হয় না হয়—ঘরবাড়ি ছেড়ে দূর প্রবাসে যেতে হলে মানুষ যেমন করে, ঘরমুখো মানুষগুলো বিকাল থেকে আজ তেমনি মনমরা হয়ে বেড়াচ্ছেন।

(৩৩)

এরোড্রোম অবধি চললাম—আরও যেটুকু তাঁদের সঙ্গ পাওয়া যায়। আলাদা বাসে ফুলের তোড়া সহ পায়োনিয়ার ছেলেমেয়েরা; ফুলের তোড়া দিয়ে আহ্বান করে এনেছিল, তোড়া হাতে দিয়ে বিদায় দেবে। শেষ রাত থেকে দুর্যোগ চলেছে—ঝোড়ো হাওয়া, ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এরোড্রোমের এ-কামরায় ও-কামরায়। সময় পার হয়ে গেল, তবু প্লেনে উঠবার ডাক পড়ে না। কি ব্যাপার? দেখুন না আর কিছুক্ষণ—খাওয়া-দাওয়া করুন বসে বসে, কিম্বা বই-টই পড়ুন।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দিয়ে, যতগুলি হোটেল থেকে গিয়েছিলাম যেটের বাছা ঠিক ততগুলিই ফিরে এলাম। প্লেন উড়বে না—সাংহাই থেকে খবর হয়েছে, আরও খারাপ সেখানকার আবহাওয়া। ফুলের তোড়া যেমন-কে-তেমন পায়োনিয়ারদের হাতে, সিকিখানাও খরচ হয়নি। কেমন, চলে যাচ্ছিলেন বড় অভাজনদের বিভুঁয়ে ফেলে ?

ফিরে তো এলাম। নেমে দাঁড়াতেই আবার বলে, উঠুন—। ব্যাক্‌ট্রিও-লজিক্যাল-মিউজিয়ামে যৎকিঞ্চিৎ নমুনা দেখে আসুন—সভ্য মানুষ আজ কত ক্ষমতা ধরে! বাঘ-ভালুক বন্যা-মহামারী নিতান্তই নস্যি। সেই যে মহা-প্রাচীর দেখে ফিরবার সময় ঝর্ণার জল খেতে দিল না, দুর্গম পাহাড়ের কোন্‌-খানে হয়তো বা বীজাণু-বোমা ফেলে গেছে—সেই থেকে দেখবার ভারি লোভ, কি এমন বস্তু যার নামে গাঁয়ের চাষাভুষো অবধি সন্ত্রস্ত!

খান আষ্টেক ঘর নিয়ে মিউজিয়াম। উত্তর-কোরিয়া এবং চীনের সীমানার মধ্যে যে সব বোমা ফেলেছে, তারই খোলা ও টুকরোটাকরা সাজিয়ে রেখেছে। দোভাষিরা ওৎ পেতে আছে, মানুষ পেলেই বোঝাতে লেগে যায়। কিন্তু মুখের বাক্য নিষ্প্রয়োজন—প্রতিটি বস্তুর পরিচয় লেখা রয়েছে। বোমা মারতে এসে কতকগুলো প্লেন ঘায়েল হয়েছে, বোমাবাজ সৈন্যও ধরা পড়েছে কিছু কিছু। দেয়ালে সৈন্যদের ছবি টাঙানো—আর তারা নিজ হাতে জবানবন্দি লিখে দিয়েছে, তার ফোটো। মূল-দলিল কাচের ডেস্কে তালাবন্ধ। টেপ-রেকর্ডে অনেকের মুখের কথাও ধরে রেখেছে, সেই সব বাজিয়ে শোনাল। সবিস্তারে বলছে, কেমন করে মারণ-যজ্ঞে তাদের নামানো হল। অনুশোচনায় ভেঙে পড়ছে, এ তো লড়াই নয়—নিরীহ নিরপরাধ মানুষ নির্বিচারে খুন করা। কেমন করে সংক্রামক রোগের বীজ ছড়িয়ে গ্রামকে-গ্রাম উৎসন্ন করা হয় সেই কাহিনী খোলাখুলি বলছে তারা।

রাত্রে বলনাচের আয়োজন। বাজনা বাজছে, ডিনারের পর সাজগোজ করে সকলে হলে নেমে যাচ্ছেন। জাতীয় উৎসবের দিন আমি নেচেছি, ও'রা দেখতে পাননি। আজকে কিন্তু ও'রা নাচবেন, আমি মজা করে দেখব।

বেড়ে জমেছে। বর্ণচোরা এতগুলি নৃত্যবিশারদ আমাদের মধ্যে, কে ভাবতে পেরেছে ? পলিতকেশ একজন—বিষম কাঠখোট্টা মানুষ, সামনে যেতে বুক

দুরুদুরু করে—দেখি, কচিকাঁচা এক মেয়ের হাত ধরে নাচের ঠমকে গলে গলে পড়ছেন। হলময় এই কান্ড! মগ্ন হয়ে দেখছি—হায় রে, শনির দৃষ্টি পড়ে গেছে অধমের দিকেও। বসে আছেন যে বড়! সকলকে নামতে হবে, বসে বসে দেখবার এবং দেখে দেখে হাসবার একজন কাউকেও থাকতে দেওয়া হবে না।

কাপুরুষ ব্যক্তি আমি, প্রস্তাব মাত্রেই কপালে ঘাম দেখা দিল। শৈশবে কিঞ্চিৎ সঙ্গীতাভ্যাস ছিল—ভাল লোকের আসরে নয়, হাটের ফিরতি পথে বাঁশতলার অন্ধকারে ভুতের ভয়ে যখন গা কাঁপত। নাচতে পারি, সে গুণের কথাও জেনে ফেলেছেন পাঠককুল। কিন্তু সে হল আমার সেই দশ বছুরে নৃত্যগুরুর চোখের উপর, পথের ভিড়ের মধ্যে—সে জায়গায় সাহস কত! সাজানো আসরে জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে অত সব বড় বড় ঝিকমিকে মেয়ের সঙ্গে পা উঠবে না, পা দু-খানা ধর্মঘট করে বসবে।

অনেক কষ্টে হাত এড়িয়ে থামের আড়ালে আত্মগোপন করলাম। প্রেম-চন্দের ছেলে অমৃত রায়—তাঁর উপরেও হামলা হচ্ছে। কিন্তু নড়াতে পারল না, বেকুব হয়ে শেষটা ফিরে গেল। ভরসা পেয়ে ঐ বীরপুরুষ অমৃত রায়ের টেবিলে গিয়ে বসি। দুটি মেয়ে একটু পরে এসে আমাদের সামনের চেয়ার দুটোয় বসল। থাকো বসে; চেয়ার খালি ছিল, তাই বসেছ—ব্যস! কেউ তাকাচ্ছে না তোমাদের দিকে। আরে মুশকিল, একটি ওর মধ্যে আবার ইংরেজি-জানা—হয়তো বা দোভাষির কাজ করে। বলল, এক পাক নেচে আসুন না আমার এই বান্ধবীর সঙ্গে। ভোজের আসরে বলে না, আমার পাশের লোকের পাতে মিষ্টি দাও—সেই গতিক আর কি! আর অমৃত রায় অমনি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ওঠেন, হাঁ-হাঁ—বটেই তো! আমি তাঁর হিল্লেয় এসে বসেছি, অথচ দরিয়ায় ঠেলে দিচ্ছেন তিনি। হাঁ হাঁ—মোটে নাচেন নি আপনি, যান।

যে-ই না বলা, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অপর মেয়েটা। হাসছে মৃদু মৃদু, হাত বাড়িয়ে দিল। সে হাত ধরলাম না আমি। ইংরেজিনবিশটাকে বললাম, পায়ে ব্যথা আমার—সিঁড়ি থেকে পিছলে পা মচকে গিয়েছে, তোমার বান্ধবীকে বুঝিয়ে দাও—

মেয়েটি কেমনধারা দৃষ্টিতে তাকাল। সে দৃষ্টি এখনো মনে ভাসে। বোধ করি অপমান করা হল তাকে, আমার পক্ষে এক সামাজিক অপরাধ। বসে

পড়ল সে চেয়ারে আবার, আসরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নাচ দেখতে লাগল। টিপি-টিপি আমি উঠে পড়লাম—বিপদের ত্রিসীমানায় আর থাকছি নে।

সিঁড়িতে ডক্টর কিচলুর সঙ্গে দেখা। নামছেন তিনি এতক্ষণে। হেসে বললেন, কি হে, ঘুম পেয়ে গেল এর মধ্যে ?

আজ্ঞে না, পালিয়ে যাচ্ছি—

(৩৪)

যে ক'টা দিন এখন পিকিনে আছি, বাঁধা-ধরা কিছু নেই—এখানে-ওখানে দেখে-শুনে বেড়ানো। একদিন গ্রামে নিয়ে চলো না হ্যাঁ মশায়! শহরে কি তোমাদের খাঁটি চেহারা পাচ্ছি ? চলো একদিন গ্রামযাত্রা দেখে আসি।

সেই বন্দোবস্তই হয়েছে। কাল। এক এক গ্রামে পনের-বিশ জন করে, তাতে যতগুলো গ্রাম লাগে। সকালবেলা বেরিয়ে সমস্তটা দিন টহল দিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরব।

তিন বছরে নতুন-চীন অসাধ্যসাধন করছে। সব চেয়ে তাজ্জব ভূমি-সংস্কার। চীনে পা দেওয়ার প্রথম ক্ষণ থেকে প্রত্যক্ষ করছি, সারা দেশ ঘনশ্যাম রং ধরেছে। ফলাফলটা আরও ফলাও করে বুঝব কাল গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা মোটামুটি শুনে নেওয়া যাক। এক বড় মাতব্বরকে পাকড়ানো গেছে, তিনি কিছু হদিশ দেবেন। চলুন পীস-হোটেলে।

নিচের তলার এক বড় ঘরে ঘিরে বসেছি ভদ্রলোককে।

আমাদের দেশের, ধরুন, আড়াই গুণ জায়গা। চিরকালের নিয়ম ভেঙে এত বড় দেশের ভূমি-বণ্টন কি করে তিনটে বছরের মধ্যে করে ফেললেন, বলুন দিকি ? কোন্ মন্ত্রে ?

তিন বছরে নয়, ওটা আপনাদের ভুল ধারণা। বরঞ্চ বছর ত্রিশেক বলুন। উনিশ শ' একুশ থেকেই এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা হচ্ছে।

জমির ক্ষুধা চাষীমানুষের চিরকালের। নিজের ক্ষেতখামার হবে, আপন জমি চাষ করবে, এই তার সব চেয়ে বড় সাধ। এর জন্যে বিস্তর লড়াই করে এসেছে—চীনের ইতিহাসে দু' হাজার বছর আগেও তার খবর মেলে।

উনিশ শ' উনপঞ্চাশের অক্টোবর থেকে গোটা চীন জুড়ে নতুন ব্যবস্থার চলন হল। কিন্তু আগেও কোন না কোন এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল। ঘাঁটি বানিয়েই সঙ্গে সঙ্গে এমনি ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থা—যাবতীয় পরি-কল্পনার সকলের পয়লা নম্বরে হল এটা। হাতে-কলমে করতে গিয়ে অসুবিধা দেখা দিয়েছে অনেক রকম, বিস্তর কাটছাঁট করতে হয়েছে। গোড়ায় ছোট্ট দাবি,—জমির খাজনা কমানো হোক, সুদ-খরচাও অত দিতে পারব না। দাবি বাড়তে বাড়তে উনিশ শ' ছেচল্লিশে একেবারে মোক্ষম কথা—জোড়াতালিতে হবে না, জমিদারের জমি খাস করে চাষীদের ভিতর বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। লাঙল যার জমি তার। জাপানিরা উৎখাত হল ঐ সময়ে। অনেক জমিদার জাপানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, তাদের জমি কেড়েকুড়ে চাষীদের দেওয়া হল। বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে, ঘাসপাতা আর মুখে তুলছে না। মাও সে-তুঙের সেই কবে থেকে চাষীদের সঙ্গে দহরম-মহরম—তিনি ঠিক বুঝে-ছিলেন, চীনের শাসনভার পাবে সেই দল, চাষীকে যারা জমি দিতে পারবে। তাই আজ দেখুন, নতুন সরকারের একটু-কিছু ঘটলে কোটি কোটি চাষী মুঠোয় করে প্রাণ নিয়ে আসবে দুম করে ছুঁড়ে দেবার জন্য। পুরানো বনেদি জাত ওরা—নতুন দলের সম্পর্কে বিস্তর ভয়-সন্দেহ ছিল। কিন্তু ঐ একটা কাজ করেই রাতারাতি এরা তাবৎ চাষীর হৃদয় জয় করে ফেলল। চাষী, শ্রমিক আর ছাত্র ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা দলে ভিড়ে গেছে। একটা কথা জেনে রাখুন—ভুবনের তাবৎ ধুরন্ধরেরা জোট পাকিয়ে বোমায় পথ সাফাই করে বেয়নেট ঘিরে চিয়াংকে যদি গদিতে এনে বসান, চীনের মাটিতে তিলার্ধ সে ব্যক্তি তিষ্ঠাতে পারবেন না।

জমির মালিক জমিদার—ঈশ্বর বোধ করি ইজারা দিয়ে দিয়েছেন তাকে। জমি চষবে কিন্তু অন্য লোক। অথবা টাকা খেয়ে জমিদার জমি বন্দোবস্ত করে দিয়েছে অন্যকে; নিয়মিত খাজনা আদায় করে তার কাজ নেবে। এক শ' জনের মধ্যে পাঁচজন এরা গুণতিতে—অথচ জমি দখল করে ছিল অর্ধেকেরও বেশি।

চাষী হল চার রকম। জমিদারের নিচেই ধনী-চাষী; আমাদের দেশের জোতদার-তালুকদার আর কি! তার নিচে মধ্যবিত্ত-চাষী—নিজ হাতে চাষবাস করে, কায়ক্লেশে অশন-বসন জোটায়। গরীব-চাষী হল সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি; তারা দিন-রাত ক্ষেতে খেটেও খেতে পায় না, মজুর-বৃত্তি করতে হয়। ফসলের

প্রায় অর্ধেক দিতে হয় খাজনা বাবদে; অসময়ে ফসল ধার করতে হয়, সুদ তার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। কোন দিন শোধ হবার আশা নেই। বাদ বাকিদের আর চাষী বলা কেন—পুরোপুরি মজুর—পরের জমি চাষ করে, নিজের বলতে এক কাঠাও নেই দুনিয়ার উপর।

কৃষক-সমিতি গ্রামে গ্রামে। সমিতির মধ্য দিয়ে চাষীরা বল-ভরসা পায় জমিদারের অত্যাচারের কথা মুখে বলবার। একা হলে পারত না। অত্যাচারের দু-একটা শুনতে চান নাকি আপনারা? বেশি শোনালে তো কানে আঙুল দেবেন। শুধু মাত্র টাকা-পয়সার শোষণ নয়—বিস্তর বীরপুরুষ আছেন যাঁরা খুনই করেছেন দশ-বিশটা। মাকড় মারলে ধোকড় হয় তো গরিব মারলে হানি কিসের? শুধু বাইরের মানুষই মারেন নি,, ঘরেও দু-পাঁচটা পত্নী ও উপপত্নী মেরে পূর্বাহ্ণে হাত রপ্ত করে নিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত হামেশাই মেলে। আর এ গৌরব পুরুষমানুষেরই নয় শুধু। মেয়ে জমিদারনীও চাপে পড়ে মানুষ খুন করার আত্মকীর্তি ফাঁস করেছেন। এক প্রবীণ সৌম্যদর্শন জমিদার দুঃখ জানালেন, প্রজাপাটকের মধ্যে বিয়েথাওয়া হলে নববধূর প্রথম রাত্রিবাস তাঁর সঙ্গে। বরাবর তিনি এই অধিকার উপভোগ করে এসেছেন। এমন পাওনাটাই যদি রহিত হয়ে গেল, জমিজমা সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। চুলোয় যাকগে জমিদারি!

ভূমি-সংস্কার—চিরকালের এক পাকা রীতি চুরমার করে দেওয়া—বড় কঠিন কাজ। জমিদারের বিস্তর অর্থ ও প্রতিপত্তি—সহজে ছেড়ে দেবে না তারা। চাষীরাও কিল খেয়ে কিল চুরি করবে যতক্ষণ না সুনিশ্চিত বুঝছে, দেশের শাসনশক্তি পুরোপুরি তাদের দিকে। সমিতিগুলোর মধ্যে চোরাগোপ্তা জমিদারের লোক ঢুকে যাচ্ছে, পরিকল্পনা নিয়ে খুব সতর্ক ভাবে এগুতে হবে অতএব।

এক একটা অঞ্চল নিয়ে পড়ো, তার মধ্যে বিশেষ করে একটা গ্রাম বেছে নাও। শহর থেকে পাকাপোক্ত কর্মীরা এসে গেছে, গ্রামকর্মীরা আছে, আছে সমিতির প্রতিনিধিরা। সরকারি নীতি তারা লোককে বোঝাচ্ছে। বুঝে দেখ ভাই সব, জমিদার প্রজাসাধারণের জমাজমি ছলে বলে আহরণ করেই তো এমন ফেঁপে উঠেছে! মীটিং হচ্ছে, জমিদারের ছল-চাতুরী পাপ-অন্যায় সর্বসমক্ষে মোকাবিলা হবে সেখানে। গণ-আদালতে বিচার হবে বড় বড় অপরাধে অপরাধী যারা। 'হোয়াইট হেয়ারড গার্ল' ছবির শেষটা দেখেছেন তো? সেই ব্যাপার।

দুটো শ্রেণী এমনি ভাবে আলাদা করে ফেলা হল, যাদের স্বার্থ একেবারে উল্টো। আপিল চলবে অবশ্য এই দল ভাগ করার ব্যাপারে। সকল পদ্ধতি পার হয়ে এলে সর্বশেষে পাকা সরকারি মঞ্জুরি। তার পরেও ব্যতিক্রম আছে কিছু কিছু। ধরুন, বুড়ো অশক্ত হয়ে পড়েছে একটা লোক কিম্বা বাপ-মা হারিয়েছে এক শিশু। অথবা মুক্তিবাহিনীতে থেকে লড়াই করেছে কেউ। জমিদার শ্রেণীর হলেও এদের সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা হবে, আক্রোশ বশে কিছু করা হবে না।

তার পরে জমিদারি বাজেয়াপ্ত—চাষীর মধ্যে জমির বিলিব্যবস্থা। জমিদারি উৎখাত হল, কিন্তু জমিদারও সমাজের মানুষ—নিয়ম মাফিক তারাও জমি পাবে। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ চাষীর চেয়ে কিছু বেশিই। আর ভাল লোক হলে, তাকে প্লট বেছে নিতে দেওয়া হবে আগেকার দখলি সম্পত্তির ভিতর থেকে। তবে, বাপু, নিজে কারকিত করতে হবে। স্বহস্তে না পেরে ওঠো মজুর লাগাও। কিন্তু অন্যকে বিলি করে দিয়ে খাটে বসে পা দোলাবে আর উপস্বত্ব খাবে—সে সত্যযুগ চিরকালের জন্য খতম হয়ে গেল।

চাষীর সব চেয়ে বড় সাধ, নিজের ভুঁই-ক্ষেত হবে, সেখানে ফসল ফলাবে। সাধ পুরেছে এত দিনে। গ্রামে গ্রামে উন্মত্ত উৎসব। পুরানো দলিলপত্র গাদা গাদা বয়ে এনে আগুনে দিচ্ছে। দলিল পুড়ল, আর পুড়ল চাষীর চিরকালের মনোবেদনা।

রবিশঙ্কর মহারাজ বেজায় মেতেছেন। মানুষের ভাল দেখলেই খুশি। কোন্ জাত, কোথায় ঘর—এই সব অবান্তর কচকচি নিয়ে মাথা ঘামান না। একদিন বড় উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, মহাত্মাজী যা-সমস্ত চেয়েছিলেন—সে আমি এখানেই দেখতে পাচ্ছি।

আমি বললাম, এই আমাদের চিরদিনের রীতি মহারাজ! গেঁয়ো যোগীদের কলকে দিইনে, ভিন্‌দেশে গিয়ে তাঁদের আসর জমাতে হয়। প্রভু বুদ্ধের নাম আমার দেশে ক'টা জায়গায় শুনে থাকেন? এখানে তাঁর কত মঠ-মন্দির! নতুন আমলে এখনও হলদে আলখেল্লা-পরা শ্রমণরা বুদ্ধের নামগানে আকাশ-ভুবন বিমন্দ্রিত করছেন। মহাত্মাজীরও হয়তো বা তাই—স্বদেশের চেয়ে বিদেশ-বিভুঁয়ে বেশি খাতির হবে।

দুপুরে মহারাজের দলে ভিড়ে পড়লাম। ছোট্ট দল ও'দের—উমাশঙ্কর যোশি, যশোবন্ত প্রাণশঙ্কর শুকলা আর মহারাজ—। বড় দলের মধ্যেও দেখেছি, এই তিন জন স্বতন্ত্র সদাই। হৈ-চৈ নেই, শান্ত পায়ে ঘুরে ঘুরে দেখেন এটা-ওটা। আজ ও'রা পিকিনের এক ইস্কুল দেখতে যাচ্ছেন। চলুন, আমিও যাবো।

আট নম্বর মিডল-ইস্কুল। ইস্কুলের নাম এখানে সংখ্যা দিয়ে। তার মানে পড়াশোনার ইতরবিশেষ নেই এ-ইস্কুলে ও-ইস্কুলে। ঝকঝকে বাড়ি, অনেকটা জায়গা দিয়ে। হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক—হাঁকডাক করে পরম আদরে ভিতরে নিয়ে গেল। ধবধবে পোষাক পরা ছেলেরা ঠাণ্ডা হয়ে লেখাপড়া করছে। আমাদের গে'য়ো পাঠশালায় সেকালে ইনস্পেক্টর এলে এই দেখেছি। আগের দিন সমঝে দেওয়া হত—ধোপানো কাপড় পরে আসবি, টু' শব্দ হয়েছে কি পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেবো ইনস্পেক্টর চলে যাবার পর। বারোমেসে অনিয়মের মধ্যে একটা দিনের ঐ শৃঙ্খলার উৎপাত। কিন্তু আমরা তো আগে-ভাগে জানান দিয়ে আসিনি—এত ছিমছাম হবার এরা সময় পেলো কখন ?

সকলের নিচের ক্লাসে ঢুকলাম ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট মশায়ের সঙ্গে। ভারত কোথায় জানো, এ'রা হলেন সেই ভারতের লোক। তামাম ক্লাস ড্যাবড্যাব করে চেয়ে দেখছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী কে বলো দিকি ? মনে রাখবেন, এ হল নেহরুর চীনে যাবার অনেক আগের কথা। তবু নানান দিক থেকে অনেকেই নাম বলে ওঠে। নানান শ্রেণীর মধ্যে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, নেহরুর নাম জানা অনেকেরই। আর রবীন্দ্রনাথকে জানে—কলেজ-পাড়ার মধ্যেই বেশি।

উপর-নিচে এক পাক বেড়িয়ে এসে হলের ভিতর লম্বা টেবিলের দু'ধারে জমিয়ে বসা গেল। আমরা চার জন, মাস্টার মশায়রা আর প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট। চা-সেবন এবং তৎসহ মোলাকাত চলছে। যেমন যেমন শুনলাম, টুকে নিয়েছি। এর থেকে শিক্ষার হাল-চাল বুঝে নিন গে আপনারা।

জুনিয়ার সিনিয়ার দুটো বিভাগ। তিন বছর লাগে এক এক বিভাগের পড়া শেষ করতে। সাতাশটা ক্লাশ—ছেলেও সাতাশ শ'র কাছাকাছি। কর্মী'রা হলেন মোট প'চানব্বুই—ওর মধ্যে মাস্টার হলেন চুয়ান্ন জন। কেরানি ইত্যাদি তবে হিসাব করে নিন।

প্রেসিডেন্ট আর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলেন আমাদের যেমন হেডমাস্টার ও

এ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার। পড়াতে হয়, আবার দেখাশ্নাও করতে হয় সকল রকম। আমাদেরই মতন। আবাসিক ইস্কুল—ছেলেদের বোডিং-এ থাকতে হবে। তিন বারের খাওয়া—এক মাসের মোটমাট খাইখরচা ৭৫,000 ইয়্য়ান। ঘরভাড়া ছয় মাসের একসঙ্গে দিতে হয়—১0,000 ইয়্য়ান। মাইনেপত্তোরের ঝামেলা নেই, পাঠ্য বইও ম্ফতে পাওয়া যায়। এ দায় সরকার ঘাড় পেতে নিয়েছেন। শিক্ষালাভ করতে চায়—সে বাবদে আবার গাঁটের পয়সা খরচ করবে, এ কেমন কথা! গরিব বলে দরখাস্ত ছাড়লে খাইখরচাও মকুব হয়ে যায়, সরকার সেটা দিয়ে দেন স্কলারশিপ হিসাবে।

ইস্কুল আটটা-পাঁচটায়—মাঝে দ্-ঘণ্টা, বারোটা থেকে দ্টো, নাওয়া-খাওয়ার ফাঁক। তিন ঘণ্টা পড়াতে হয় মাস্টার মশায়দের। বাকিটা অবসর। তা-ও ঠিক নয়—নিয়মিত গবেষণা ও শলাপরামর্শ হয় শিক্ষা-ব্যবস্থার যাতে উন্নতি করা যেতে পারে।

এই ইস্কুলটা চাল্ করেন কুয়োমিনটাং-কর্তারা। তখন ন'টা ক্লাস, সাড়ে চার শ' ছেলে। এই যে বিশাল বাড়ি দেখছেন, ১৯৫0-এর শেষাশেষি এটা তৈরি—নতুন-চীনের জন্মের ঠিক এক বছর পরে। এ বছরও তিনটে নতুন ক্লাস বেড়েছে। খেলার মাঠের ঐ দেয়ালটাও এ বছরের।

শিক্ষার কায়দাকান্ন বদলে যাচ্ছে নতুন কালে। শ্ধ্ পাণ্ডিত্য নয়—ছেলেরা যাতে স্বদেশপ্রাণ হয়, সেই শিক্ষা আমাদের। স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণতা শেখানো হয়—মান্ষে মান্ষে তফাৎ নেই, এই তত্ত্ব শিখছে শিশ্ বয়স থেকে। লড়াইয়ের উপর বিষম ঘৃণা—বড় হয়ে এরা পৃথিবীর শান্তি কোন রকমে বিঘ্নিত হতে দেবে না। মাও-তুচিকে বড় ভালবাসে ছেলেরা, আপন জন মনে করে।

কেমিস্ট্রির যন্ত্রপাতি ৩৫৪২ দফা, বায়োলজির ৯৩৭ দফা—সবই প্রায় হালের আমদানি। ল্যাবরেটারির উত্তম ব্যবস্থা—ঘ্রে দেখেই মাল্ম পাবেন। লাইব্রেরির বই আঠাশ হাজারের উপর।

মাস্টার মশায়দের উপর সরকারের খ্ব নেকনজর। মাইনে গড়পড়তা ন' লক্ষ ইয়্য়ান। সব চেয়ে বেশি যিনি পান তিনি দশ লক্ষ। সব চেয়ে কম ছ' লক্ষ। ৫৫0 ক্যাটিশ চাল বা ময়দা মেলে ন-লক্ষ ইয়্য়ানে। আগেকার দিনে মাস্টারেরা পেতেন ২২0 ক্যাটিসের মতন। জীবনমান অতএব শতকরা পঞ্চাশ ষাটের মতন বেড়েছে। বিষম খ্শি সেজন্যে তাঁরা, প্রাণ ঢেলে পড়াচ্ছেন। ছাত্র-

শিক্ষকে ভারি ভাব। ছেলেদের পড়াশুনোর চাড় খুব বেড়ে গেছে। আগেকার দিনে ইস্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে যাবতীয় পড়াশুনো হত। ছেলেদের নিয়ে দেশময় দেদার ঘোরাঘুরি এখন।

ল্যাবরেটারিতে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে সত্যিই তাজ্জব হলাম। এই তো এক ইস্কুল—দশ-বারো-চোদ্দ বয়সের ছেলেরা। সেই বালখিল্যমণ্ডলীর গবেষণার বাহার দেখুন একবার! ভারিক্কি চাল—এটা ঢালছে, ওটা মাপছে। তাকিয়ে হেসে পড়ছে আমাদের দিকে, আবার তখনই ঘাড় ফিরিয়ে নিজের কাজে লেগে গেল। তিলেক অপব্যয়ের সময় নেই। লম্বা টেবিলের দুই প্রান্তে দুটো করে মাইক্রোস্কোপ। চোঙায় একবার করে চোখ দিচ্ছে, আর কাগজে আঁকছে যা আসছে চোখের নজরে...

তার পরে ছুটির ঘণ্টা বাজল। ওদের সঙ্গে আমরাও ছুটে এলাম খেলার মাঠে। নানান দলে ভাগ হয়ে খেলছে, খেলাই বা কত রকমের! নাচ হচ্ছে—নাচে-গানে মিলিয়ে আধেক-তাণ্ডব গোছের খেলা। দেবশিশুর মতো একটা ছেলে তার নিজের হাতে আঁকা ছবি দিল আমাকে। আর বুকের ব্যাজ খুলে আমার জামায় পরিয়ে দিল। ছেলেটার নাম নিয়ে এসেছি—চাও-উই-সিয়ান (Chao-Wei-Hsian)। আর কিছু জানিনে তার, শুধু এই নামটুকুই। চেয়ে দেখি, আর তিন জনকেও অমনি ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছে। ইস্কুলের ব্যাজ—ছাত্ররাই শুধু পরতে পারে। কি করব বলুন—আপনাদের কাছে এত গণ্যমান্য হয়েও বিদেশ-বিভূঁয়ে এক মিডল ইস্কুলের পড়ুয়া হয়ে যেতে হল।

(৩৫)

১৬ অক্টোবর। তারিখটার নিচে দাগ দিয়ে রাখবার মতো। গ্রামে যাচ্ছি—খাঁটি চীন যেখানে দেখতে পাবো। সেদিন অবধি দুঃখী সর্বসম্বলহীন—আজকে কত হাসি সেই সব মানুষের মুখে! কোন্ ম্যাজিকে এসব হয়, গাঁয়ে গিয়ে তার যদি কিছু হদিস পাওয়া যায়।

বাসে চড়ে ছুটেছি প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়ে। সঙ্গে মোটরকারও যাচ্ছে—তদ্‌গর্ভে রবিশঙ্কর মহারাজ ইত্যাদি। আমার গাঁয়ের বাড়ি স্টেশন থেকে বিশ মাইল। বাসে যেতে হয়। সেই বাড়ি যাওয়ার স্ফূর্তি হঠাৎ লাগছে

মনে। পিকিন কত একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, খোলামেলার মধ্যে সেটা মালুম পাচ্ছি। শহর সরে গিয়ে দু-ধারে মাঠ এখন। মাঠ আর মাঠ। মাঝে মাঝে ছোটখাট গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছি। অলস চোখে চেয়ে চেয়ে বাংলা দেশ বলে দিব্যি ভাবা যেতো, কিন্তু খামোকা এক এক পাহাড় উদয় হয়ে ভাবনা গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়।

রাজপথ ছেড়ে ডাইনে বাঁকলাম। এ পথও কিছু নিন্দের নয়—আগের তুলনায় কতকটা সরু। তার পরে মেটে রাস্তায় এসে পড়েছি। একটা নালা মতন জায়গা, উপরে পাথর ফেলা। বাস পাথরের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা—প্রণিধান করে দেখতে ড্রাইভার নেমে পড়ল। আমরাও নেমেছি।

উঠুন, উঠে পড়ুন, যাবে—

কিন্তু একবার যখন মাটিতে পা ঠেকিয়েছি, কার কত ক্ষমতা আবার ঐ খোপে নিয়ে তুলবে! প্রাণ এমন ফেলনা নয় হে বাপু, নতুন-চীনে যা দেখে যাচ্ছি, দেশের ভাইব্রাদারদের কাছে তাই নিয়ে আসর জমাতে হবে না?

হেঁটে চললাম খুচরো খুচরো দল হয়ে। শ্লুইস গেট। খালের জল ক্ষেতের উপর সরবরাহের ব্যবস্থা; গাঁয়ের জলনিকাশও হয় এই খাল-পথে। বাঁধা-পুলের উপর দাঁড়িয়ে আবর্তিত জলধারা দেখলাম খানিক। মাছ মারছে বুঝি—কিন্তু বেশ খানিকটা দূরে, বদরসিক সঙ্গীরা অত উজান ঠেলতে রাজি নন। মনোবাসনা অতএব ঝেড়ে ফেলতে হল। আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথ—পরিচ্ছন্নতার ব্যাধি এদ্দুর এই গাঁয়ে এসেও পেঁছেছে। পাশাপাশি গোটা কয়েক ডোবার ধার দিয়ে যাচ্ছি। অগভীর স্বচ্ছ জল—তলা অবধি দেখা যায়। তলায় ঝাঁকি, অজস্র লাল মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। যে লাল মাছ কাচের বোয়েমে পুরে আপনারা বৈঠকখানার শোভা বাড়ান, ওদের খানা-ডোবা ভরতি সেই মাছে।

তারপর পাড়ার মধ্যে এসে পড়লাম। ঘরবাড়ির গা ঘেঁসে চলেছি। দু-তিনটে রাস্তার মোহানা অথবা একটুকু সদর জায়গা হলেই দেখতে পাচ্ছি, ব্লাকবোর্ড টাঙানো, তাতে অজস্র চীনা হরপ লিখে রেখেছে। প্রশ্ন করে অবগত হওয়া গেল, গ্রামের যাবতীয় খবরাখবর। এবং কৃষক সমিতি ও অপরাপর সমিতির নির্দেশনামা। যত্র-তত্র কপোতের ছবি—অতএব পিকিনে যে সম্মেলন সেরে এলাম তার যাবতীয় বার্তা পেঁছে গেছে; সারা চীনের সকল জায়গায় শান্তির কপোতের বাসা। মানুষের ছবিও বিস্তর লটকানো। হিজিবিজি পরিচয়—পড়তে না পারলেও চেহারা দেখে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, সাধারণ

চাষাভুষো কেউ। সকলের নজরের সামনে ঐ সব বদখত মূর্তি টাঙিয়ে দিয়েছ **কেন হে ?**

কৃষক-বীর ও'রা—

শুনলেন ? লাঙল ছাড়া জীবনে যারা হাতিয়ার ধরে নি, তাদের নামে লেজুড় লাগিয়ে দিয়েছে—'বীর' !

আপনি আমি হাসছি বটে, কিন্তু কৃষক-বীরের ভারি ইজ্জত সমাজের মধ্যে, লড়াই-জেতা সেনাপতিও বোধ হয় অত খাতির পান না। কি না, জমিতে উনি দেড়া ফসল ফলিয়েছেন। শুধুমাত্র ছবিতে শোধ নয়—যাও দিন কতক আরামের প্রাসাদে কাটিয়ে এসো। জাতজন্ম আর রইল না! রাজা মহারাজারা শখ করে বানিয়ে অনুপম সজ্জায় সাজিয়েছে—দেখুনগে যান, তাদের গদির উপর ঠ্যাঙ তুলে উবু হয়ে বসে দাবা খেলছে মাঠের লাঙল-ঠেলা চাষী, কয়লা-খনির কালি-মাখা শ্রমিক।

গাঁয়ের নামটা কি যেন বললে ?

কাওবিতিয়েং—

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। পিকিন থেকে দোভাষি সঙ্গে এসেছে। ইংরেজি বানানে সে লিখে দিল। গ্রামের মণ্ডল দলের মুখপাত্র হয়ে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের নাম সু-চিং। নিতান্তই হাল আমলে ভদ্রলোক এবং মণ্ডল হয়েছেন, দাঁত-উঁচু চুল-খাটো একেবারে গ্রাম্য চেহারা। এক দঙ্গল মেয়ে আর ছেলে পাড়াগাঁয়ের বর এগোবার কায়দায় চলে এসেছে অভ্যর্থনা করতে। ছোট ছোট ঢোলক বাজাচ্ছে মেয়েরা—যে রকম ঢোলক নিয়ে আমাদের বাচ্চারা খেলা করে। ঢোলকের সঙ্গে কত্তাল—রাক্ষুসে কত্তাল, বড় বগিথালার সাইজ। তারা আমরা মিলে দস্তুর মতন এক মিছিল।

নিয়ে বসাল জুনিয়ার মিডল-ইস্কুলের বাড়িতে। বড় হল—হলের লাগোয়া ঘর। তার পর উঠান। উঠানের ওদিকে আরও তিনটে ঘর পাশাপাশি। ইস্কুল বসেছে ওদিকটায়। আগে দেবস্থান ছিল গোটা বাড়িটাই। পুরানো বাড়ি আগাগোড়া মেরামত হয়েছে, কাচের জানলা বসেছে। মাও-র ছবি সামনের দেয়ালে। টানা-টেবিলের দু-ধারে আমরা বসেছি, খানাপিনা ও আলাপ-সালাপ হচ্ছে। মহিলা-সমিতির নেত্রী শ্রীমতী জো এসেছেন, তিনিও দরিদ্র চাষী-ঘরের মেয়ে। মেয়েদের এমন সম্ভাবনার কথা কে ভাবতে পেরেছিল ক'টা বছর আগে ?

মণ্ডল মশায় বক্তৃতা পড়ছেন, দোভাষি ইংরেজি করে যাচ্ছে। আমি পাশে বসে টুকছি। জবর এক বই লিখব চীন সম্পর্কে, এটা কেমনে চাউর হয়ে গেছে। দোভাষি থেমে থেমে বলছে, তাকিয়ে দেখে ঠিক মতো আমি টুকতে পারছি কিনা।

"৬৫৩ ঘর বসতি এ গ্রামে, মোটমাট ৩০১২ জন মানুষ। আবাদি জমির পরিমাণ ৫৭৫৬ মো। ভূমি-সংস্কারের আগে ২২টা জমিদার ছিল—২০৮৮ মো জমি তাদের দখলে। কি অত্যাচার করত যে জমিদারগুলো! যাবতীয় রাজনীতিক ক্ষমতাও পাকে-চক্রে তারা দখল করেছিল। এর মধ্যে আট জন ভারি জবরদস্ত—তাদের নাম হয়েছিল আট মুগুর। এক জমিদার—ম্যাং-আউং কত নারীর যে সর্বনাশ করেছে! ভূমি-সংস্কারের অল্প কিছু দিন আগেও এক কৃষক-বধূকে ধরে নিয়ে গেল। কি হল মেয়েটার, আর কোন খোঁজ হয়নি।

নতুন-চীনের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভূমি-সংস্কার। জমিদারি উৎখাত করে চাষীদের জমি দেওয়া হল। কত কাল থেকে, বলুন তো, জমির জন্য ক্ষুধাতুর হয়ে আছি আমরা!

গাঁয়ে কৃষক-সমিতি হল, সভ্য প্রায় ছ'শ। কিছু কর্মী এলো বাইরে থেকে। জমিদারদের বিরুদ্ধে এরাই সব ব্যবস্থা করল। জমিদার কি অল্পে ছেড়েছে? নানান রকম কায়দা-কৌশল, দল-ভাঙাভাঙি। জমি, মজুত ফসল, কৃষিযন্ত্র ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করবার পর তবে তারা সায়েস্তা হল। বাইশের মধ্যে বারোটি জমিদার-পরিবার আছে এখনো গাঁয়ে, তারা লোক খারাপ নয়, বেশি শয়তানি-বজ্জাতি করেনি ভূমি-সংস্কারের সময়। তাই দশের একজন হয়ে দিব্যি আছে তারা। জন-প্রতি ২·২ মো জমি পেয়েছে (৬ মো=১ একর)। তবে বাপু গায়ে-গতরে খাটতে হবে। স্বহস্তে না পেরে ওঠো, মজুর-কিষাণ খাটাও। কিন্তু পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাজনা আদায় আর প্রজাপাটকের উপর হুমকি দেওয়া চলবে না। জমিদার ছাড়া ১১ ঘর ধনী-চাষী আছে—তারা জন-প্রতি পেয়েছে ২·৭ মো। ১৭৩ ঘর মধ্যবিত্ত-চাষী—তাদের প্রতি জনের জমি ৩·৩ মো। আর গরিব-চাষী ও ক্ষেত-মজুর হল ৪১০ ঘর—তাদের প্রতি জন জমি পেলো ১·২৫ মো হিসাবে। অত্যাচারী জমিদারদের জমির সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল মোট ২৪০ খানা ঘর, ৪টা চাষের পশু, ৩টা বড়

গাড়ি আর ১২৫ দফা আসবাবপত্র। সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি তার কতক পেয়েছে, বাদ-বাকি বিলি করে দেওয়া হয়েছে চাষীদের মধ্যে। এক মেয়ে-জমিদার আছে —ওয়া-চাউ। ভূমি-সংস্কারের পর নিজেই সে চাষবাস করে। স্ফূর্তিতে আছে, দশ জনের সঙ্গে মিলে-মিশে গেছে একেবারে।

নতুন চেহারা গ্রামের। সেদিনের ন্যুব্জ দেহ ভূমিদাসেরা নেই। আজ তারা বলিষ্ঠ মানুষ—রাজনীতিক চেতনা হয়েছে তাদের, শিক্ষা পাচ্ছে। চাষবাস সম্পর্কীয় শিক্ষাই প্রধানত। সরকার গেল বছর ৫৯১ লক্ষ মিলিয়ন ইয়ুয়ান চাষীদের ধার দিয়েছে পশু ও যন্ত্রপাতি কিনবার জন্য। উৎপন্ন খুব বাড়ছে এই ভাবে। এক জমিতে দুটো তিনটে ফসল ফলাচ্ছে বছরে। ১৯৫০ সালে উৎপন্ন ফসলের মোট পরিমাণ ৯৪৪৩ পিকো (১ পিকো=১৩৩ পাউন্ড); ১৯৪৯ এর তুলনায় ২৩·৮ শতক বেশি। আর ঠিক হয়েছে, এই ১৯৫২ সালে ওটা ১১৫১২ পিকোয় তুলতে হবে। সরকারের খুব নজর এদিকে। লাভও আছে। খাজনা টাকায় নয়, উৎপন্ন জিনিষের শতকরা ১৩ভাগ। উৎপন্ন বাড়লে খাজনাও বেড়ে যাবে। ৩২টা কুয়া আছে গ্রামে; ১১টা জলচাকি। পশুর সংখ্যা বেড়েছে—৮৪ থেকে ৯৬। গাড়ি ৪৯ থেকে ৮১। তিনটে স্প্রে আনা হয়েছে জমিতে জল দেবার জন্য, তিনটে নতুন ধরনের লাঙল।

৪২টা মিউচুয়্যাল-এইড-টিম আছে। বস্তুটা কি বুঝলেন? ধরুন, এক বাড়ির জমি আছে ১৪ মো, খাটনির মানুষ ৩ জন। আর এক বাড়ির জমি ১২ মো, খাটনির মানুষ ১০ জন। দু'বাড়ির ২৬ মো জমি ১৩ জনে মিলে-মিশে চাষ করল, ফসল তুলল এক খামারে। তারপর ফসল সমান ভাগ করে নিল। ওদের জমি বেশি, মানুষ কম। এদের মানুষ বেশি, জমি কম—তারই হারাহারি করে নেওয়া হল। পদ্ধতিটা মোটের উপর এই।

মানুষ সুখী সচ্ছল,—খুব খরচপত্র করছে। ষোলটা পরিবার নতুন ঘর বেঁধেছে মোট ৭০ খানা। তার মধ্যে ১৬ খানা প্রয়োজনের নয়, নিতান্তই শখ করে বানানো। নববর্ষের উৎসবটা সকলের সেরা। ঐদিন একটু ময়দা খাবার জন্য সকলে আঁকুপাকু করত; সঙ্গতিতে কুলিয়ে উঠতে পারত না। এখন মাসে দশ-বারো দিন তারা ময়দা খায়। আগে এক প্রস্থ কোট-পাজামায় বছর কাবার হত, এখন শীতের গরমের আলাদা আলাদা পোশাক। আর উৎসবের পোশাক-আসাক দেখে তো চক্ষু কপালে উঠবে—নিষিদ্ধ শহরের কবরখানা ফুড়ে বেরিয়ে সেকালের রাজারাণীরা যেন গাঁয়ে গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনটে বছর

আগে একমুঠো ভাত পেলে যারা বর্তে যেতো, সেই চাষার ছেলেমেয়ের হাতে রিস্ট-ওয়াচ, পকেটে ফাউন্টেন-পেন।

সমবায়-দোকান হয়েছে, গাঁয়ের মানুষ টাকা দিয়ে সভ্য হতে পারে। লাভের বখরা পাবে। জিনিষপত্র ওখানে অন্য জায়গার চেয়ে শতকরা ৫ ভাগ সস্তা। ২৭০ রকম জিনিষ পাওয়া যায়।

আগেও প্রাইমারি ইস্কুল ছিল। কুয়োমিনটাং আমলের ছাত্র সংখ্যা ২৩৪, এখন ৫৩৯-এ উঠেছে। নতুন মিডল ইস্কুল হয়েছে—তাতে ২৯০ জন ছাত্র। বেশির ভাগ ছেলেই সরকারি বৃত্তি পায়। চাষীদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়ানোর জন্য ইস্কুল হয়েছে—৩৫২ জন পড়ছে এখন সেখানে। সংক্ষিপ্ত উপায়ে কম সময়ে চীনা ভাষা শিখবার কায়দা বেরিয়েছে, সেই ভাবে শেখানো হয়। সংস্কৃতি-ভবন দেখতে পাবেন। থিয়েটারের দল হয়েছে অবসর-বিনোদনের জন্য। ভূমি-সংস্কারের মরশুমে দুটো পালাগান বড্ড সমাদর পেয়েছিল—'সাদা চুলের মেয়ে' আর 'লাল পাতার নদী'।

স্বাস্থ্যের উপর খুব নজর চাষীদের। এই গাঁয়ে এ বছর ৬১৩টা ইঁদুর মেরেছে, ৩৭০০০ মাছি মেরেছে (জাল পেতে মাছি মারে, এর জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় গ্রাম-সমিতি থেকে)। হাসপাতাল বানানো হয়েছে ১৯৫০ অব্দে। আর নতুন পদ্ধতির সূতিকাগার। শান্তি-আন্দোলন খুব চালু হয়েছে—লড়াই করব না, শান্তি চাই আমরা মনে দেহে বাক্যে। যে ভাবে উন্নতি হচ্ছে—প্রত্যাশা করছি দু-এক বছরের মধ্যে ট্রাক্টর আসবে, মিলিত ভাবে চাষ করব আমরা।

দেশে ফিরে আপনাদের চাষীদের কাছে আমাদের কথা বলবেন, আমাদের ভালবাসা জানাবেন। ভারত-চীন এক হোক, শান্তি সুদীর্ঘজীবী হোক!"

বক্তৃতা পড়া শেষ হল। সকলে কানে শুনছেন, আর হাতে-মুখে চালিয়ে যাচ্ছেন সমান তালে। আমি বোকারাম পিছিয়ে পড়েছি, কলমই চালিয়েছি শুধু। যতটা পারা যায় তাড়াতাড়ি মুখবিবরে ফেলে উঠে পড়লাম। দু-জন চার-জনে এক এক দল হয়ে চলেছি। মুখের কথায় শুনব না বাছাধন, নিজ চোখে দেখব। একটা ভাত টিপে হাঁড়িসুদ্ধ ভাতের গতিক বোঝা যায়—একটা গ্রাম থেকেই চীনের গ্রাম-জীবনের আন্দাজ নিয়ে নেবো।

কড়া রোদ। আর পথও আমাদের বাংলা দেশের দশখানা গাঁয়ের যেমন

হয়ে থাকে। কখনো আ'লের উপরে চলেছি, কখনো বা শুকনো পুকুরের খোলে। এর ঘর-কানাচ, ওর সদর-উঠান পেরিয়ে চলেছি। তার পর, যা থাকে কপালে, ঢুকে পড়ি এক বাড়ির অন্দরে।

তিন দিকে তিনটে ঘর, মাঝে উঠোন। উঠোনে মরাই। এক দিকে গাড়ি পড়ে রয়েছে—খচ্চরে টানে এ গাড়ি। শোবার ঘরে বেমক্কা রকমের উঁচু খাট, খাটের উপর মাদুর পাতা। খাটের নিচে হরেক জিনিষপত্র। দুটো ডিপ্লোমা টাঙানো ঘরের দেয়ালে—দুই ছেলে গ্রাজুয়েট। বসুন ঐ খাটের উপরে উঠে, বিশ্রাম করুন।

খাটে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়, কসরৎ করতে হবে। সে না হয় দেখা যেতো, কিন্তু সময় কোথা? এক নিশ্বাসে সাত-কাণ্ড রামায়ণ পড়ার মতন সারা গ্রাম-খানা বিকালের মধ্যে শেষ করে বেরিয়ে পড়তে হবে।

প্রাইমারি ইস্কুল। ইস্কুলের বড় ঘরটা মেরামত হচ্ছে। হেড-মাস্টারকে নিয়ে বারাণ্ডায় বসা গেল খবরাখবর নিতে। ১১টা ক্লাস, ১৬ জন মাস্টার। শতকরা ৯২ জন ছাত্র চাষী-শ্রমিকের ঘরের। পড়া শেষ হতে আগে ছ-বছর লাগত; নতুন পদ্ধতিতে এখন পাঁচ বছরে হবে। শিখবেও অনেক বেশি। মাস্টার মশায়দের মাইনে ও সামাজিক ইজ্জত বেড়ে গেছে; কাজকর্মে তাঁরা অধিক মনোযোগী হয়েছেন।

আগে ছেলেদের মারধোর করা হত, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের। ছেলেদের মন জাগাতে চাই, ইচ্ছে করে তারা বেশি শিখবে। পড়ানোর বিষয় হল—চীনা ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, গান, ছবি-আঁকা, দেহ-চর্চা...

ছোট ছোট ছেলেরা উঠোনে বেরিয়ে পড়েছে, গান করছে নেচে নেচে। কে আর বলুন ভদ্র হয়ে বসে তথ্য কুড়াবে হেন তবস্থায়? খাতা বন্ধ করে উঠলাম। তারা দত্ত আর পাণিগ্রাহী পুরোপুরি মেতে গেছেন ছেলেদের হুল্লোড়ে। কি আনন্দ, কি আনন্দ!

ঢের হয়েছে গো! ঘরে এসো ছেলেরা, খাবে। ছোট্ট ছোট্ট চেয়ার আর ডেস্ক, ছোট মানুষদের মাপসই খাওয়ার পাত্র।

অনেকক্ষণ থেকে চেঁচামেচি শুনছি, বহু লোকের বচসা। ছেলেবয়সের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। জমির জোর-দখল নিয়ে খুব দাঙ্গা হত সে আমলে।

চষা ক্ষেতে এক একটা মাটির চাঁই টেনে নিয়ে বসেছে মরদগুলো—তেল-চকচকে রাঙা লাঠি সামনে শোয়ানো। ওদিকে উঁচু ডাঙার খেজুরতলায় আছে বিরুদ্ধ দল। বাগ্‌যুদ্ধে গোড়ায় মেজাজ গরম করে নিতে হয়। এ দল বলছে, ও দল জবাব দিচ্ছে। গলা চড়ে উঠছে ক্রমশ। তার পর উত্তর-প্রত্যুত্তর নয়, আকাশভেদী চিৎকার। এবং ছুটে এসে যে যাকে পাচ্ছে, পিটছে দমাদম। মুহূর্তে রক্তগঙ্গা। চীনেও সেই ব্যাপার নাকি?

পা চালিয়ে গণ্ডগোলের জায়গায় এসে পৌঁছলাম। পুরানো বাড়ির ভিতর সৈন্যরা বিচরণ করছে। হুঙ্কার তাদেরই। ভয়াবহ বটে, কিন্তু চিৎকারের মধ্যে কেমন যেন সুর পাওয়া যায়। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সুর করে চেঁচাবে কেন?

কি মুশকিল! দাঙ্গা কোথায়—লেখাপড়া হচ্ছে। বিশ্রামের জন্য সৈন্যদের দিনকতক গাঁয়ে পাঠিয়েছে। নিরক্ষর অনেকেই—এখন এমন দিনকাল, পেটে দু-কলম বিদ্যে না থাকলে জনসমাজে মুখ দেখানো দায়। বিশ্রামের কয়েকটা দিন তাড়াহুড়ো করে খানিকটা শিখে নিচ্ছে। কলহ বলে মালুম হচ্ছিল, ওটা পাঠাভ্যাস। লড়েনেওয়ালা মানুষ—আপনার-আমার ন্যায় সাবুবার্লি-খাওয়া নিরীহ ভদ্রজন নয়—পাঠ-চর্চার বিক্রমে তাই পিলে চমকে যায়।

আরও এগিয়ে একটা খুব বড় বাড়ির বড় হলে এসে উঠলাম। জমিদার-বাড়ি ছিল, জমিদার ফৌত হয়ে গিয়ে এখন সংস্কৃতি-ভবন। এ হেন ভবন আরও তিনটে আছে। সেগুলো শাখা, মূলকেন্দ্র এটা। মিস্ত্রি-মজুর খাটছে—বাড়ির ভাঙচুর চলছে, দু-একটা নতুন ঘর তোলবারও প্রয়োজন হবে এর পর। গ্রামে গ্রামে এমনি চলেছে। চাষীদের শুধু খাওয়া-পরা নয়, মানুষ হয়ে বেঁচে উঠতে হবে।

দেয়ালে রকমারি পোস্টার। মাঝখানে এক জায়গায় আনকোরা নতুন ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে টক টক করে। লাইব্রেরি—সাড়ে চার হাজার বই—বেশির ভাগ চাষবাস সম্পর্কে। শ' দুই লোক পড়াশুনা করে রোজ এসে। এ ছাড়া শিক্ষণ-বিভাগ আছে, চারটে ম্যাজিক-লণ্ঠন—শ্লাইডের সাহায্যে নানা বিষয়ে নিয়মিত শেখানো হয়। চারটে ড্রামের দল, প্রতি দলের পঁচিশটা করে ঢোলক। কাজের শেষে গ্রামের মানুষ ঢোলক বাজিয়ে আমোদ-স্ফূর্তি করে। সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন প্রোগ্রাম। তাদেরই একটা দল সম্বর্ধনা করেছিল আমাদের। বায়স্কোপ দেখানো হয় শান্তি ও দেশ-পরিগঠন সম্পর্কে।

ব্ল্যাকবোর্ডে নানান হাতের অনেকগুলো লেখা। দরজার ঠিক সামনে রেখে দিয়েছে, ঢুকেই যাতে পয়লা নজর পড়ে। কি হে বাপু এগুলো ?

নতুন যারা লিখতে শিখল, তাদের নাম সই। নিরক্ষরতা তাড়াবেই। চীনা শেখার নতুন কায়দা বেরিয়েছে—দু-ঘণ্টা করে পড়ে তিন মাসে মোটামুটি ভাষা শেখা যায়। যাদের শেখা হয়ে গেল, তারাই মাস্টার হয়ে পরের দলকে শেখাতে লেগে যায়।

ভিন্ন পাড়ায় এসেছি। এক তরুণী পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। উজ্জ্বল চেহারা, পোশাকও পাড়াগাঁয়ের পক্ষে বেশি রকম ফিটফাট। এতক্ষণ ধরে কত মেয়েকে দেখলাম, এ জন গোত্রছাড়া। হাসছে আমাদের দিকে চেয়ে। কথা বুঝতে পারিনে। দোভাষিকে হাত নেড়ে তাই কাছে ডাকল। কাছেই বাড়ি, বেশি পথ নয়—ভারতীয় বন্ধুদের আমার বাড়ি নিয়ে এসো, একটু বসবেন।

তা সে দাবি আছে তার বটে! মস্ত বড় কুলীন—ভলান্টিয়ার হয়ে তার স্বামী ও এক ভাই কোরিয়ায় লড়াই করছে। যারা মুক্তিসৈন্যের দলে ছিল, দেশের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে কিম্বা কোরিয়ার যুদ্ধে গেছে—তাদের মতন ইজ্জত নতুন-চীনে আর কারো নয়। স্বামী আর ভাইকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েও মেয়েটা তাই অমন হাসছে। আচার জাতীয় জিনিষ বানিয়ে রেখেছে ফ্রন্টে পাঠাবে বলে। আর পুঁটলি বেঁধে রেখেছে শীতের কাপড়। বোন আর ছেলেটাকে নিয়ে সংসারধর্ম করে। হাত ধরছে আমাদের, পিঠের উপর হাত রাখছে কারো। সরল, নিঃসঙ্কোচ। চেহারায় আগে তো ভেবেছিলাম এক কাঁচ কুমারী মেয়ে—মা হয়েছে সে। ফ্রন্টে গুলিগোলার মধ্যে লড়ছে ছেলের বাপ। আহা, কী ছেলে! এই আমি লিখতে বসে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। লাল পাজামা-পরা, দু-গালে লাল রং-মাখা, কপালে রাঙা ফোঁটা। অমন সাজে কেন সাজিয়েছে, জানি না। চার বছরের তো ছেলে—আমাদের এতটুকু সমীহ করে না বিদেশি বলে। ও-দেশের কোন ছেলেটাই বা করে! স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে। গান ধরেছে—গানে কি বলছে হে? একটুখানি শুনে নিয়ে দোভাষি ইংরেজিতে মানে বাতলে দিল—'প্রাচী মহান...।' তার পর দু-হাত উদ্যত করে বীররসের আর এক গান। অস্যার্থ? 'দেশ রক্ষা করতে ইয়েলু নদী পার হবো আমি...।' বাপরে বাপ, শত্রুর আর রক্ষে নেই তুমি যখন ইয়েলু পার হয়ে যাচ্ছ!

গান বন্ধ হঠাৎ, গায়ক বেঁকে বসেছে। কি হল? তোমরা হাসছ, গাইব না—কিছুতে গাইব না আর আমি।

বিস্তর সাধ্যসাধনায় মান ভাঙল। মুখ গম্ভীর করে শুনছি আমরা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে হাস্যলেশ আছে কিনা কোন মুখের উপর। খুশি হয়ে তার পর ঐ কথাগুলোই গাইল বার কয়েক।

তখন মুশকিল, কিছুতে ছেড়ে দেবে না আমাদের। কদ্দুর যাবে খোকা? যাবে, যেখানে আমরা নিয়ে যাবো? ইন্ডিয়ায় যাবে? মা'টিও তেমনি—ছেলে গুটগুট করে চলল, হাসছে সে সকৌতুকে। চলেছে ছেলে কখনো আগে আগে, কখনো পিছনে। সমবায়-দোকান অবধি এসেছি, তখনো সঙ্গে আছে। রোদে ঘাম ফুটেছে সোনা মুখে। দোভাষিকে বললাম, আর নয়—জোরজার করে দিয়ে এসো একে বাড়ি পৌঁছে। পাষণ্ড মা খালি হাসে—ছেলে যদি সত্যি সত্যি ইয়েলু নদী পার হয়ে রণাঙ্গনে চলে যায়, তখনো বোধ করি হাসবে অমনি। ধরতে যাবে না।

সমবায়-দোকানে এসে কয়েকজন আমাদের শশব্যস্তে দরদাম টুকছেন। টুকেই চলেছেন। চলুন, চলুন—পরের আতিথ্যে চর্বচোষ্য দেদার চালিয়েছি, দোকানে দাঁড়িয়ে অত হিসাব-নিকাশের গরজ কি আমাদের?

নতুন-চীনের আর্থিক চেহারাটা পুরোপুরি পেতে চাই।

অনেক তো হল! আর কেন, চলুন—

সুবোধ বন্দ্যো বললেন, জমিদারি কেড়ে নিয়েছ—তাদেরই কোন এক বাড়ি নিয়ে চলো দিকি। আলাপ-সালাপ করে বুঝি তাদের মনোভাবটাই বা কি রকম!

প্রোগ্রামে এটা ছিল না। সবাই হাঁ-হাঁ করে সায় দিল।

হাসপাতাল দেখতে যেতে হবে, তাঁদের বলে রাখা হয়েছে। তার উপরে এটা চড়ালে খেতে কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

তাই তো চাই। উদর অবকাশ পাবে, তোমাদের আয়োজন একেবারে বরবাদ হবে না।

মাঝারি গোছের এক জমিদার-বাড়ি পথে পড়ল, সদলবলে ঢুকে পড়লাম। বাড়ি দেখে সম্ভ্রম হয় না, জমিদার না হয়েও এ হেন বাড়ি আমাদের অনেকেরই। বাড়ির গিন্নি এগিয়ে এলেন। বয়স হয়েছে, বলিরেখায় চিত্রিত মুখ।

অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে বসালেন। একটু জলটল খেয়ে যেতে হবে—দাঁড়ান, সেই ব্যবস্থা আগে করি। জানিনে তো যে আপনারা আসবেন!

আমরা আপত্তি জানিয়ে বললাম, বেলা হয়ে গেছে—ও সব তালে যাবেন না। দুটো-একটা কথা জানতে এসেছি আপনার কাছে। দেশে ফিরলে সকলে জিজ্ঞাসা করবে কিনা—

গিন্নি হেসে বলেন, গিয়ে যে নিন্দেমন্দ করবেন—ঠিক দুপুরবেলা এক বাড়ি গিয়েছিলাম, শুকনো মুখে বকবকানি শুধু সেখানে।

কিছু না, কিছু না। ঠাণ্ডা হয়ে বসুন দিকি একটু।—

বসলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন তিনি। মুখ-ভরা সহজ স্বচ্ছ হাসি।

জমিদারি গিয়ে নিশ্চয় খুব খারাপ লাগে?

মোটেই নয়। বেশ ভাল আছি আগেকার চেয়ে।

চমক লাগল। এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা? জবাবটা দোভাষি ইংরেজিতে তর্জমা করে দিল, তারই কারসাজি হয়তো। এমনও হতে পারে, আমাদের ইংরেজি প্রশ্ন চীনাতে উল্টো ভাবে বুঝিয়েছে গিন্নিকে।

আবার এ-ও হতে পারে, গিন্নিই একদিনের উটকো লোকের কাছে মনের দুয়োর খুলছেন না, সেরে সামলে বুঝে-সমঝে বলছেন। বিশেষ করে আধা-সরকারি অতিথি যখন আমরা। কিন্তু মুখের কথা নিয়ে যে সন্দেহই করি, মুখের উপরে ঐ যে হাসি খেলছে—ওটা জাল বলি কেমন করে? হেসে হেসে গিন্নি বলছেন, দিব্যি আছি। জমিদারির বিস্তর হাঙ্গামা; প্রজারা পয়সা-কড়ি দিতে চায় না, দশের কাছে শত্তুর হয়ে থাকতে হয়। জান বেরিয়ে যায় ঠাটবাট বজায় রেখে চলতে। বেঁচেছি এখন। বৃহৎ সংসার পুষতে হত, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তেইশ জন, তার উপরে একগাদা ঝি-চাকর। জমিদারি খতম হবার পর পরগাছারা সরে পড়েছে। ছেলে বউ আর আমি—তিনটি প্রাণীর সংসার। ছেলে পিকিনে থাকে, সেখানে কাজ করে। আগে হবার জো ছিল না। জমিদার-বাড়ির ছেলে খেটে খাবে, সে কি সর্বনাশ! আগে এক শ' বাইশ মো জমি ছিল, এখন সেখানে সাত মো। তার মধ্যে দুই মো হল পুকুর, বাদবাকি চাষের জমি। নিজেই চাষবাস দেখি। তাতে যে খুব কষ্ট হয়, তা মনে করবেন না। মিউচুয়াল-এইড-টিম—খাটাখাটানি কম।

ওখান থেকে হাসপাতালে। এ-ও আর এক জমিদার-বাড়ি; আট মুগুরের একজন। গাঁ-ঘর ছেড়ে সরে পড়েছে। হাসপাতাল খোলা হয়েছিল ১৯৪৫ অব্দে অন্য এক বাড়িতে। তখন এক ডাক্তার আর চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের ওষুধ। সেই ওষুধই বা কে খাচ্ছে! চাষীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত রোগমুক্তির জন্য। ঈশ্বরের মরজি হলে বিনি ওষুধেই সেরে যায়; আর মরজি না হলে ঐ পঞ্চাশ রকম একসঙ্গে গুলে খাইয়ে দিলেও রোগের কিছু হবে না। এখনো—গাঁয়ের প্রতিষ্ঠান তো—এমন-কিছু বৃহৎ ব্যাপার নয়। তিন জন ডাক্তার, দুই জন, সহকারী, চার জন নার্স। ওষুধ তিন শ' দফার মতন। দুটো ঘর নিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন কুড়িখানার উপর। সত্তর-আশী জন রোগী রোজ আসে চিকিৎসার বাবদে। সর্দি-জ্বরই বেশি।

দুপুর গড়িয়ে এলো। ফিরে চললাম—যে ইস্কুল-বাড়িতে প্রথম এসে উঠেছি। দুপুরের খাওয়া সেখানে। লম্বা টেবিল পড়েছে সারি সারি, স্তূপাকার আয়োজন। আর পল্লী-অঞ্চলের খাঁটি মাল—পানের সময় নাকি গলা দিয়ে আগুন নামে। অধম অরসিক—গুণাগুণ শুনেই আসছি শুধু। গেলাস থেকে একটু ঢেলে নিয়ে জ্বলন্ত কাঠি নিক্ষেপ করলাম। দপ করে জ্বলে উঠল।

খাওয়ার পরে আবার বেরুনো। বসে থাকতে আসিনি—যতটুকু সময় আছে দেখে শুনে সঞ্চয় করে নিই। আহা, ঠিক যেন আমাদেরই কোন গ্রাম। সদর রাস্তা ধরে চলেছি। মেটে রাস্তা, দুধারে পগার। এধারে ওধারে টালি-ছাওয়া ঘরবাড়ি। কুয়োর জল তুলছে খচ্চর দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। মানুষজন দেখবার জন্য ভিড় করেছে। দেখবে বই কি! একদল বিচিত্র মানুষ ঘোরাঘুরি করছে, রামা-শ্যামা নয়—ভারতের মানুষ: হেন ভাগ্য ক'টা গ্রামের হয়ে থাকে?

পথের প্রান্তে নিরিবিলি একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁসে—এই যে বলা হয়, ভিখারি নেই মোটে এ দেশে—ছেঁড়া পোশাক-পরা বুড়োমানুষটা কাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে যাই। লোকটা সরে গেল, বাড়ির উঠানে গিয়ে উঠল। সেখান থেকেও অমনি তাকাচ্ছে। কিন্তু পরদেশে বাড়ির উঠান অবধি হামলা দিয়ে দয়া দেখাতে সাহসে কুলায় না। হাজার দুই ইয়ুয়ান দোভাষির হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, দিয়ে এসো লোকটাকে—

দোভাষি হাসল। সেকেলে গেঁয়ো মানুষ—ওদের ধরণধারণ এই রকম।

বিদেশি বলে কুতূহলী হয়ে তোমাদের দেখছে। তাই একেবারে ভিখারি ভেবে বসেছ? টাকাকড়ি চাচ্ছে না বুড়ো, দিলেও নেবে না। দিতে গেলে অপমান করা হবে।

নিজেরই লজ্জা লাগে তখন। ছি-ছি, কাপড়-চোপড় দিয়ে আমরা মানুষের বিচার করি।

বেলা পড়ে আসে। ইস্কুলবাড়ি ফিরি এবার—আমাদের আড্ডাখানায়। ঘুরে-ফিরে সবাই ওখানে এসে জুটবেন, ওখান থেকে পিকিনে রওনা।

তুমুল বাদ্যভাণ্ড ইস্কুলবাড়ির উঠানে। দূর থেকে আওয়াজ পাচ্ছি। গাঁয়ে ঢুকবার মুখে সেই যে দেখেছিলাম—তারা সব এসে জুটেছে। শুধু বাজনা নয়, বাজনার সঙ্গে নাচ। নাচছে ওরাই শুধু নয়, ভারতীয়দের ধরে ধরে নামাচ্ছে। ঘন-বিন্যস্ত গাছের ছায়া, আধপুকুর গোছের জলাভূমি—তারই পাশে আসন্ন সন্ধ্যায় সে কি হুল্লোড়! সন্তর্পণে এক গাছতলায় দাঁড়াই। তবু দেখে ফেলল।

আসুন, নেমে পড়ুন—

কোঁচার কাপড় গুঁজে দিই কোমরে। অর্থাৎ নামবোই নির্ঘাৎ। নেমে পড়লামও বটে, আসরে নয়—পগার লাফিয়ে একেবারে রাস্তার উপর। হনহন করে চলেছি—দৌড়নো বললেও আপত্তি করব না। বেশ খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে রাস্তার উপর আমাদের বাস রয়েছে, তার খোপে ঢুকে পড়ে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলি। সকলে এসে পড়লে বাস ছেড়ে দিল।

(৩৬)

পিকিন ছাড়তে হবে দু-এক দিনের মধ্যে, দেখা-শুনোর যা-কিছু তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নাও। প্রত্নপণ্ডিত চেং চেন-তো'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেই যে —রেস্তোরাঁয় নিয়ে খাওয়ালেন আমাদের ক'জনকে। নিষিদ্ধ-শহরের এলাকার মধ্যে লেখক-সঙ্ঘ—সেইখানে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। অদূরে পে-হাই পার্ক, খাসা পরিবেশ! জায়গাটুকুকে বলে গোল-শহর। গিয়েছি একলা আমি, সঙ্গে দোভাষি। এসে অবধি চেষ্টা করছি চেং মশায়ের সঙ্গে

একটু নিরিবিলি বসব। অতীত কালের মধ্যে অতিস্বচ্ছন্দ তাঁর পাদচারণা।
ভারত-চীনের পুরানো সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর নতুন কথা তিনি বললেন।

পে-হাই পার্কের সামনে ন্যাশন্যাল পিকিন লাইব্রেরি। তেরো শতকের তৈরি মূর্তি এদিকে-ওদিকে—নানা রকম সমুদ্রজন্তু, ড্রাগন, ঘোড়া, স্বস্তিক। বৃষ্টি হচ্ছিল টিপটিপ করে। প্রশস্ত অঙ্গন ছুটে পার হয়ে লাইব্রেরি-বাড়িতে উঠে পড়লাম।

পুরানো ধাঁচে তৈরি নতুন বাড়ি। বিশাল চীন দেশে একাল-সেকালের বিস্তর লাইব্রেরি আছে, তার মধ্যে সকলের সেরা। একতলা, দোতলা, তেতলা ঘুরে বেড়াচ্ছি—উঁচু ঘর যেমন, তেমনি আছে নিচু নিচু খোপ। সিঁড়ি নানান দিকে—এই উপরে উঠছি, এই নেমে যাচ্ছি আবার। বই আর বই আর বই। আর বই পড়বার এবং বই-পুঁথি থেকে টুকে নেবার মানুষ। অত বড় বাড়ি—লাইব্রেরির লোকজন ও পড়ুয়ায় হাজারের বেশি বই কম হবে না। কিন্তু নিঃশব্দ—একটা সূঁচ পড়ে গেলে তার আওয়াজ পাবেন।

গ্রন্থাগারিক নিজে এঘর-ওঘর দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুরানো দুষ্প্রাপ্য বইয়ের তোয়াজ বড্ড বেশি। আলমারিতে বেশ হাত-পা ছড়িয়ে তাঁরা বিরাজ করছেন; ডেস্কের মধ্যেও শুয়ে আছেন অনেকে। এঁদেরই মধ্যে এক তাজ্জব—একটা জায়গায় এসে গ্রন্থাগারিক মৃদু মৃদু হাসছেন আমার দিকে চেয়ে, আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন ডেস্কের কাচের দিকে। কি ব্যাপার? পুঁথির বয়স লেখা আছে হাজার খানেক বছর। পুঁথিখানা—তাই তো, মালুম হচ্ছে যেন বাংলা হরফে লেখা। প্রাচীন বঙ্গাক্ষর। দোভাষি তখন একটু দূরে, ইসারায় কাছে ডাকি। তার কাছে জেনে নিয়ে নিঃসংশয় হই। তাই বটে! এই পুঁথি আমার বাংলা দেশ ছেড়ে হিমালয় লঙ্ঘন করে, দিগ্‌ব্যাপ্ত মরু দুস্তর নদী অগণন জনপদ পার হয়ে রহস্যাকীর্ণ প্রাচীন পিকিন নগরীতে হাজার বছর ধরে সম্মানের আসন নিয়ে আছে।

দোভাষি জিজ্ঞাসা করে, পড়তে পারো? পড়ো দিকি কি আছে পুঁথিতে লেখা?

তাবচ্চ শোভতে—ইত্যাদি। অতএব চুপ করে রইলাম।

রাজাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ক্রমশ লাইব্রেরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠা; বয়স ছ-শ' পেরিয়ে গেল। মাঞ্চু রাজাদের

তাড়ানো হল উনিশ শ' এগারোয়। পরের বছর ন্যাশন্যাল পিকিন লাইব্রেরি নাম নিয়ে এই জায়গায় লাইব্রেরির পত্তন।

ঝড়-ঝাপটা অনেক গেছে এর উপর দিয়ে। উনিশ শ' অব্দে পিকিন লুঠ-পাট করল—অনেক বই পোড়াল, বিস্তর বই খোয়া গেল সেই সময়টা। আরও অনেক বার এমনি হয়েছে। বইয়ের সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ লাখ এখন। পাঁচটা বিভাগ, আলাদা আলাদা কাজ তাদের। এক দল বই কেনে ও জোগাড় করে। আর এক দল জোগাড় করে দুষ্প্রাপ্য বই; ঐ সব বইয়ের সযত্ন রক্ষণ-ভারও এই দলের উপর; ভিতরের মালামাল নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণার কাজও এদের। এক দলের কাজ ক্যাটলগ তৈরি—বইয়ের শ্রেণীবিভাগ করে পাঠকের সামনে যতদূর সম্ভব পরিচয় তুলে ধরা। আর এক দল রিডিং-রুমে বইয়ের বিলিব্যবস্থা করে; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভ্রাম্যমান পাঠাগারের বন্দোবস্ত এদের। তা ছাড়া রকমারি বক্তৃতা ও নানা জায়গায় বইয়ের প্রদর্শনী এদের উদ্যোগেই হয়। কিছু দিন থেকে একটা বিশেষ বিভাগ হয়েছে—সোভিয়েট লাইব্রেরি; আলাদা তার রিডিং-রুম। সোভিয়েট বই আর সাময়িকপত্রাদির বিশেষ চাহিদা ইদানীং; অসংখ্য বই চীনায় তর্জমা হচ্ছে।

চীনের নবজন্ম থেকে দেদার বই কেনা হচ্ছে—সাবেক আমলের অনেক গুণ। আর এক ব্যবস্থা হয়েছে—বই ধার দেওয়া ও ধার নেওয়া। এক দেশকে ধরুন দশ হাজার বই ধার দিলাম, আনলাম সেখান থেকে ঐ পরিমাণ। পড়া শেষ হয়ে গেলে ফেরত দেওয়া হল। অনেক জায়গার সঙ্গে এইরকম লেনদেন চলছে।

বইয়ের একজিবিসনে চক্কোর দিচ্ছি। হাড় ও কচ্ছপের খোলার উপর লেখা—বই না কি বলবেন তাকে? বয়স হল খৃস্টপূর্ব তেরো শ' থেকে এক শ'। কাঠের উপর লেখা বুদ্ধের নানা উপদেশ—৪৪৮ থেকে ৭৫০ অব্দের। আগে যে পুঁথির কথা বললাম, তা ছাড়া আরও বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি আছে। ১৫০০ অব্দের খবরের কাগজ। কাঠের উপর আঁকা বহু বিচিত্র ছবি। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংখ্যা এক লাখ চল্লিশ হাজার।

মস্ত বড় পাঠাগার, সর্বসাধারণ সেখানে বসে সাধারণ বই পড়ে। আর দুটো আলাদা পাঠাগার আছে বিজ্ঞান আর কারিগরি বই পড়ার জন্য। দুটো নতুন হল বানানো হচ্ছে—একটায় একজিবিসন মনের মতন করে সাজানো হবে, আর একটা হবে বাচ্চা ছেলেদের পড়বার ঘর। শুধু বই পড়া নয়, নিয়মিত বক্তৃতার ব্যবস্থা পাঠাগারে—লেখক ও গুণী-জ্ঞানীরা পাঠকদের সামনে হাজির

হয়ে মোলাকাত করেন। চিঠিচাপাটি আসে রোজ—লোকে নানান রকম প্রশ্ন করে চিঠি লেখে, পণ্ডিত-জনের সঙ্গে পরামর্শ করে তার জবাব দেওয়া হয়। বই ধার দেওয়া হয় অন্যান্য লাইব্রেরিতে—পিকিন ও আশে-পাশে সাত শ' তেত্রিশটা লাইব্রেরির সঙ্গে এমনি ধার দেবার ব্যবস্থা। সর্বব্যাপ্ত শিক্ষা-প্রচেষ্টায় লাইব্রেরিও দায়িত্ব বহন করছে।

দূতাবাসে আজকে চায়ের নিমন্ত্রণ। শুধু মাত্র তরল চা নয়—লুচি-তরকারি ইত্যাদি নির্ভেজাল ভারতীয় খাদ্য। সেই পরাঞ্জপের বাড়ি মুখবদল হয়েছিল, আর আজ। আকণ্ঠ ঠেসে দুর্ভিক্ষের খাওয়া খেয়ে নিলাম। এর পরে যে ক'টা দিন পিকিনে রইলাম, ঐ স্বাদ জিভে জড়ানো ছিল।

বিকাল বেলা এই, সন্ধ্যার পর আবার এক দফা ভারী ভোজ। আহা, চলে যাচ্ছেন যে ক'টা দিন পরে! ধকলটা কিছু বেশিই হচ্ছে—তা খেয়ে নিন কষ্টে-সৃষ্টে, কি আর হবে! মাসাবধি ধরে যাঁদের খাচ্ছি, তাঁরাই আবার আলাদা করে নিমন্ত্রণ করলেন আজ। এবং ঐ পিকিন হোটেলেই—নিচের তলার খানা-ঘরে। সব রকম ভোজ্যই মজুত থাকে প্রতিদিনের খানা-টেবিলে—নতুন আর কি আসবে এর উপরে? নতুন এই হল, বিশেষ নিমন্ত্রণের নাম করে যাবতীয় বিশিষ্টেরা আজ আমাদের সঙ্গে খাচ্ছেন।

বড়দের বাদ দিয়ে চার জনে আমরা একটেরে আলাদা ভাবে ছোট্ট এক টেবিলে বসেছি। তিন জন ভারতীয়—আর এক প্রৌঢ়া চীনা মহিলা এসে খালি চেয়ারটায় বসে পড়লেন। নিতান্ত সাদা-মাঠা পোশাক, মাথার চুলগুলো অবধি পরিপাটি গোছানো নয়। ইংরেজি কিন্তু উত্তম বলেন। তা হলে দোভাষি করে নি কেন এঁকে? বাচ্চা ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ উঠল—তার মধ্যে ডাক্তারির ফোড়ন শুনে মালুম হল, ঐ বিদ্যাও কিছু কিছু জানা আছে। তা সে যাই হোক, ভারি স্ফূর্তিবাজ মহিলা, অবিরত হাসিরহস্য করছেন, বয়সের তুলনায় অতি চপল। হিন্দুস্থান আর চীনের অধিবাসী ভাই ভাই—এই মর্মে কয়েক দিন থেকে একটা শ্লোগান চালু হয়েছে—হিন্দী-চীনী ভাই ভাই। মহিলা ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে সকলের চেয়ে উঁচু গলায় সেই বুলি ছাড়ছেন। আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন এ-কথায় ও-কথায়।

এই মাস কয়েক আগে মহিলাকে কলকাতায় দেখে চমকে উঠলাম। চীনের

স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসেছেন, সম্বর্ধনার সমারোহ। নলিনীরঞ্জন সরকারের 'রঞ্জনী' বাড়িটা এখন কলকাতার চীনা দূতাবাস। ঐখানে নিমন্ত্রণ হয়েছে স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর সঙ্গে মোলাকাতের ব্যাপারে। হলের দরজায় দাঁড়িয়ে কনসাল-জেনারেল অভ্যর্থনা করছেন, পাশে সেই আমুদে মহিলাটি। আমায় দেখে হেসে উঠলেন পিকিনের ভোজের আসরের মতোই। বললেন, একেবারে নাম করে বলে উঠলেন, আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল বোস। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে বললেন, ব্যানার্জি, তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ। তার পরে ভিতরে গিয়ে মহিলাটি বসলেন আমাদের রাজ্যপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। খাতির দেখে তখন বুঝলাম। পিকিনে সাধারণ এক ডাক্তার কিম্বা নার্স ভেবেছিলাম—ওরে বাবা, খোদ স্বাস্থ্য-মন্ত্রী তিনিই যে! বিলাতে বিস্তর দিন কাঠ-খড় পুড়িয়ে ডাক্তারি শিখেছেন, কিন্তু সারল্য ও রস-রসিকতার উপর বিলাতি পলস্তরা পড়েনি।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশায় ছিলেন, তাজ্জব ব্যাপারটা শোনালাম তাঁকে। সামান্য মানুষ সেই কবে চীনে গিয়েছিলাম, কত দিন হয়ে গেল—কত রকম দায়ঝক্কি ও'দের উপর—অথচ নামটা অবধি মনে করে রেখেছেন।

সুনীতিকুমার বললেন, সাহিত্যিক মানুষ—তার উপর আপনার পরনে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি। তাই হয়তো চিনে ফেললেন—

কিন্তু বিজয় বাড়ুর্যে? তাঁকেও তো ভোলেননি—

অসাধারণ স্মরণশক্তি অতএব মহিলার। আশু মুখুয্যে মশায়ের এমনি ছিল। যাকে একবার দেখতেন, কখনো তাকে ভুলতেন না।

হবে তাই। স্মরণশক্তির আরও পরিচয় পেলাম অচিরে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে করতে পুরানো কথা উঠল, পিকিনে এক টেবিলে খেয়েছিলাম আমরা; খেতে খেতে চেঁচাচ্ছিলাম 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই'—

ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে মাননীয় মন্ত্রী বললেন, খুব মনে আছে। 'ভাই-ভাই' কেন হবে? 'বাই-বাই'। তাঁর ভাঙা উচ্চারণে 'ভাই-ভাই' কথাটা 'বাই-বাই'তে দাঁড়িয়েছিল, এত দিন পরে সেই মোতাবেক সংশোধন করে দিলেন।

এই দেখুন, গল্পে গল্পে কোথায় এসে পড়েছি। এমন করলে চীনের কথা কবে শেষ হবে! হচ্ছিল কোথায়?

ওরা ধরেছেন, চলে যাচ্ছ তো—কি রকম দেখলে, বলে যাও একদিন আমাদের রেডিয়োয়। জন আষ্টেককে বাছাই করা হয়েছে রেডিও-বক্তৃতার জন্য। বক্তৃতার রেকর্ড করে নেবে, যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছে হোটেলে। সুবোধ

বন্দ্যোর উপর ভার—সকলকে ডেকে-ডুকে বক্তৃতা করাবেন। যথারীতি দক্ষিণাও দেওয়া হবে বক্তৃতার জন্য।

দক্ষিণা? তবে এই ঠোঁট বন্ধ, মশায়। এত আদর-যত্ন, ডাইনে-বাঁয়ে ভালবাসার উপহার—এর উপরেও টাকা? ভাবেন কি বলুন তো আমাদের।

কড়া হয়ে বসায় দক্ষিণা শেষ অবধি মকুব হল। এই একটা বস্তু মুফতে দিয়ে এলাম।

এক পাক বাজার ঢুঁড়ে আসব। আমার সেই পাকিস্তানি কনিষ্ঠ খোন্দকার ইলিয়াস ধরে ফেললেন, অবেলায় কোথায় ছুটলেন দাদা?

ব্লেড ফুরিয়ে গেছে। আজকের ক্ষৌরকর্ম হয়নি। ব্লেডের সৃষ্টি-ছাড়া দর এখানে—একটা-দুটো তবু না কিনে উপায় নেই।

চক্ষু কপালে তুলে ইলিয়াস বলেন, কি সর্বনাশ, নিজে দাড়ি কামান আপনি?

হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন আমায়। হলের অপর প্রান্তে অনেকগুলো ঘর, দোভাষিরা বসা-ওঠা করে—ওদিকটায় কোন দিন যাইনি। তারই এক খোপের সামনে গিয়ে ইলিয়াস দাড়ি চাঁচার ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাপা ফরমে সই মেরে দিল তাঁর হাতে। পিছনে আর একটা ঘর—সেলুন। চেয়ারে বসিয়ে দিল—সে চেয়ার কখনো কাত হচ্ছে, কখনো শুয়ে পড়ছে। এমনি করে নানান ভাবে শুইয়ে বসিয়ে বিশ মিনিট ধরে ক্ষৌরকর্ম করল। তা-বড় তা-বড় অপারেশনেও বোধ করি এত ঘোর-প্যাঁচের প্রয়োজন হয় না।

হায় রে, পিকিনে পা দেওয়ার পরে এই ইলিয়াসকে আমি নানাবিধ পাঠ দিয়েছিলাম। ভায়া ইতিমধ্যে বিস্তর লায়েক হয়েছে, অগ্রজকে অনেক পিছনে ফেলে গেছে।

সেই দুপুরে আর এক ব্যাপার। শ্রীমতী কোটনিশকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে—আগে-পিছে খেয়ে নেবেন না, এক সঙ্গে খাবো সকলে। ডাক্তার কোটনিসের কি পরিচয় দেবো—'কোটনিশ কা অমর কাহিনী'—সিনেমা-ছবি দেখেছেন নিশ্চয়। যুদ্ধের আমলে নেতাজি-নেহরুর উদ্যোগে ভারত থেকে দুর্গত চীনে মেডিকাল মিশন গিয়েছিল, কোটনিশ সেই দলের। ইনি সেই মেয়ে, যিনি কোটনিশের আমৃত্যু কর্মের সাথী—এবং জীবনসঙ্গিনীও হয়েছিলেন। এখন আর শ্রীমতী কোটনিশ বলা চলবে না, এক চীনা ভদ্রলোককে বিয়ে করেছেন। এটা হামেশাই চলে ওঁদের সমাজে। শ্রীমতী পিকিনে থাকেন; একটা ইস্কুলের

স্বাস্থ্য-পরীক্ষক। আমাদের মধ্যে যে ক'জন মারাঠি, হঠাৎ তাঁরা অনুষ্ঠানের মাতব্বর হয়ে উঠেছেন। আগে ধরতে পারিনি, তারপর মালুম হল, কোটনিশ জাতে মারাঠি। অতএব বাড়ির বউ এসেছে, এমনি একটা ভাব মারাঠি বন্ধুদের।

শ্রীমতীর বয়স হয়েছে, প্রৌঢ়ত্বে এসে গেছেন। যে সব মিষ্টি রোমান্সের কাহিনী শোনা গেছে, এ চেহারার সঙ্গে তা যেন খাপ খায় না। ছেলেটি খাসা, বছর দশ-বারো বয়স, চেহারায় ভারতীয় আমেজ আছে, নামেরও মানে করলে দাঁড়ায় 'চীন-ভারত'। বললাম, দেশে যাবে খোকা? চলো না আমাদের সঙ্গে। লাজুক মুখে সে ঘাড় নাড়ে, উঁহু—এখন নয়। ওর মা-ও বললেন, যাবে বই কি; নিশ্চয় যাবে। আর একটু বড় হোক। কোটনিশের অনেক গল্প করলেন শ্রীমতী, সাহস ও কর্মনিষ্ঠার অনেক কাহিনী।

মাও-তুন জাঁদরেল ঔপন্যাসিক, প্রায় আমাদের শরৎ চাটুয্যে মশায়ের সমতুল্য। হাস্যমুখ, সদালাপী ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করলাম, নতুন কোন উপন্যাস ধরেছেন? হেসে উনি ঘাড় নাড়েন, উঁহু বই লেখা আর বোধহয় হবে না। কবি এমি-সিও পাশ থেকে ফোড়ন কাটেন, ধরেছেন বই কি! চীনের তাবৎ নরনারী বালবৃদ্ধ নিয়ে জীবন্ত উপন্যাস। হেন উপন্যাস পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিক লিখেছেন, জানি নে।

মাও-তুন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী—চীনের মহানায়কদের একজন। সেই কথাটা বলে দেওয়া হল আর কি! বলে না দিলে কে বুঝবে, এই চেহারা, এই চালচলনের মানুষ হলেন মাননীয় মন্ত্রী! বলে দিলেও বিশ্বাস হওয়া শক্ত। ফেডারেশন অব চাইনিস রাইটার্সের সভাপতি। খুব ব্যস্ত আজকে—তাঁতের মাকুর মতন ছুটাছুটি করছেন। বসুন, বসতে আজ্ঞা হোক—অভ্যাগতদের বসবার জায়গা দেখিয়ে আবার বাইরের সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়াচ্ছেন সকলের অভ্যর্থনার জন্য। ওরই মধ্যে খাতাটা বাড়িয়ে দিলাম—সই মেরে দিন তো একটা। স্মৃতি থাকবে, চিঠিপত্র লিখব। চীনায় ও ইংরেজিতে নাম লিখে দিলেন।

লেখক ও শিল্পীদের সমাবেশ। বড় কিছু নয়, ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা। সাঁইত্রিশটা দেশের প্রতিনিধিদের মাঝ থেকে সাহিত্য-শিল্পে ছিটগ্রস্তদের বাছাই করে ডাকা হয়েছে। আর চীনা গুণীরা তো আছেনই।

লোক বেশি, অতএব জাত হিসাব করে কয়েকটা টেবিলে ভাগ হওয়া গেল। জাত মানে—এঁরা লেখেন, ওঁরা আঁকেন, ওঁরা থিয়েটার করেন ইত্যাদি। খোদ মাও-তুন অতএব আমাদের টেবিলে। তিনি বলছেন, "আমাদের চীনা জাতি বড় শান্তিপ্রিয়। কখনো তারা পরের রাজ্যে হামলা দেয়নি। আমাদেরই উপর বাইরের লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শান্তির বাণী আজকের নয়—খুব পুরানো আমলের গুণী-জ্ঞানীদের লেখার মধ্যেও এই শান্তির কথা। 'যা তুমি নিজে চাও না, অন্যকে তা কক্ষণো দিও না'—লড়াই সম্পর্কে কনফুসিয়াস বলেছেন। চীনের এক প্রাচীন প্রবাদ—যুদ্ধ হল আগুন, এ নিয়ে খেলা কোরো না, সব ঠাঁই ছড়িয়ে যাবে। বারুদের প্রথম আবিষ্কার হল আমাদের দেশে, কিন্তু সে বস্তু আমরা আগ্নেয়াস্ত্রে ভরিনি, বাজি বানিয়ে লোকের নয়ন বিমোহন করেছি।"

আমি এর মধ্যে ফোঁস করে উঠি একবার। হ্যাঁ মশায়, নিজের দেশ নিয়ে কাহনখানেক তো বলছেন—আমাদের ভারত? আমাদের সৈন্যবাহিনী দেশের সীমানার বাইরে কবে পা বাড়িয়েছে? গিয়েছেন দেশ-বিদেশে ভারতের সাধু-সন্ত জ্ঞানী-গুণীরা—

"তাই বটে! হাজার হাজার মাইল জোড়া দুই দেশের সীমানা। ইতিহাসে তবু হানাহানির একটা দৃষ্টান্ত নেই। আর আজকের দিনে শুধু মাত্র চীন-ভারত নয়—যত লোক সমবেত হয়েছেন, তাঁদের সকলের দেশের ঐকান্তিক কামনা শান্তি। মাতৃভূমিকে ভালবাসি—তাকে উজ্জ্বল গৌরবে গড়ে তুলব শান্তি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে। নানান শ্রেণীর শিল্পী এখানে উপস্থিত—হয়তো এই প্রথম বার আমাদের চাক্ষুষ দেখা, মুখোমুখি এসে বসা—কিন্তু এক সাধারণ শান্তির ভাষা আমাদের। সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রতি জনেই আমরা একটি প্রত্যাশা মনে মনে লালন করছি—পৃথিবীর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। মনের কথা এই একটি মাত্র। এই ভাবনাই আমাদের সকল সাহিত্যের অন্তর্বাহী হয়ে চলবে। এই মীটিঙের পরেও আমি আশা করি, আমাদের মিলন শেষ হবে না—পরস্পরের কাছে পরিচিত থাকব আমরা সকলে, যাতে পৃথিবীর মানুষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দিন দিন নিবিড়তর হয়। চীনা লেখক-শিল্পীরা তোমাদের স্বাস্থ্য-শ্রী ও সাফল্য কামনা করছে..."

তারপরে নিচু গলায় গল্পগুজব চলছে আমাদের। আর যা চলছে—থাক, কথা দিয়েছি, ওসবের পরিচয় দিয়ে আপনাদের লোভ সঞ্চার করব না। জায়গা

বদলাবদলি হচ্ছে পাশাপাশি বসে এ-ওর পরিচয় নেবো বলে। কত জায়গার কত মানুষ—নাম-ঠিকানায় খাতা ভরে গেল। চিঠি লেখালেখি চলে যেন বরাবর। নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেদিন আন্তরিক ভাবেই স্থির করেছিলাম, মানুষ আমরা দূরে দূরে চলে যাচ্ছি বটে কিন্তু চিঠি আমাদের মনগুলোকে এক করে বেঁধে রাখবে। ব্যস, ঐ অবধি। ঠিকানা মতো একখানাও চিঠি লিখি নি আজ অবধি! তিন-চারটে চিঠি এসেছে, তারও জবাব দেওয়া হয়নি।

লেখকেরা রয়্যালটি পান ওখানে দশ থেকে পনের পার্সেন্ট। আগে ভাষা নিয়ে খুব পায়তারা চলত—স্টাইলের নানা বৈচিত্র্য ও বর্ণবাহুল্য। নতুন কালে এখন সে ঝোঁক কেটেছে। সাদামাঠা ভাষায় লিখছেন লেখকেরা, জনগণের সঙ্গে তার ফলে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। লোকে খুব বই পড়ছে, বইয়ের কাটতি হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। আর এই সঙ্গে সাধারণের মুখের ভাষারও উন্নতি হচ্ছে।

গ্রাম্য ভাষাতেও বই লেখা হচ্ছে, কিন্তু সংখ্যায় অত্যন্ত কম। এক গেঁয়ো চাষী আশ্চর্য এক উপন্যাস লিখেছেন—'নরকরাজ্যে'। নতুন-চীন গড়ে উঠবার পর এই ধরুন বছর দুই-তিন মাত্র উন্নত সংস্কৃতির স্পর্শ পেয়েছেন তিনি। পুরানো ইতিহাস নিয়েও নবযুগের উপন্যাস হয়েছে। আর লেখা হচ্ছে—হাসিমস্করায় ঠাসা গল্প, রম্যরচনা। এ বস্তুর খুব চাহিদা। নাটকের নামে চীনা মানুষ চিরকাল পাগল; অভিনয় কিম্বা সিনেমার ছবি দেখবার জন্য লোকে বিশ মাইল বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে গররাজি নয়, সারারাত্রি হয়তো ধৈর্য ধরে বসে আছে। তাই বিস্তর নাটক লেখা হচ্ছে, অভিনয়ও হচ্ছে সুপ্রচুর। ধর্ম নিয়ে লোকের মাথাব্যথা নেই, হালফিল ধর্মের বই বড় একটা বেরুচ্ছে না।

জীবনের সত্য পরিচয় নেবার জন্য লেখকেরা অনেক সময় চাষী শ্রমিক কিম্বা সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে থাকেন। শুধু দর্শক হিসাবে নয়, তাদেরই একজন হয়ে; তাদের কাজকর্ম আশাআকাঙ্ক্ষার ভাগিদার হয়ে। চো লি-বাউ 'ঝড়' উপন্যাস লিখে খুব নাম করেছেন। শহরের আত্মীয়জন ছেড়ে দীর্ঘকাল অজ পাড়াগাঁয়ে পড়েছিলেন ঐ বই লেখার জন্য। আর একজন লেখক—শ্রীযুত রোবিও বলতে লাগলেন, বিস্তর দিন ইংলণ্ডে থেকে আমি শিক্ষা নিয়েছিলাম। কিন্তু আসল শিক্ষা পেলাম দেশেঘরে চাষাভুষোর মধ্যে বসবাস করে। তাদের সঙ্গে জল তুলেছি, বীজ বুনেছি। জীবন বুঝতে হলে কাজকর্ম দেখাই শুধু নয়, তাদের মনের অন্ধি-সন্ধিতে বিচরণ করতে হবে। নইলে চাষী তার জমির

সম্পর্কে গরুবাছুর সম্পর্কে চাষের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে যা ভাবে, কখনো তা জীবন্ত হবে না তোমার বইয়ে। তারা যখন জানবে, নিতান্তই তুমি আপন লোক, তখনই তোমার কাছে মন খুলবে।

যেমন বড় চীনদেশ, ভাষাও তেমনি শতেক রকম। প্রতিটি ভাষা সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া হয়। কতকগুলো ভাষার অক্ষর পর্যন্ত নেই, নতুন করে তাদের অক্ষর বানানো হল। চীনা ছাড়া প্রধান ভাষা হল মাঙ্গোলিয়ান, তিব্বতী এবং আর দু-তিনটি। চীনাটা সব অঞ্চলেই শিখতে হচ্ছে। তিনহাজার বছরের সুপ্রাচীন এই ভাষা বহু কোটিকে জাতীয়তার বাঁধনে একত্র বেঁধেছে।

আমার কয়েকটা বন্ধু আছেন—ঘরে থাকলে কি হবে, তামাম দুনিয়া নখ-দর্পণে নিয়ে বসে আছেন। বার বার তাঁরা বলেছিলেন, গিয়ে লাভটা কি? সাজানো-গোছানো কয়েকটা জিনিষ দেখিয়ে দেবে বই তো নয়! কিন্তু এসে যে বিষম ফেরে পড়লাম। কিছুতে ছাড়ে না, নানান অজুহাতে আটকে আটকে রাখে। এদ্দিন ছিলে কনফারেন্সের তালে—থাকো আর দুটো-পাঁচটা দিন, নিশ্চিন্তে আলাপ-সালাপ করি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে যেমন রেওয়াজ ছিল, ছেলেবয়সে দেখছি। আত্মীয়-কুটুম্ব এলে তাকে ফিরে যেতে দেবে না—ছাতা সারছে, জুতো সারছে। সবজান্তা বন্ধুদের কথা সত্যি হলে তো কাজকর্ম তড়িঘড়ি চুকিয়ে দিয়ে 'আসতে আজ্ঞা হোক' নমস্কার জানাবে; খুঁত চোখে পড়বার আগে সরিয়ে দেবে তাড়াতাড়ি। সাঁইত্রিশটা দেশের পৌনে চারশ' মানুষ—বেছে বেছে দুনিয়ার যত গবেট নিয়ে গেছে এটা হতে পারে না, দু-পাঁচজন বুদ্ধিওয়ালা লোকও থাকতে পারে। অথচ আটকে আটকে রাখছে—এটা কি রকম ব্যাপার বলুন দিকি?

যাই হোক, ছাড় পেয়েছি অবশেষে। যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। এ-দল যাচ্ছে, ও-দল যাচ্ছে। নিচের হলে মালের পাহাড়—গাড়ি ভরতি সেগুলো রওনা হয়ে গেল তো আবার এসে জমছে। হোটেল ফাঁকা হয়ে গেছে, খানা-ঘরে ভিড় নেই।

গা ছড়িয়ে অনেক বেলা অবধি বিছানায় পড়ে আছি। কাজকর্ম নেই, কেউ ডেকে তুলবে না। তারপরে এক সময়ে উঠে যথা ইচ্ছা বেড়িয়ে বেড়াই। আমাদের ভারত-দলের খানিকটা আজ সন্ধ্যায় আরও উত্তরে মুকডেন অঞ্চলে

চললেন। আর ষোল জন আমরা কাল ভোরে সাংহাইয়ে উড়ব। ডক্টর কিচলুর চিকিৎসা-ব্যাপার আছে, তিনি ক'দিন পরে রেলে চড়ে সোজা ক্যান্টনে গিয়ে হাজির হবেন।

স্টেশনে গেলাম সন্ধ্যাবেলা মুকডেন-যাত্রীদের বিদায় দিতে। স্পেশ্যাল গাড়ি, ঘন সবুজ রং। অতি-সম্প্রতি বানিয়েছে এসব গাড়ি। দুটো করে শয্যা প্রতি কামরায়—উপরে আর নিচে; দামি পর্দা, বসবার চেয়ার-টেবিল। কম জায়গার মধ্যে আরামের সকল রকম আয়োজন। জাতীয় সৈন্যবাহিনী স্টেশনে ঢুকল বিদায় দিতে, একপাশে আলাদা হয়ে দাঁড়াল। আরাব দিচ্ছে—হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক? জনারণ্য। গলায় লাল রুমাল জড়ানো পায়োনিয়ার দল—কি মনোরম স্বাস্থ্য, কি হাসি! হাতে কুসুমগুচ্ছ। আমরা আবার ফিরে আসব, সেজন্য প্লাটফরমে ঢোকবার সময় নীল ব্যাজ পরিয়ে দিল। পিকিনের তা-বড় তা-বড় ব্যক্তিরা এসেছেন, তাঁদের বুকেও ঐ নীল ব্যাজ। আভিজাত্য নেই, পদপ্রতিষ্ঠার অভিমানে আলাদা নন কেউ। সরল, উদার, অমায়িক। উল্লাস-চিৎকারে কান পাতা যায় না। আর কাওবিতিয়াং গাঁয়ে দেখেছিলাম, সেই ধরনের ঢোল-কত্তাল বাজাচ্ছে স্টেশনে। গভীর আলিঙ্গনে এ-ওকে বুকে চেপে ধরছে। কত ভালবাসা মানুষে মানুষে! দেখে দেখে তাজ্জব লাগে, চোখের কোণে জল এসে যায়।

ফিরবার সময় কি কাণ্ড! বাচ্চা ছেলেমেয়ে এক দল আটক করল। একটু-আধটু হাত-ঝাঁকুনি দিয়ে সরে পড়ব—তা আমার হাত চেপে ধরেছে তুলতুলে হাতটুকুন দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরও বিস্তর নানা দিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। ভয়াবহ ব্যাপার, পুরোপুরি বন্দী। জড়িয়ে পড়েছে গায়ে গায়ে—নাচছে, নাচতে নাচতে এগিয়ে নিয়ে চলল। আমাকেও একটু-আধটু পা ফেলতে হয়। হাসবেন না, অমন নির্মল অমায়িকতার দাবড়ি খেলেন না তো কখনো—ঐ অবস্থায় পড়লে আপনারা পাগল হয়ে উদ্দাম নৃত্য নাচতেন। দপ করে হঠাৎ জোরালো আলো জ্বলে উঠল ঠিক সামনে। চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিছু আর দেখতে পাই নে। ঘর-ঘর আওয়াজ—এই রেঃ, মোভি-ক্যামেরায় ছবি তুলে নিল। দোভাষি এগিয়ে এলেন করুণাপরবশ হয়ে। ছেলেমেয়েরা শুধালো—আকারে-ইঙ্গিতে বুঝতে পারলাম—কোন দেশের এই ব্যক্তি? হিন্দী? আমি ভারত থেকে এসেছি, পরিচয়টা নিল নর্তন-কুর্দন শান্ত হয়ে যাবার পর। ভারত হোক কিম্বা মেক্সিকো-আবিসিনিয়াই হোক, ওদের কাছে

একই কথা। অচেনা বলে ভয়ডর নেই, মানুষ হলেই হল। হামেশাই যেন মোলাকাত হয়ে থাকে আমাদের সঙ্গে, ভাবখানা এই প্রকার। বাচ্চাদের ওরা এমনি আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা দিচ্ছে।

পিছন দিক থেকে কাঁধের উপর এক ভারী হাত এসে পড়ল। মি ল্যান-ফ্যাং যে! উনিও স্টেশনে এসেছিলেন বিদায় দিতে। ভারিক্কি উভয়েই আমরা—কিন্তু ছোকরাদের মতন কেমন গলাগলি হয়ে ফিরছি! দোভাষিকে দেখা যাচ্ছে না, দরকারও নেই—মুখের কথার গরজটা কি? মিটিমিটি হাসছি এ-ওর দিকে তাকিয়ে।

(৩৭)

একুশে অক্টোবর ভোরবেলা মুখ গোমড়া করে ঘরে বসে আছি। পিকিন ছাড়ব অনতিপরেই, সাতটা নাগাত এসে ডাকবে। এখানে যেন ঘরবাড়ি হয়ে গেছে, আপন জন এরা সকলে। মন বিগড়াবার আরও কারণ, হোটেলের কাউকে কিছু দিতে পারব না। কড়া নিষেধ। লোকগুলোও এমন হয়েছে, বখশিস হাতে দিলে বেজার হয়।

বিদায়বেলা তাই ওদের হাত জড়িয়ে ধরছি, কোলের মধ্যে টেনে নিচ্ছি। বাইরের কত জনেও দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের এই বিদায়যাত্রা দেখছে। তাদেরও চোখ ছলছল করে বুঝি! দোভাষি অনেকে চলল এরোড্রোম অবধি। দোভাষি বলে পরিচয় হল না, আমাদের পরমতম বান্ধব। সেই যে বলে, বুক পেতে দেবো, পায়ে কুশাঙ্কুর না বেঁধে—সত্যি সত্যি তাই যেন পারে ওরা। শুধুই কাজের সম্বন্ধ হলে প্রাণের এত কাছে আসত না।

শহর ছাড়িয়ে এলাম। আর আসব না হয়তো জীবনে, আর ওদের দেখতে পাব না। সকল মানুষ—রাস্তার অজানা মানুষটা অবধি কত ভালো, কত ভদ্র! ইয়ং বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বললাম, সত্যি ভাই, বড্ড খারাপ লাগছে।

ইয়ং বলে, আমাদেরও। তবু বলি, সোয়াস্তিও পাচ্ছি মনে মনে। অহোরাত্রি এত দিন ভয়ে ভয়ে ছিলাম, পাছে তোমাদের কোনরকম কষ্ট হয়। যাবো তোমাদের দেশে—যদি কখনো যোগাযোগ ঘটে। ভারত চোখে দেখবার জন্য বড্ড লোভ।

এত ছেলে-মেয়ে এরোড্রোম চলেছে, সুইং কোথায়? সকাল থেকে তাকে দেখতে পাইনি। মালপত্র ও মানুষগুলো ওজন হওয়ার পরে এক মুশকিল। এত বোঝা প্লেন বইতে পারবে না। কমাও সাড়ে চার-শ’ কিলোগ্রাম। চড়ন্দার আমরা ষোল জন; আর ভারী মাল সবই প্রায় ট্রেনে চলে গেছে। তবু এই। দোষ বাপু তোমাদেরই। দু-হাতে উপহার দিয়েছ—আর এমন খাওয়ান খাইয়েছ মানুষগুলোও ওজনে দেড়া দুনো হয়ে গেছে।

কি করা যায়! মানুষে ছাট-কাট চলে না, জিনিষপত্র কি ফেলে যাওয়া যায়, দেখ। নীলিমা দেবী স্যুটকেশ খুলে নিতান্ত দরকারি কাপড়-চোপড় কিছু বোঁচকায় বেঁধে নিলেন। দেখাদেখি আরও অনেকে বোঁচকা বাঁধলেন। খাঁটি ভারতীয় কায়দার বোঁচকা। বাড়তি জিনিষ ট্রেনে চলে যাবে সাংহাই।

এই সব হচ্ছে—একটা বাস এসে পড়ল। হাতে ফুলের তোড়া—কলধ্বনি করে গুটি দশেক পায়োনিয়র ছেলেমেয়ে নামল। বিশিষ্ট বর্ষীয়ান আরও এক দল এসেছেন—অত সকালে হোটেলে এসে পেঁছিতে পারেননি, সোজা এরোড্রোমে এলেন। সকলের পিছনে—কে বট হে তুমি? সুইং-ইঞা-মি’ ধীরেসুস্থে নামল। চশমা খুলে কাচটা ভাল করে মুছে আবার চোখে পরে। ভারি শান্ত।

আধ ঘন্টা দেরি হয়ে গেছে মাল চালাচালির দরুন। প্লেন ছাড়বে এবার, সিঁড়ি লাগিয়েছে, প্রপেলার ঘুরছে। পায়োনিয়রদের দেওয়া ফুলের তোড়ার আঘ্রাণ নিচ্ছি। ফুলেরই নয় শুধু—কচি কচি সোনার হাতে ফুল তুলে দিয়েছিল, আঘ্রাণ সেগুলিরও। ভিড়ের সর্বশেষ প্রান্তে সুইং—নিকেলের গোল চশমার ফাঁকে নিঃশব্দে চেয়ে রয়েছে।

সুইং, লক্ষ্মী বোনটি, আসি এবারে? চলে যাবার সময় আমাদের ভারতে ‘যাই’ বলে না, বলতে হয় ‘আসি’—

জবাবে সুইং ভারতীয় রীতির একটি নমস্কার করল। কৌতুকি ঝগড়াটে দামাল মেয়েটা ভালমন্দ একটি কথা উচ্চারণ করল না। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে শান্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল শুধু। তার ছবি আজও চোখের উপর দেখতে পাই। নিকেলের গোল চশমা-পরা গম্ভীর ম্লান একটি মুখ।

প্লেন আকাশে উঠল, কত স্নেহ-ভালবাসা ফেলে এলাম ঐ মাঠের প্রান্তে। বিদায় বন্ধু, বিদায়! আর কি কখনো দেখতে পাবো তোমাদের? পর্বত সমুদ্র ও হাজার হাজার মাইল ভূমির ব্যবধানে আবার আমরা তফাৎ হয়ে গেলাম।

কাচের জানলা দিয়ে দৃষ্টি আমার মাটির দিকে তাকিয়ে আকুলি-বিকুলি করছে। মানুষ এমন ভালো! তুমি একটুও জানো না, দুনিয়া-ভরা কত আত্মীয়তা তোমার জন্য! আমার ভাগ্যদেবতাকে আমি বার বার প্রণাম করি। ভুবনের কত রূপ দেখে গেলাম, ভুবনের দেশে দেশে কত পরমাশ্চর্য সুন্দর মানুষ!

এক পাক দিয়ে গ্রীষ্মপ্রাসাদ। বিশাল লেক, জলের উপর ঘর, মাটি কেটে পাহাড় উঁচু-করা, পাহাড়ের উপরের হর্ম্যমালা—ঐ যে গ্রীষ্মপ্রাসাদ, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। আর এক দিন বিমুগ্ধ সম্ভ্রমে কক্ষ-অলিন্দ-চত্বরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, আজকে চাঁদ-তারাদের মতন আকাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখছি। দেখে হাসি পায়। শ্বেতবরণ জয়স্তম্ভ—কোন এক মহারাজা রাজদম্ভ পাথরে গেঁথে পাকা করে গেছেন। স্তম্ভটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হচ্ছে এই উপর থেকে। মহারাজা ভেবেছিলেন কি বিশাল কীর্তিই না স্থাপন করে যাচ্ছি! তখন যে মানুষের উড়বার পাখা হয়নি। আকাশ থেকে তাকিয়ে দেখলে নিজেরই তাঁর লজ্জা করত।

দিনটা ভালো নয়, জোর বাতাস বইছে। কাল সর্বক্ষণ টিপটিপ বৃষ্টি হয়েছে, আজকেও সূর্য মুখ দেখালেন না এখন অবধি। নগর-গ্রাম চৌবন্দি ক্ষেত-খামার, এবং কারখানার খোপ-কাটা ছাত দেখতে দেখতে—হঠাৎ এক সময় ডুবে গেলাম মেঘ ও কুয়াশা-সমুদ্রের মাঝখানে।

স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে দিক্‌চিহ্নহীন আকাশে উল্কা-গতিতে ছুটেছি। বিচিত্র অনুভূতি। ধরণীর সঙ্গে কোন বন্ধন নেই। কান দুটো আচ্ছা করে তুলো এঁটে বধির করে দিয়েছি। কর্মহীন চক্ষু দুটো অলস-ভাবে কামরাটুকুর মধ্যে ঘোরা-ফেরা করছে; এদিকে-ওদিকে লেখা কয়েকটা পড়ব—তা-ও চীনা হিজিবিজি। তাজ্জব ভাষাপ্রীতি এদের। সেদিনকার সেই যে লেখক-শিল্পী সমাবেশ, তাতে এক কাণ্ড হল। সেই কথা মনে পড়ছে। মাও-তুন বক্তৃতা করছেন—দোভাষি মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি করে যাচ্ছে।

লাগসই কথা বলতে পারছে না, মাও-তুন শুধরে দিলেন তাকে দু-তিন বার। অথচ নিজে কিছুতে ইংরেজি বলবেন না—ইজ্জতহানি হয়।

তাক বুঝে হোস্টেস বসবার আসনটা নিচু করে দিল। বাঙ্ক থেকে কম্বল নামিয়ে গায়ে চড়াবার উদ্যোগ করছিল, হাত নেড়ে নিষেধ করলাম। তাকিয়ে দেখি, ইতিমধ্যে কামরার বাকি প্রাণীগুলি কম্বলের তলে চোখ বুজেছেন। জাগরণ আর ঘুমে যেখানে কোন তফাৎ নেই, মিছে কষ্ট করে চোখ মেলে থাকে বোকারাই।

বেলা দুটোয় প্লেন ভুঁয়ে নামল। সাংহাই। প্লেনের ভিতরে সবাই পথ করে দিলেন, আমি আগে নামব। নেমে ক্যামেরার আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাচ্চার হাতের ফুলের মালা নেবো সর্বাগ্রে। ওঁরা সঙ্গে থাকবেন। দলনেতা কিচলু বরাবর এই ঝক্কি কুলিয়ে এসেছেন। তিনি পিকিনে। তখন বুঝিনি, ষড়যন্ত্র আছে এর পিছনে।

সারবন্দি মোটরকার—বড়লোকের বিয়ের শোভাযাত্রার মতো রাস্তা কাঁপিয়ে শহরতলী ছাড়িয়ে আমরা চললাম। অবশেষে আসল-শহর। পরিচ্ছন্ন, আধুনিক। পিচ-দেওয়া ঝকমকে চওড়া রাস্তা। পনের তলা, বিশ তলা, তিরিশ তলা ঘর-বাড়ি। নগর-পরিকল্পনা পশ্চিমি মগজের। অনেক বছর ধরে মনের মতো করে গড়েছিল; আজকে তাদের দেশেঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। পরের জায়গায় ফোপরদালালি আর নয়। সাদা মানুষ তবু অবশ্য দশ-বিশটার দেখা মেলে—পিকিনের চেয়ে অনেক বেশি। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে তারা পথ চলে—ভূত হয়ে চলছে যেন। ভূতই বটে, সকল প্রতাপ অস্তমিত। কেউ আজ সম্ভ্রম করে না, প্রাণ-ধারণের গ্লানি পদে পদে। বরাবর যাদের কুকুর-বিড়াল ভেবে এসেছে, তারাই মাতব্বর। নিতান্তই পেটের দায়ে, যে ক'টা দিন পারা যায়, চোখ-কান বুজে পড়ে আছে।

আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকার সামনে গাড়ি একে একে এসে থামতে লাগল। ক্যাথে হোটেল আগেকার নাম, এখন কিংকং হোটেল। সিঁড়ি নেই, হলের এদিক-ওদিক চারটে লিফট অবিরত ওঠা-নামা করছে। আচ্ছা মশায়, বিদ্যুৎ-সরবরাহ বানচাল হয়ে লিফট যদি অচল হয়, তখনকার উপায় ? এত বড় বাড়ির একটা সিঁড়ি হয়নি কেন ?

সে যে প্রায় স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে দাঁড়াত! সিঁড়ি ভেঙে উঠবে কোন জন? হোটেলের নিজস্ব বিদ্যুৎ-তৈরির ব্যবস্থা আছে। শহরের বিদ্যুৎ বন্ধ হল তো বয়ে গেল—তক্ষুণি নিজেদের কল চালু করে দেবো।

এগারো তলায় নিয়ে তুলল। ঐখানে স্থিতি। খেতে হবে একতলা নেমে গিয়ে—দশ তলায়। লাউঞ্জে বসে কাপ দুই সবুজ চা খেয়ে চাঙ্গা হলাম। সে বস্তু খান নি বোধ হয় আপনারা—দুধ-চিনি ঠেকালেই বিস্বাদ হয়ে যাবে, গন্ধটুকু থাকবে না।

ঘরে ঢুকে জানলায় দাঁড়ালাম। শহর কত নিচে, মানুষগুলি গুড়িগুড়ি কলের পুতুলের মতন। আমরা আছি রীতিমত উঁচু মেজাজে। আকাশে উড়ে এসে যেখানটায় বাসা দিল, সে-ও আধেক আকাশ। মস্ত বড় ঘর—তার মধ্যে যথারীতি আমি এবং ক্ষিতীশ।

(৩৮)

দরজায় ঠকঠাক। আলনার কোটটা গায়ে চাপিয়ে এক মুহূর্তে ভদ্রলোক হয়ে বসি।

আসুন—

আসছেন তো আসছেনই। দলে যত আছেন সকলেই। অত জনের বসবার জায়গা কোথায় দিই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলল।

কিচলু তো আসেন নি। নেতা বিহনে কি করে চলে? নেতা ঠিক করতে হবে একজনকে।

বেশ, হোক তবে তাই—

তৎক্ষণাৎ নেতার নাম প্রস্তাব, সমর্থন এবং সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনান্তর ঝটপট সকলে বেরিয়ে গেলেন। বিচারক যেমন রায় দিয়ে কামরায় ঢুকে যান —তাকিয়ে দেখেন না, হতভাগ্য আসামির অবস্থাটা কি দাঁড়াল। আধ মিনিটে শেষ। আমার একটা কথা শোনাবারও ফুরসৎ হল না। দলবল সাজিয়ে তৈরি হয়ে ঘরে ঢুকেছেন, আগে তা কেমন করে বুঝব?

তা যেন হল। কিন্তু নেতা হওয়ার ধকল যে বিস্তর! যেখানে পা ফেল-বেন, আদ্য কিম্বা অন্ত ভাগে সভা একটু হবেই। নেতা মশায়ের সেই সময়ে

জবান ছাড়তে হবে। ভারতীয় মানুষ—বাক্যের ব্যাপারে অবশ্য নিতান্ত অপারগ নই। আর একটা আছে— অতিথির সম্মাননায় পয়লা মওলায় বিরাট ভোজ। অধিকন্তু ন দোষায় হিসাবে আবার বিদায়ভোজেরও প্রয়োজন থাকে অনেক জায়গায়। এবম্বিধ ভোজসভায় ইতিপূর্বে একটেরে বসে আত্মরক্ষা করেছি। নজর ফাঁকি দিয়ে পাঁচ বছরের বাসি-ডিম এবং ঐ জাতীয় বাছাই পদগুলি বেমালুম ডিমের তলায় চালান করেছি। কিন্তু নেতাকে বসতে হবে কেন্দ্রস্থলের বড় টেবিলে—ও-তরফের বাছা বাছা মাতব্বরের সঙ্গে। কি খাচ্ছেন না খাচ্ছেন, ঘূর্ণ্যমান বহু-তারকা সেদিকে সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখেছে। এমনিতরো শতেক বিপদ নেতার।

ফাঁসির হুকুমে আপিল চলে। সেক্রেটারি-জেনারেল রমেশচন্দ্রের কাছে অতএব ধর্না দিয়ে পড়লাম। কিন্তু পাষাণ অধিক মাত্রায় গলানো গেল না। শেষ পর্যন্ত রফা হল—নেতা আমিই; বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর দিল্লির যজ্ঞদত্ত শর্মা আমায় মন্ত্রণাদান করবেন।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার অতিথির খাতিরে রাত্রিবেলা নাচ-অপেরায় দরাজ আয়োজন। সন্ধ্যায় ভোজের হাঙ্গামা। ইতিমধ্যে ঘুরে ঘুরে শহরের যেটুকু দেখা যায়।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। থামবার নয়—চলছে তো চলছেই। নতুন দোভাষি আমার গাড়িতে যাচ্ছে, মেয়েটির নাম তুন সু-সে (Tung Shu-Tse)। অধ্যাপনার কাজে ঢুকেছে সম্প্রতি। ভাল মেয়ে, খাসা ইংরেজি বলে—নয়তো একফোঁটা মানুষটাকে অধ্যাপক করে! কিন্তু বৃষ্টিজলে পণ্ড করে দিল সমস্ত। নামতে পারছি না, গাড়ির খোলে বসে বসে কি জায়গা দেখা হয়? দেবরাজ, ক্ষমা দাও—কম সময়ে কত কি দেখবার! আমরা চলে গেলে যত খুশি তুমি জল ঢেলো।

চীনের সব চেয়ে বড় শহর সাংহাই। বাঁধানো পোস্তা দিয়ে চলেছি তরঙ্গিনী হোয়াং-পুর কিনারা ধরে। সমুদ্র বেশি দূরে নয়। মস্ত বড় বন্দর। নানকিনের সন্ধির মহিমায় যেসব জায়গা বিদেশির করায়ত্ত হয়েছিল, তার মধ্যে সকলের সেরা। ক-বছর আগেও বিদেশি মানোয়ারি জাহাজ ঐ জলের উপরে ঘুরে ঘুরে বিদেশি স্বার্থ পাহারা দিত; চীনের মানুষজন উপোসি রেখে সাত

সমুদ্র-পারে খাদ্য পাচার করত। পরগাছারা বিদেয় হয়েছে। জাহাজঘাটায় তাই ভিড় নেই—নিজেদের যে দু-পাঁচটা জাহাজ, তারাই গতর ছড়িয়ে আছে। ঐ যে সব বড় বড় বাড়ি—এমনধারা নিরামিষ ছিল কি আগে? হোটেল-রেস্তরা, পতিতালয়—সারা রাত আমোদ-স্ফূর্তি হৈ-হল্লা! সারা দুনিয়ার মানুষ আসত আমোদ লুঠতে—সাংহাইর নাম দিয়েছিল 'পূব অঞ্চলের প্যারি'। বিদেশিদের জন্য আলাদা এক পাড়া—ফ্রেঞ্চ টাউন। নামেই মালুম—মানে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। ফ্রেঞ্চ টাউনের বড় বড় বাড়ির ছায়ান্ধকারে ভাঙাচোরা বস্তির মধ্যে কীটের মতন জীর্ণ-শীর্ণ চীনা ভিক্ষুকের দল। নদীর এধারে-ওধারে ফ্যাক্টরিগুলোর মালিক সমস্তই বিদেশি। আটটার ভোঁ বাজলে কোথা থেকে মজদুরের দল কিলবিল করে আসত, ফ্যাক্টরি বন্ধ হলে আবার নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়ত তারা।

এখন ভিন্ন এক জায়গা। ভিখারি নেই, পতিতা নেই। স্ফূর্তি আর মাতলামির জায়গা হোটেল-রেস্তোরার বাড়িগুলোয় রকমারি জন-প্রতিষ্ঠান হয়েছে। স্বাস্থ্য ও সুরুচির উল্লাস সর্বত্র। কুয়োমিনটাং সৈন্যেরা বোমা মেরে মেরে শহরের বুকে অগণ্য বিষাক্ত ঘায়ের সৃষ্টি করেছিল, বেমালুম এরা আরোগ্য করে ফেলেছে।

ভিক্ষা আর পতিতাবৃত্তি নির্মূল হল—গল্পটা বলতে হবে নাকি? ঝট-পট এখন বই শেষ করতে চাই, কত আর গল্প শোনাবো? তুন মেয়েটা দেমাক করছিল—আদিম কাল-থেকে-আসা এত পুরাণো ব্যাধি ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে আমরা নিরাময় করে ফেললাম। পতিতালয়ে আগের সন্ধ্যায় মধুপায়ীরা ভিড় জমিয়েছিল, পরের সন্ধ্যায় এসে দেখে ভোঁ-ভোঁ। নির্জন ঘরবাড়ি—একটি হতভাগিনী নেই কোন জানলার ধারে। একটা-দুটো বাড়ি নয়, গোটা শহরই পতিতাশূন্য। তাই বা কেন—পতিতা নেই মহাচীনের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত কোন জায়গায়।

মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে নিয়ে গবর্নমেন্ট নয় ওখানে—রাজশক্তি দেশের সর্বমানুষের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে। নতুন আইন হবার আগে দেশময় জানান দেওয়া হয়। মীটিং করে, ভালমন্দ বিচার-বিবেচনা করে, প্রস্তাব পাশ করে বিভিন্ন ইউনিয়ন। মাসের পর মাস ধরে চলে এই সমস্ত। তারপরে আইনটা পাশ হতে লাগে দশ-বিশ মিনিট মাত্র; বক্তৃতাদি আগেভাগে চুকিয়ে রাখা হয় আইন-সভায় নয়—শহর-গ্রামের গণমানুষের মধ্যে। দেহ বিক্রি

করা অথবা অর্থমূলে দেহ কেনা বে-আইনি—আইনটা পাশ হল ধরুন বেলা দুটোর সময় পিকিন শহরে। তিনটে নাগাত দেখা গেল শহরের পতিতালয়গুলোয় সরকারি লোক হানা দিয়েছে—হাতে এক এক ফর্দ। তুমি শ্রীমতী অমুক বুড়ো অশক্ত হয়েছ—বেখরচায় সরকারি আশ্রমে গিয়ে ওঠো। তুমি চলে যাও অমুক জায়গায় নার্সিং শিখতে, তুমি অমুক ফ্যাক্টরিতে। তোমার অসুখ আছে—অমুক হাসপাতালে চলে যাও। এ বাচ্চাটি অমুক ইস্কুলের বোর্ডিং-এ যাবে; এটি অমুক নার্সারি-হোমে। এই যে হল, এটা পিকিন বা অমনি একটা-দুটো জায়গায় নয়—খবর নিয়ে দেখুন, দেশের সর্বত্র। আগে থেকে বিভিন্ন সমিতির মারফত তালিকা বানিয়ে বিলি-ব্যবস্থা করে রেখেছে; শুধু আইন করেই দায় খালাস নয়। ভিখারি সম্পর্কেও এমনি ব্যাপার। দেশের মধ্যে অপচয় বন্ধ—সেটা জিনিষপত্র জীবজন্তু এবং বিশেষ করে মানুষের সম্পর্কেই। সেদিনের সামাজিক বর্জনারা আজকে তাই হীরা-মাণিক-কোহিনুর হয়ে উঠেছে। বিয়েথাওয়া করে সংসারধর্ম করছে অনেক মেয়ে। নার্স হয়েছে, রেলের গার্ড-ড্রাইভার হয়েছে। কয়েকটি স্বচক্ষে দেখলাম আমরা। আর দশটির মতন সমাজের সম্মানিতা মেয়ে—স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ঝলমল।

অপেরায় তিনটে পালা একের পর এক। রাত কাবার করে ছাড়বে! নাচ আর গান, গান আর নাচ। সে আর দেখাই কেমন করে আপনাদের—দু-কথায় গল্প তিনটে বলে দিই। পয়লা পালা পৌরাণিক—'সিচাউ শহরের গল্প'। সিচাউর কাছে রামধনু-সাঁকোর নিচে জলকন্যা থাকে। নগরপালের ছেলে সি টিং-ফ্যাংকে জলকন্যা ভালবেসে ফেলল; মায়া করে তাকে জলতলের প্রাসাদে নিয়ে এলো বিয়েথাওয়ার জন্য। সি'র কিন্তু কনে পছন্দ নয়। বিয়ের ভোজের মধ্যে সে জলকন্যাকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে, তার কণ্ঠ থেকে মায়ামুক্তা নিয়ে জলতল থেকে পালিয়ে উপরে উঠে গেল। জলকন্যা ক্ষেপে গেল প্রতারিত হয়ে; বন্যায় শহর ভাসিয়ে দিল। লোকের দুঃখের অবধি নেই। জলকন্যার উপরওয়ালা দেব-রাজপুত্র। জলকন্যার কাণ্ড দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দেবসৈন্য পাঠালেন তাকে দমনের জন্য। নদীর নিচে বিষম লড়াই। জলকন্যা হেরে গেল অবশেষে।

পরেরটা ঐতিহাসিক পালা—'প্রিয়তমার সঙ্গে রাজার বিচ্ছেদ'। খৃস্টপূর্ব

২০৭ অব্দের ব্যাপার। অত্যাচারী চিন সি-ওয়াঙের বিরুদ্ধে লড়াই করছে লিউ পোঙের নেতৃত্বে চাষীর দল, এবং সিয়াং উ। লড়াই জিতে সিয়াং উ হল রাজচক্রবর্তী আর লিউ পোং হল হানের রাজা। তার পরে বেধে গেল সিয়াং উ আর লিউ পোঙের মধ্যে। সিয়াঙের মন বড় খারাপ—লড়াইয়ে সুবিধা করা যাচ্ছে না। সিয়াঙের উপপত্নী উ চি অসি-নৃত্য করল সিয়াংকে খুশি করবার জন্য। উন্মাদক নৃত্যে নবোৎসাহে মেতে উঠল সিয়াং; ইয়াং সি নদীর পূর্ব-পারে সে নতুন করে ব্যূহ রচনা করল। করল বটে, কিন্তু মন যায় না রূপসী প্রিয়া উ চি'কে ছেড়ে যেতে। উ চি অবশেষে আত্মহত্যা করে পথ নিষ্কন্টক করে দিল। বিরহব্যাকুল সিয়াং হেরে গেল লড়াইতে; আত্মহত্যা করে সে-ও প্রিয়তমার পথ নিল। লিউ পোং সর্বময় হয়ে হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করল—দেশব্যাপ্ত চাষী-বিদ্রোহের ফল আত্মসাৎ করল একা একটি লোক।

শেষ পালাটা পরী-কাহিনী—'মায়াপদ্মের লণ্ঠন'। উত্তর-চীনের আকাশ জুড়ে অপরূপ হ-সান পর্বত। এই পর্বত নিয়ে যুগে যুগে বিস্তর পরী-কাহিনী চলেছে। এর ল্যাং-সেং দেব-রাজপুত্র। ছোট বোন দেবীকে নিয়ে সে পর্বতের উঁচু চূড়ায় থাকত। হ-সান পর্বতের সর্বোত্তম ঐশ্বর্য হল মায়াপদ্মের লণ্ঠন। পরী-জগতের কর্তা হবার জন্য এর এই লণ্ঠন চুরি করল, লোহাদৈত্যকে পর্বত চাপা দিল, নিজের বোন দেবীকে রাখল অত্যন্ত কঠোর শাসনে।

লিউ ইয়েন-চ্যাং কবি; অফিসের পরীক্ষায় ফেল হয়ে মনমরা ভাবে বাড়ি ফিরছে। হ-সান পার হবার সময় পশ্চিম-চূড়ার মন্দিরে সে রাত কাটাচ্ছে। সেই মন্দিরে দেব-রাজপুত্র ও দেবীর মূর্তি। দেবীর রূপ দেখে পাগল হয়ে কবি দেয়ালে তার নামে এক কবিতা লিখল। জ্যোৎস্না রাত। লিউ ঘুমিয়ে পড়েছে—দেবী তখন মন্দিরে এলো। পড়ল দেয়ালের কবিতা।

সকালবেলা বড় কুয়াশা। তারই মধ্যে লিউ মন্দির ছেড়ে বেরুল। দেব-রাজপুত্রের এক ভয়ানক কুকুর—সে তাড়া করেছে লিউকে। দেবী আর তার সহচরী লিন চি দেখতে পেলো লিউর অবস্থা। হ-সানের চূড়ায় গিয়ে জোর করে তারা মায়াপদ্মের লণ্ঠন নিল লিউকে বাঁচাবার জন্য। লিউয়ের সঙ্গে দেবীর বিয়ে হল; লোহা-দৈত্যও মুক্তি পেলো। স্বামী নিয়ে দেবী মহাসুখে থাকে। এদিকে দেব-রাজপুত্র কুকুরের কাছে সমস্ত শুনে বিষম খাপ্পা। কুকুর মায়া-লণ্ঠন চুরি করে নিল। দেবী তখন লিউকে দেশে পাঠিয়ে দিল, নয়তো

ভাইয়ের আক্রোশ থেকে তাকে বাঁচানো অসম্ভব। দেবীর এক ছেলে হল—চেং সিয়াং। এর বাচ্চাটাকে মেরে ফেলছিল, লিন চি অনেক কৌশলে বাঁচাল। তখন দেবীকেই পর্বতের নিচে আটকে রাখল এর। লিন-চি লিউর কাছে গিয়ে সমস্ত খবর দিল। কিন্তু কি করতে পারে শক্তিহীন নিঃসহায় লিউ!

পনের বছর কেটেছে, চেং সিয়াং বড় হয়েছে। সবাই তাকে ডাইনির ছেলে বলে। লিউ একদিন ছেলেকে সব বলল। রাত্রে চেং কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল মায়ের উদ্ধারের জন্য। অসংখ্য বাধাবিপত্তি। শেষটা লোহা-দৈত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। চেঙের মায়ের উদ্ধারের জন্য দৈত্য সকল সাহায্য করবে। দেব-রাজপুত্রকে কিছুতে খুঁজে পায় না। মন্দিরে তার যে মূর্তি ছিল, চেং এক কোপে সেই মূর্তির গলা কেটে ফেলল। এর আর কুকুর বেরিয়ে এলো সেই মুহূর্তে। কুকুরকে মেরে ফেলল, এরকে লড়াইয়ে হারিয়ে দিল। পাহাড় কেটে দু-ভাগ করে মায়ের উদ্ধার করল চেং সিয়াং।

(৩৯)

অপেরা থেকে ফিরেছি গভীর রাত্রে, কথাবার্তার তখন সময় ছিল না। পরদিন ব্রেকফাস্টের আগেই রমেশচন্দ্র তুন ও আর কয়েকটিকে নিয়ে ঘরে এলেন। নেতা তুমি—চটপট এখানকার প্রোগ্রাম বানিয়ে ফেল। দেশে ফিরবার জন্য ব্যস্ত সকলে। পরের ভাত খেয়ে গতর বাগানো যাচ্ছে বটে—তা-হলেও দেশে কাজ-কর্ম রয়েছে। তারও বড় কথা, লজ্জা-শরম আছে তো কিঞ্চিৎ—কত দিন আর থাকা যায় পরের কাঁধে চেপে? সময় কম, দেখবার জিনিস বিস্তর। ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটবার প্রোগ্রাম বানাও দিকি একটা!

চার জায়গায় আজকে—কর্মিকদের সংস্কৃতি-ভবন, সান ইয়াৎ-সেনের বাড়ি, একটা কর্মিকপল্লী আর কাপড়-চোপড় ছোপানোর সরকারি ফ্যাক্টরি। আর এক ব্যাপার আছে—কাল বহু লক্ষ লোকের বিরাট সভা। পিকিনের পাট চুকিয়ে বিস্তর প্রতিনিধি সাংহাইয়ে জমেছেন। শান্তি-সম্মেলন থেকে ফিরে এলে—এখানকার মানুষও শান্তির কথা শুনতে চায়। পিকিনের মতো সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ নেই, তবু যে দেশগুলো হাজির আছে সকলের তরফ থেকে বলা হবে কিছু কিছু। ভারতের দু-জন বলবেন। দলনেতা হিসাবে আমার রেহাই নেই—অপর কে বলবেন, ঠিকঠাক করে ফেল।

জওহরলালের দেশের মানুষ—মুখ চুলকানো ব্যাধি অনেকেরই। তাই ঠিক করেছি, বক্তৃতা আর একজন-দু'জনের একচেটিয়া কারবার থাকবে না; যত জনকে পারি, সুযোগ দেবো। সুযোগ পেয়েও না যদি বলেন, তখন আমার দোষ রইল না।

পশুপতি বেংকট রাঘবিয়া পার্লামেন্টের সদস্য—তাঁকে বললাম বক্তৃতা তৈরি করবার জন্য। রাতের মধ্যে আমায় দেবেন; দুই বক্তৃতা সকালবেলা ওদের কাছে দেবো চীনা তর্জমার জন্য। আমরা তো ইংরেজিতে বলব, সঙ্গে সঙ্গে চীনায় না বলে দিলে সাধারণে কেউ বুঝবে না।

কর্মিকদের সংস্কৃতি-ভবন। মস্ত বড় বাড়ি—নতুন রংচং এবং একটু-আধটু রদবদল হয়ে আরও ঝকমকে হয়েছে। কুয়োমিনটাং আমলে হোটেল ছিল—'প্রাচ্য হোটেল'। সেই সব হোটেলের একটি, যার নামে স্ফূর্তিবাজ বিদেশির মুখে লালা ঝরত। ১৯৫০ অব্দের ১লা অক্টোবর সংস্কৃতি-ভবন রূপে বাড়ির দরজা খুলে দেওয়া হল কর্মিক সাধারণের জন্য। রোজ তখন হাজার পাঁচেক লোক আসত, এখন আসে কমসে কম দশ হাজার।

নানান বিভাগ—একটা হল, শিক্ষা ও প্রচার বিভাগ। সাহিত্য, রাজনীতি ও কারু-শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা হয় সপ্তাহে অন্ততপক্ষে একবার। দেশের ইন্দ্র-চন্দ্রেরা এসে বক্তৃতা দিয়ে যান এখানে। লাইব্রেরি আছে—আটাত্তর হাজার বই। শ-দুয়েক বই রোজ বাড়ি নিয়ে যায় পড়তে; হাজার তিনেক লোক পাঠাগারে বসে পড়ে। পাঠাগার অনেকগুলো—ঘুরে ঘুরে দেখছি। বই-কাগজ টেবিলে সাজানো সুস্বাদু খাদ্যের মতো—লোকগুলো অনন্য মনে গোগ্রাসে গিলছে। যারা বেশি এগিয়েছে, তাদের পাঠাগার স্বতন্ত্র; বেশি ছিমছাম—নিস্তব্ধতা সেখানে বেশি। বাড়িটার তেতলায় বইয়ের দোকান। পড়ে পড়ে কর্মিকদের নেশা ধরে গেছে, নিজস্ব বই না হলে তৃপ্তি হয় না। দৈনিক হাজার বই বিক্রি—ওদের জন্যে বিশেষ সস্তা সংস্করণ।

এরই মধ্যে একবার এক প্রশস্ত হলঘরে টেনে নিয়ে লম্বা টেবিলের এধারে-ওধারে চারিয়ে বসিয়ে দিল। (এবং টেবিলের উপর—উঁহু, কতকগুলো প্লেট-কাপ, তাতে কোন কিছু ছিল কিনা মনে পড়ছে না।) সেক্রেটারি মশায় আমাদের সম্বর্ধনা জানালেন, আমাকেও পাল্টা জবাব দিতে হল তার। এই এক প্রতি-যোগিতা—কে কার সম্বন্ধে কত ভাল ভাল কথা বলতে পারে!

অনেকগুলো ঘর নিয়ে রকমারি জিনিসের একজিবিসন। যেখানে

যাই, একজিবিসন আছেই। মানুষকে শেখাবার এমন সহজ কৌশল আর নেই। যন্ত্রপাতির দিক দিয়ে বিস্তর এগিয়েছে এরা—ট্রলিবাস বানাচ্ছে নিজেরা, বয়লারের বিস্তর উন্নতি করেছে। নানা ধরনের বৈদ্যুতিক কলকব্জা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। সহজে ও সস্তায় বাড়ি তৈয়ারির নানা কায়দা বের করেছে নিতান্ত এক সাধারণ মিস্ত্রি—মেজে পালিশ করা, মশলা মাখা ও গাঁথনির নানা পদ্ধতি। এমনিতরো অনেক আবিষ্কারেরই গৌরব হাতে-কলমে কাজ-করা ওস্তাদ কর্মিদের, বই-পড়া ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকের নয়। কাজ করতে করতে মাথায় এসে গেছে নতুন ভালো কায়দা। এক মেয়ে-কর্মিক আবিষ্কার করেছে কাপড় বোনার নতুন রীতি—কম সময়ে কম দামে ভাল জিনিস উৎরাবে। দেখতে দেখতে এই কথাই বারম্বার মনে আসে—কর্মিকরা যদি উপলব্ধি করে তারা খাটছে নিজের দেশ ও নিজ মানুষদের জন্য, তাদের গতর-ঘামানো লাভ অন্য কেউ লুঠ করে নেবে না, তবে তো অসাধ্যসাধন হয় তাদের দিয়ে।

সাংহাইয়ের কর্মিকদের মোট সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ সত্তর হাজার। কারখানা-মজদুরের যে চেহারা আমাদের মনে আসে, সে আঁধার উত্তীর্ণ হয়ে এরা আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু মাত্র সংস্কৃতি-ভবন নয়, ছোট-মাঝারি বিস্তর ক্লাব আছে। অনেকে ছবি আঁকে—কর্মিকদের আঁকা বিস্তর ছবি দেয়ালে। উডকাটও আছে। কবিতা লেখে—তা-ও রেখে দিয়েছে একজিবি-সনে। পোস্টার ও প্রচারপত্র; গোটা চীনদেশের অগ্রগমনের ছবি। নবজাগ্রত জাতি দুরন্ত বেগে সকল দিকে এগিয়ে চলেছে—ছবি দেখেই সেটা মালুম হবে। ছবিতে লেখায় ও জিনিসপত্রে কর্মিক-আন্দোলনের ইতিহাস সাজিয়ে-রেখেছে, কয়েকটা ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই ইতিহাস মনের উপর জ্বলজ্বল করবে। ১৯২৯ অব্দ থেকে আন্দোলনের শুরু বলা যায়—রাজনীতিক অর্থনীতিক উভয়মুখী। তার আগেও ছিল, কিন্তু সে হল ইতস্তত. বিস্ফোরণ—নিয়মবদ্ধ কিছু নয়। পয়লা মওকায় আন্দোলনের নেতাদের জেলে ঢোকালো—সর্বত্র যেমন হয়ে থাকে। তাতে ফল হল না—সর্বত্র যেমন দেখা যায়। কুচাং-ফুং নামে এক মেয়েকে মেরে ফেলল (১৯২৩ অব্দ); থানার সামনে বিরাট মিছিল—সেই পুরানো ছবি দেখতে পাচ্ছি। জাপান ও আমেরিকার মিলিত-অভিযান। কী কষ্ট, কী কষ্ট দেশের মানুষের! কত মেরেছে, কত জনের হাত-পা কেটেছে! তারও বিস্তর ছবি।

১। হ্যাংচাউ অমিতাভ বুদ্ধ-মন্দিরে—শ্রমণদের সঙ্গে

২। সাংহাই কটন মিলের প্রাঙ্গণে

শহর জুড়ে সাধারণ-ধর্মঘট। সেই সময়কার কাগজে ধর্মঘটের ছবি দিয়েছিল—খবরের কাগজের সেই অস্পষ্ট ছবি কেটে রেখে দিয়েছে। তার পরে বন্যা এলো আন্দোলনের। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ছে। সে আমলের নগণ্য তরুণ কর্মীদের সব ফোটো। এঁদের অনেকে আজ নতুন-চীনের কর্ণধার। প্রাণ গেছে কত জনের—নির্জন সেলের ভিতর মৃত্যুর মুখোমুখি বসে শান্তচিত্তে কত ভাবনা ভেবেছেন, বন্ধুদের লেখা চিঠিপত্রে তার পরিচয়। পালা বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় অভিনয় করে জাপানকে রুখতে বলেছে। আহা, ভাগ্যিস ফোটোগুলো তুলে রেখেছিল—তাই তো আন্দোলনের নানা পর্যায়ের খানিকটা আন্দাজ নিয়ে ফিরলাম। ১৯৩৮ অব্দে লড়াইয়ে জখম হয়ে এক মৃত্যুপথযাত্রিনী লিখছে, “আমার মরণ কিছুই নয়—এক হয়ে সকলে সংগ্রাম করে যাও।” ১৯৪৭ অব্দে মার্কিন জিনিসপত্র বয়কট করল, তাই নিয়েই বা মারা পড়ল কত মানুষ!

আর দেখলাম, এক সর্বত্যাগী তরুণের প্রতিমূর্তি—ওয়াং সাও-হো। ১৯৪৮ অব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর কুয়োমিনটাঙের লোক গুলি করে মেরেছিল তাকে। প্রতিমূর্তির নিচে এক কাঠের বাক্স—তার মধ্যে শহীদের জামা-পাজামা-টুপি, বই-খাতা-ফাউন্টেনপেন। গুলিতে জামা ফুটো হয়ে গেছে, রক্ত বেরিয়ে চাপ-চাপ এঁটে রয়েছে জামার উপর। সমস্ত আছে। কলেজি ছেলে, ক্লাসের অংক কষা রয়েছে খাতায়। এই তো সেদিন—চারটে বছর আগে সে এই সব অংক কষেছে। চোখ জলে ভরে আসে। আমার কিশোর বয়সে কয়েক জনকে দেখেছি—যেদিন ডাক এলো, প্রাণ যেন হাতের মুঠোয় নিয়ে হাসতে হাসতে ছুড়ে দিল। ক-জনই বা মনে রেখেছে তাদের! ওয়াঙের ঐ মূর্তির পাশে তাদের মুখগুলো ভেসে উঠছে। ওরা সকলে এক।

সান ইয়াৎ-সেনের বাড়ি। আগে এক সামান্য বাড়ির গোটা দুই-তিন ঘর নিয়ে তিনি থাকতেন। এক কানাডাপ্রবাসী বন্ধু (চীনেরই মানুষ) এই বাড়ি করে দিয়েছিলেন। দোতলা ছোট বাড়ি—একটু লন আছে, শহরের দৈত্যাকার বাড়িগুলোর সঙ্গে তুলনা হয় না। ছোটখাটো ছিমছাম সুন্দর একখানা ছবির মতন। পড়ার ঘর, লাইব্রেরি, শোবার ঘর, অফিস ঘর—ঘুরে ঘুরে দেখছি। যে টেবিল-চেয়ারে কাজকর্ম করতেন, যে শয্যায় শুতেন, তাঁর দৈনিক ব্যবহারের টুকিটাকি অসংখ্য জিনিসপত্র। কোন জিনিস নড়ানো-সরানো হয়নি। বিপুল

পুস্তক-সংগ্রহ—দাগ দিয়ে দিয়ে পড়েছেন, নিজের হাতে-লেখা নোট রয়েছে অনেক বইয়ের পাশে। নানা বয়সের নানা অবস্থার ছবি। সুন চিন-লিঙের যৌবন-বয়সের একখানা ছবি—আশ্চর্য রূপের প্রতিমা। এখনকার প্রবীণ মাদাম সান ইয়াৎ-সেনের মধ্যেও সেকালের সেই রূপের আঁচ পাওয়া যায়।

১৯২৫ অব্দে সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর মাদাম সুন চিন-লিং বাড়িটা জাতিকে দিয়ে দিয়েছেন। সর্বসাধারণের সম্পত্তি—দলে দলে মানুষ এসে দেখে যায়। চারিদিক ঝকঝক তকতক করছে। তীর্থযাত্রীর মতো নতমস্তকে আমরা বাড়ির ভিতর ঢুকলাম।

নাকে-মুখে দুটো গুঁজে আবার বেরিয়েছি। বিশ্রামের সময় নেই। একটা কর্মিক-পল্লী—সাও-ইয়াং ভিলা—শহর থেকে ছয় মাইল, সাংহাইর শহরতলি বলা যায়। চারিদিক ফাঁকা, তার মধ্যে একশ-ছ'টা দোতলা বাড়ি। প্রতি বাড়িতে ছ'টা করে ফ্লাট। ছ'শ ছত্রিশটা পরিবার অতএব থাকে এখানে। এ ছাড়া আরও অনেকগুলো একতলা বাড়ি—ইস্কুল, ডাক্তারখানা, সমবায়-দোকান ইত্যাদি। চল্লিশ হাজার ইয়ুয়ান দিয়ে সমবায়-দোকানের মেম্বার হতে হয়। বাড়িগুলোর সামনে পিছনে রাস্তা। গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলেছি—সে কি বিপদ! এ ডাকে, আসুন আমার বাড়ি; ও ডাকে, আসুন আমার বাড়ি। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা সম্বর্ধনা করছে—হোপিন ওয়ানশোয়ে—শান্তি দীর্ঘজীবী হোক! এলাহি ব্যাপার। আমরা খুশিমতো এর ঘরে একজন ওর ঘরে দু'জন এমনি ঢুকে পড়লাম। যত বেশি ঘর দেখে নিতে পারি, বিচারটা তত সাচ্চা হবে। আমরা আসছি দেখে, যদি ধরুন, ফিটফাট করে রেখে থাকে! কিন্তু ছ' শ ছত্রিশটা ফ্লাট লহমার মধ্যে নিখুঁতভাবে সাজানো এক আরব্য উপন্যাসের দৈত্য ছাড়া আর কেউ পারবে না। বেড়ে আছে সত্যি! অনেকের হিংসে হচ্ছে। এক জনে বললেন, দিল্লির পার্লামেন্ট-সদস্যরা যে সব বাড়িতে থাকেন সেই কায়দায় নয়?

ছুটুন, ছুটুন। ফ্যাক্টরিতে এর পর। কাপড়-ছোপানোর এক নম্বর সরকারি ফ্যাক্টরি। মেয়ে ডিরেক্টার—মিং চুং-ফাং। আগেকার দিনের নিতান্ত এক সাধারণ কর্মী—মজবুত চেহারা, চিরকাল কঠিন শ্রম করে আসছেন সে আর বলে দিতে হয় না। নিয়মমাফিক বক্তৃতা করে সম্বর্ধনা জানালেন তিনি।

এবং যথারীতি আমার মুখের জবাব পাওয়ার পর কারখানা দেখাতে নিয়ে চললেন। চোদ্দ শ' কর্মিক খাটে এখানে। খাটুনি দশ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে সম্প্রতি আট ঘণ্টায় আনা হয়েছে। সব রঙেই ছাপা হয়, ডিজাইন বহু রকমের। তবে শতকরা নব্বুই ভাগ হচ্ছে নেভি-ব্লু রঙে থান ছোপানো। এই রঙের কোট-প্যান্টলুন মেয়েপুরুষ বাচ্চাবুড়োর সার্বজনীন পোশাক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই বিষম চাহিদা। ডিরেক্টারের অঙ্গেও ঐ পোশাক—তবে ধূসর রঙের। উ'হু—ঠাহর করে দেখি, আদিতে নেভি-ব্লু-ই ছিল। কাচতে কাচতে এই দশা।

(৪০)

স্বদেশের শুভার্থীরা বিস্তর উপদেশ ছেড়েছিলেন। কম্যুনিস্ট দেশ—যে প্রকার এত দিন জেনে বুঝে এসেছ, ঠিক উল্টোটি সেই রাজ্যে। বড়লোক-গুলোকে কেটে কুচি কুচি করেছে, মন্দির-দেবস্থানে রোলার পিষেছে, ঘর গৃহ-স্থালী চুরমার। খাটবে এবং খাওয়া-পরা পাবে—ব্যস, এই মাত্র। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই—রাস্তার ল্যাম্পপোস্টটা অবধি কান খাড়া করে রয়েছে। এমন-অমন বলেছ—কিম্বা মুখ ফুটে বলতেও হবে না, বেয়াড়া রকমের কিছু মনে মনে ভেবেছ কি অমনি নিয়ে তুলবে কনকেনট্রেশন ক্যাম্পে। দুনিয়ার মানুষ তার পরে আর চিহ্ন দেখবে না তোমার।

অনেক দিন হয়ে গেল, রোমহর্ষক বর্ণনার সবগুলো মনে নেই। সকৌতুকে মনে মনে সেই সব আনাগোনা করতাম। কিছুই তো মেলে না হে! সারা জীবনে উঠোন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হননি বটে, কিন্তু ভুবনের যাবতীয় সঠিক সংবাদ তাঁদের নখাগ্রে। তাঁদের সতর্কবাণী বিলকুল ফাঁকি হয়ে যাচ্ছে!

না, মিলল একটা বটে এত দিনে! ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে নেই, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শুনুন—অধমের উপর হামলা হয়েছিল কি প্রকার। তাজ্জব হয়ে যাবেন। হয়তো বা চক্ষু বাষ্প-বিজড়িত হয়ে উঠবে।

দলনেতা এবং রুগ্ন অসমর্থের জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা, অন্য সকলের পাইকারি বাস। দলনেতা বলেই নিরালা কোটরে আটকাবে, এ কেমন কথা? এই নিয়ে পিকিনে নিন্দে-মন্দ করতাম। শেষটা নিজেকে নিয়েই টান পড়ল

তো বিদ্রোহ করে বসলাম দস্তুরমতো। সে কিছুতে হতে দিচ্ছি নে। তখন করল কি মশায়, জন কয়েক তাগড়া জোয়ান বাসের দরজা চেপে দাঁড়াল—ঢুকবেন কেমন করে বাসে—ঢুকুন না! তাতেই শেষ নয়। গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তো দু-জনে দু-হাত ধরে টেনে জোরজার করে নেতার গাড়ির মধ্যে পুরে ফেলল। ইংরেজের আমলে দেখেছি, স্বদেশি ছেলেদের এই কায়দায় কয়েদির গাড়িতে ঢোকাত। পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছি, দলের সকলের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করছি—দেখ হে তোমরা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুরোপুরি বিলোপ-সাধন, শারীরিক বলপ্রয়োগ...তা পাষাণ আমার স্বদেশবাসীরা! সকলের চোখের উপর দিয়ে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেল, তাঁরা হাসতে লাগলেন। অধমের দুর্গতিতে সকলে খুশি।

প্রতিকারের ভার তখন নিজের হাতে নিয়ে নিই। মোটরকার ও বাস পর-দিন যথারীতি এসে দাঁড়িয়েছে হোটেলের দরজায়। সকলের আগে আমি চুপি-চুপি বাসে উঠেছি, একটা বেঞ্চির কোণ নিয়ে নিঃসাড়ে বসে আছি। তারপর ওরা এসে পড়ল। খোঁজ—খোঁজ—নেতা মশায় গেলেন কোথা? হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন তো!

ঘাড় নিচু করে পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আত্মগোপন করেছি। অবশেষে দেখে ফেলল। বাসে ঢুকেছে গ্রেপ্তার করতে।

উঠে আসুন। আপনার এ জায়গা নয়—

আমি আইন দেখাই, ডেলিগেট যখন—নিশ্চয় এক্তিয়ার আছে বাসে উঠে বসবার।

কার্ড দেখান—

এর ইতিহাস বলি। সাংহাই পৌঁছবার পরেই প্রতিনিধিদের একটা করে কার্ড দিয়েছিল। প্রয়োজন হলে বাসের লোককে ঐ কার্ড দেখাতে হবে, আজে-বাজে মানুষ যাতে বাসে উঠে না পড়ে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। দশ মিনিটের মধ্যে ওরা-আমরা ভাই-ব্রাদার—যেন দশ শ' বছরের পরিচয়। কে বা চাচ্ছে কার্ড আর দেখাতে যাচ্ছেই বা কোন জন? কার্ড যেমন দিয়েছিল, তেমনি পড়ে আছে টেবিলের উপর। অথবা ঘর-সাফাইয়ের সময় ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছে। ভরসা সেইখানে। তাই হুমকি দিচ্ছে, দেখান আপনার কার্ড—

কপাল গতিকে আমার কার্ডখানা সেদিন পকেটেই ছিল। নাকের সামনে

বের করে ধরি। হতভম্ব—ক্ষণকাল কথাই বলতে পারে না। তবু কি অল্পে ছাড়বার পাত্র। আবার এক দুষ্ট মতলব ঠাউরে ফেলেছে।

আপনি মোটা মানুষ—বেঞ্চির অনেকটা জুড়ে বসেছেন। এত জায়গা দিতে পারব না। বাস ছেড়ে আপনাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে।

সেক্রেটারি-জেনারেল রমেশচন্দ্র রোগা মানুষ—তাঁকে পাশে টেনে বসালাম। হল তো? দু-জনের জায়গা—আমি যদি দেড় হই, ইনি আধ। ব্যস, মিটে গেল। এবারে কি বলবে?

বলবার কিছু নেই। বেকুব হয়ে নেমে গেল হাসতে হাসতে। দলনেতার স্বতন্ত্র গাড়িটা গেল না আর সেদিন।

বাসে চড়ে জাহাজঘাটায় গেলাম। সাংহাই ডকের জগৎজোড়া নাম—কিন্তু আজকে আর কি দেখবেন? সন্ধিবন্দর ছিল—সন্ধিসূত্রে মাতব্বর জাতগুলোর অবাধ ব্যাপার-বাণিজ্যের অধিকার। বাণিজ্যের নামে মহাচীনের মেদমজ্জা শুষে নিত অক্টোপাস। অক্টোপাস অর্থাৎ অষ্টভূজের উপমাটা খুব লাগসই। শোষক জাতিগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চীনভূমিতে আড্ডা গেড়েছিল—গুণতিতে তারা আটই বটে!

জাহাজ-ঘাটায় বিদেশি বলতে রয়েছে বৃটিশ ব্যাপারি জাহাজ একটা। গতিক বুঝে আর সবাই আপোষে সরে পড়েছে, ঝামেলা করেনি। ফরমোশায় ওৎ পেতে রয়েছে তাদেরই কেউ কেউ; ঐখান থেকে প্রলুব্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে নিশ্বাস ফেলছে। এক চীনা-জাহাজের লোকলস্কর আমাদের দেখে শশব্যস্তে নেমে এলো, হাততালি দিয়ে খুব খাতির করে জাহাজে নিয়ে তুলল।

এখান থেকে জেড-মন্দিরে। বুদ্ধমূর্তি মূল্যবান জেড পাথরে তৈরি। খুব নাম এই মন্দিরের। তাজ্জব ব্যাপার—রোলার চালিয়েছে তবে কই? স্বদেশের কয়েকটি দিক্‌পাল যে তারস্বরে এই বুলি ধরেছেন! জানি, দোষ তাঁদের নয়—কলওয়ালারা পিছন থেকে স্প্রিংয়ে দম দিয়ে পুতুলের মুখ দিয়ে এই বুলি বলাচ্ছে। উঁহু, হাত দিয়ে লেখাচ্ছে। কিন্তু থাকুক এ সব। পীতাম্বর শ্রমণরা আমাদের দেশের গেরুয়াধারী সাধু মহারাজদের মতোই।

ভারত থেকে আসছি আমরা, প্রভু বুদ্ধের দেশের মানুষ—ভারি খাতির! আমাদের চেয়ে আপন কে আছে বুদ্ধ-ভক্তদের কাছে?

বিস্তর জায়গা-জমি নিয়ে মন্দির। ঘরবাড়ি দেখে অবাক হয়ে যাই। সম্রাট ও যুগ-যুগের ভক্তদের আনুকুল্যে এই সমস্ত হয়েছে। প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি। এবং ভক্তদেরও বিস্তর মূর্তি আছে। দেয়ালে রাজা লিয়াং-তির প্রকাণ্ড ছবি —যিনি প্রথম এদেশে বৌদ্ধধর্ম আনলেন। শ্রমণদের আবাস এবং ধর্মালোচনা ও পড়াশোনার জায়গা। বিচিত্র অলঙ্করণ সর্বত্র—নানাবিধ দেয়াল-চিত্র। পুরো দিন ঘুরেও দেখা হয় না, অথচ ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে নমো-নমো করে সারতে হবে। সময় নেই।

আরও তাজ্জব—মন্দির মেরামত হচ্ছে, মিস্ত্রি-মজুরদের দল ভারা বেঁধে কাজ করছে। পিকিনেও এই দেখেছি। মন্দিরের কোন কোন অংশ ব্যবহার হত না, ভেঙেচুরে পড়ে ছিল। বোমার আঘাতেও কিছু কিছু জখম হয়েছিল। সেই সমস্ত নতুন করে গড়া হচ্ছে পুরানো স্থাপত্যরীতির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। নতুন-চীনের কর্তারা ধর্মকর্ম মানে না—তবে এ সমস্ত কেন? মানি আর না-ই মানি—যে সব মানুষ মানে, তাদের বিশ্বাসে বাধা দিতে যাবো কেন?

শ্রমণরা ঘরে নিয়ে বসালেন আমাদের, চা ইত্যাদি দিলেন। বুদ্ধ-ভূমির মানুষ—মহা মাননীয় তোমরা। অজস্র ধন্যবাদ, এত দূরে আমাদের দেখতে এসেছ। প্রভু বুদ্ধ পরম শান্তিবাদী। আঠার শ' বছর আগে বৌদ্ধধর্ম এদেশে এসেছিল, সেই তখন থেকে বন্ধুত্ব তোমাদের সঙ্গে। আমাদের শ্রমণ-সম্প্রদায়ের ভালবাসা তোমার দেশের মানুষদের জানিও। বোলো, সকলে আমরা মিলে-মিশে ভাই-ভাই হয়ে শান্তিতে থাকতে চাই।

ফোটো তোলা হল সবাই একত্র হয়ে। বললেন, নতুন আমল বলে গোড়ায় খুব ভয় হয়েছিল—কিন্তু না, ভালই আছি আমরা মশায়। মন্দির-মসজিদ-গির্জা এবং যাবতীয় পুরানো কীর্তি সেরেসুরে দিচ্ছে ওরা। থোক টাকাপয়সার দরকার হলেও পাওয়া যায়। কর্তাদের সম্বন্ধে বলবার কিছুই নেই, দোষ হল হাল আমলের ছেলেমেয়েগুলোর। ভক্তি-নিষ্ঠা কিচ্ছু নেই, মন্দিরে আসে না—কেমন যেন সব হয়ে যাচ্ছে। সেকালের বুড়ো-আধবুড়োরাই শুধু মন্দিরে আসা-যাওয়া করেন, তাঁদের অন্তে কি যে হবে—

শুষ্ক মুখে করুণ কণ্ঠে আমরাও সমবেদনা জানাই, বলেন কেন—সব দেশের ঐ এক রীত। আমাদের পুরুত-পাণ্ডারাও ব্যাকুল হচ্ছেন এই ভাবনা ভেবে। ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না ছেলেমেয়েরা—কী যে হচ্ছে দিনকে দিন।

ছুটলাম এক নম্বর কটন মিলে। এটাও সরকারি কারখানা। কর্মিক চল্লিশ হাজারের বেশি—তার মধ্যে আঠাশ হাজারের মতো মেয়ে। সরকারের হাতে আসার পর কর্মিকদের বড় স্ফূর্তি বেড়ে গেছে; মাইনেও পাচ্ছে তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে, কর্মিকদের শরীর মজবুত রাখবার জন্য মুফতে নানা রকম ব্যবস্থা। এখানে-ওখানে বোর্ড ঝুলিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে নানান উপদেশ লিখে দিয়েছে। বাচ্চাদের নার্সারি—মেয়ে-কর্মিকরা শিশুসন্তান ওখানে গছিয়ে দিয়ে কাজে লাগে; কারখানা বন্ধ হলে ছেলে কোলে ঘরে যায়। বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া খেলাধুলো ও পড়াশুনোর হরেক বন্দোবস্ত। মা কাছে নেই, সমস্ত দিনের মধ্যে তা খেয়ালই থাকে না। কর্মিকরাও পড়ে—আট ঘণ্টা ডিউটি, তার পয়লা দু-ঘণ্টা লেখাপড়া। দিনের খাটুনির পর ক্লান্ত হয়ে পড়বে, লেখাপড়ার পাট সেজন্য আগেভাগে সেরে নেওয়ার নিয়ম। প্রায় সবাই আগে একেবারে নিরক্ষর ছিল, এখন দিব্যি খবরের কাগজ পড়ে। ছ-মাস পরে মিলের একটি মানুষ নিরক্ষর থাকবে না, এই ওরা পণ নিয়েছে।

মেয়েপুরুষ সব কর্মিকের এক মাইনে। পরিচালক ও সাধারণ কর্মিকের মধ্যে মাইনের বেশি ফারাক নয়। মেয়েরা প্রসবের আগে-পিছে পুরো মাইনের বাড়তি ছুটি পায়। বিপদ-আপদ ও দুর্দিনের কথা ভেবে প্রত্যেক কর্মিকের শ্রম-বীমা আছে—প্রিমিয়াম কারখানা থেকে দিয়ে দেয়। কারখানায় ঢুকলাম —কর্মিকরা একমনে কাজ করছে। তাদের মাঝখান দিয়ে এপথ-ওপথ উপর-নিচে করছি আমরা। এত তুলো উড়ছে যে বহাল তবিয়তে ঘোরাফেরাই দায়। কর্মিকদের নাক-ঢাকা, তাদের অসুবিধে নেই।

দেখাশুনোর পর বক্তৃতা—ঘরের ভিতরে নয়, প্রাঙ্গণে। তারা দত্তকে বললাম, আমাদের হয়ে দু-কথা বলবার জন্য। খাসা বললেন অল্পের ভিতর।

হোটেলে ফিরতি মুখে দেখছি, রাস্তা লোকে লোকারণ্য। এখন থেকেই সভায় গিয়ে জমেছে। দল বেঁধে পতাকা উড়িয়ে মিছিল করেও যাচ্ছে। ব্যাপার তবে তো রীতিমত গুরুতর! গোটা সাংহাই শহর ভিড় জমাবে আজকের ময়দানে। নিতান্ত যারা যেতে পারবে না, তারা বাড়ি বসে শুনবে —সাংহাই রেডিও সেই ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু আমি এক মুশকিলে পড়ে গেছি। ভারতের তরফ থেকে ঐ মহতী সভায় দু-জনে দু-খানা জ্বালাময়ী ছাড়ব, এই ব্যবস্থা ছিল। শেষ মুহূর্তে তা ভেস্তে যাচ্ছে। কাল রাতে আরও কয়েকটা দেশের প্রতিনিধি এসে পড়েছেন, তাঁরাও বলবেন। সময়ের অকুলান পড়ছে অতএব। দু-জনে নয়, বলতে হবে শুধু একজনকে। সেই নামটা অবিলম্বে ঠিক করে দিন।

নাম ঠিক করতে আমার এক সেকেণ্ডও লাগে না। রাঘবিয়া বলবেন—আবার কে ? আমি বাতিল। আমার কথায় তিনি যখন বক্তৃতা তৈরি করেছেন —তিনিই বলবেন। এ ছাড়া আর কোন্ রায় দিতে পারি আমি ?

রমেশচন্দ্রের আপত্তি। একজনকে বলতে হলে বলবেন দলনেতাই। সর্বক্ষেত্রে এই রীতি।

রীতিটা ভাঙতে চাই আমি—

রমেশচন্দ্র বললেন, মতভেদ হচ্ছে যখন, মন্ত্রণাদাতা দু-জনের মত নিয়ে দেখুন।

কিন্তু তাঁরা রমেশচন্দ্রের কথায় সায় দিলেন। ভোটে হেরে গেলাম। একজনে বলবে যখন, সে জন আমিই।

দুপুর দুটোয় সভা। জায়গাটা এক সময়ে ছিল কুকুর-দৌড়ের মাঠ। বৃটিশরা বানিয়েছিল। লড়াইয়ের মধ্যে জাপানিরা সাংহাই দখল করে নিল। তখন সৈন্যদের ঘাঁটি হয়েছিল। জাপানি হটিয়ে তারপর মার্কিনরা আড্ডা গাড়ে। ১৯৫১ অব্দে নতুন-চীনের গণতন্ত্রী সরকার বিরাট একজিবিসন খোলেন। ইদানীং আরও বিস্তর জমি ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পিপল্স্ পার্ক হয়েছে। সাঁতারের পুকুর আছে। বড় বড় সভা-সমিতি ও জাতীয় উৎসব এইখানে হয়ে থাকে। বিশাল স্টেডিয়াম—লাখ লাখ বসতে পারে।

বক্তৃতায় উত্তম উত্তম বচন ঝেড়েছিলাম। সাংহাই-নিউজে পরদিন অনেকখানি বেরিয়েছিল, কাগজটা খুঁজে পাচ্ছি নে। অতএব বেঁচে গেলেন আপনারা।

কামনা করুন, কোন দিনই না পাওয়া যায়। আমার পরেই বললেন সোভিয়েট দলনেতা অ্যানিসিমভ। এই সেদিন মস্কোয় দেখা হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। যে সে ব্যক্তি নন, গোর্কি ইনস্টিট্যুট অব ওয়ার্লড লিটারেচারস নামক এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর। এতদ্ সত্ত্বেও এক নজরে চিনে ফেললেন। এবং বার তিনেকের দেখা-সাক্ষাতে অজস্র কথাবার্তা হল। সাংহাইয়ের সভার কথা উঠল। বললেন, বক্তৃতার প্রতিযোগিতা চলেছিল যেন—আপনি সব চেয়ে বেশি হাততালি পেলেন। আমি ঘাড় নেড়ে বলি, কক্ষনো না—আপনিই। এই নিয়ে হাসাহাসি চলল; আমাদের আর যাঁরা ছিলেন, উপভোগ করছিলেন আমাদের কলহ।

কিন্তু থাক এ সব। বক্তৃতার কথা ভুলে গেছি—কিন্তু এটা মনে আছে, অসুবিধা লাগছিল, বিরক্ত হচ্ছিলাম। বক্তৃতা করে জুত হয় না ওদেশে। আবেগ ভরে আচ্ছা এক মনোরম কথা বলে ফ্যাল-ফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকাই। চারিদিক চুপচাপ—শ্রোতাদের মধ্যে না-রাম না-গঙ্গা—কোন রকম প্রতিক্রিয়া নেই। কুমারী তুন ইংরেজি বাক্যগুলো ধীরগতিতে চীনায় তর্জমা করে যাচ্ছে। অবশেষে—বক্তৃতা ছাড়বার মিনিট দুই-তিন পরে কলরোল উঠল, প্রবল হাততালি। ততক্ষণে কিন্তু আমার উত্তাপ জুড়িয়ে গেছে—পরবর্তী লাগসই কথাগুলো মুখের কাছাকাছি আসতে চায় না।

দিনের পাট চুকিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি ক-জনে। বাজার করছি। সরকারি ও সাধারণ দোকান বিস্তর; কিন্তু ভিড় ঠেলে ঢোকা যায় না। মানুষের হাতে পয়সা হয়েছে, দেদার জিনিসপত্র কিনছে। কিছু কেনাকাটা করে বিরক্তি ভরে বেরিয়ে এলাম। আজকের সঙ্গী এক ছাত্র—সে-ও চলে এলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গীদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি, তাঁরা এটা-ওটা পছন্দ করে করে ঘুরছেন। আমি আর সেই ছেলেটি মোটরে বসে গল্প করছি। ছেলেটাকে, এই লিখতে লিখতে, আমার সুস্পষ্ট মনে পড়ছে। লম্বা চওড়া উজ্জ্বল চেহারা—বয়স যা বলল, সে তুলনায় দেখতে অনেক বড়। আমি লেখক—পরিচয়টা শোনা অবধি যখনই সুবিধা পায়, কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। হবু-সাহিত্যিক। কথাটা জিজ্ঞাসা করতে সলজ্জে মুখ নিচু করল। কাঁচা লেখকদের এখানেও ঠিক এই রকম দেখে থাকি। তার একটা কথা কানে বাজছে—বলতে বলতে সেই কিশোরের চোখ দুটো যেন দপদপ করে জ্বলতে লাগল। রাস্তার বিদ্যুতের আলোয় আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। জানো বোস, ক'টা বছর

আগেও এ জায়গায় আমাদের আসতে দিত না। নোটিশ টাঙিয়ে রেখেছিল—'কুকুর আর চীনার প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

বললাম, আমাদেরও এমনি দশা গেছে ভাই। হরেক বাধা ছিল নিজের দেশভূঁয়ে স্বচ্ছন্দে চলে-ফিরে বেড়াবার। কলকাতার অনেক হোটেল ধুতি পরে ঢোকবার জো ছিল না।

(৪১)

চব্বিশে, শুক্রবার। হ্যাংচাউ যাবো আজ। ওয়েস্ট-লেকের উপর পাহাড়ের ছায়ায় অপরূপ শহর। ওরা বলে, মাটির ধরায় স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, এই হ্যাংচাউ। সাংহাইর পালা অতএব দুপুরের আগে পুরোপুরি শেষ করব।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোর পায়ে কি-রকম একটা ব্যথা উঠেছে। আধেক শয্যাশায়ী তিনি। বেরুবেন না। সেই ভাল, বিশ্রাম নিলে ব্যথা কমবে। পায়ের গতিকে হ্যাংচাউ যদি পন্ড হয়, সে মনোবেদনা রাখবার ঠাঁই হবে না। বৈদ্যনাথ হোটেলে রইলেন, আমরা সকলে বেরিয়ে পড়লাম।

নার্সারি ইস্কুল। ইস্কুল বলা ঠিক হল না, গোটা নাম—নার্সারি অব চায়না ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটুট। শহরের একটেরে মস্ত বড় বাগান-বাড়ি। তার মধ্যে ফালি ফালি খেলার মাঠ, সিমেন্টে বাঁধানো নির্জলা লেক, লেকের মধ্যে নৌকো। আপাতত লেকে এক ফোঁটাও জল নেই বটে, কিন্তু মুহূর্তে মধ্যে জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। তখন নৌকো জলের উপরে দুলবে। এ সংসারের বাসিন্দা কেবল বাচ্চারা। লেকে তারা নৌকো বায়, সাঁতার কাটে। দুর্ঘটনার ভয় নেই, জল হাতখানেক হবে বড় জোর, ইচ্ছে করলেও ডুবে যাওয়া যায় না।

প্রধান কর্মকর্ত্রী মাদাম সান ইয়াৎ সেন—তাঁরই চেষ্টায় ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠান এত বড় হয়েছে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সমাদরে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চললেন। মুখে মুখে পরিচয় দিচ্ছেন। দুটো বিভাগ—তিন বছরের নিচে যাদের বয়স, আর যারা তিনের উপর। শিশু-লালনের অভিনব বন্দোবস্ত। শরীর গড়ে তুলছে—ওজন নিতে হয় না, যে কোন শিশুর মুখে তাকিয়ে আন্দাজ পাওয়া যায়। আর নতুন কালের পুরো মানুষ হয়ে উঠছে তারা। তার এক পরিচয়,

সহজ মেলামেশায় অভ্যস্ত হয়েছে এইটুকু বয়স থেকেই। মানুষের কাছ থেকে আশ্চর্য কায়দায় আদর কাড়তে শিখেছে—তা সে মানুষ যে কোন দেশের, যেমন রং ও প্রকৃতির হোক না কেন।

একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। ওরা অভিনয় দেখাচ্ছে। বুড়ো মানুষ সেজেছে —বছর চারেকের হবে সে বাচ্চাটি—পাকা গোঁফ পরেছে, মাথায় পাকা চুল। চীনের সাবেকি ধরনের পোশাক পরে থপথপ করে সামনে এসে দাঁড়াল। ভারি গম্ভীর—বুড়োমানুষের যেমনটি হতে হয়; আমরাও ঠোঁট চেপে থেকে কোনপ্রকার চপলতা হতে দিচ্ছিনে। আসে তারপর নৌ-সৈন্যেরা। বয়স তিন বছরের মধ্যে। সাজপোশাক অবিকল নৌবাহিনীর। গটমট করে মার্চ করে আসছে—বাপ রে বাপ, অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপে। নেহাৎ আমরা অত জনে একসঙ্গে আছি, খোদ সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাদের মধ্যে রয়েছেন—তাই বসে থাকতে ভরসা পাচ্ছি, ভয় পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেলাম না। এক এক দফা অভিনয় হয়ে যায়, আর সাজপোশাক সুদ্ধ ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে সামনে-বসা আমাদের এক একজনের কোলে। তখন আমাদের আর মোটেই ভয় করে না, কোলে বসিয়ে—মুখের কথা চলবে না—চোখের দৃষ্টি দিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে আদর করি। কোলে বসে বড় বড় চোখ মেলে ওরা পরের দলের অভিনয় দেখে। তার পরে তড়াক করে এক সময় কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে সাজঘরে ছোটে। এদের পালা এর পরে; নতুন এক সাজে সেজে এক্ষুণি আবার দেখা দেবে। এলো নাচের দল—পিয়ানো বাজছে, পরীদেশের ছেলেমেয়েরা তালে তালে নাচছে বাজনার সঙ্গে। শুধু বাজনা শোনাতে একবার এলো গোটা কনসার্ট-পার্টি। ভায়োলিন ড্রাম ইত্যাদি অন্য লোকে ধরে দাঁড়িয়েছে, ও'রা বাজাচ্ছেন। ভায়োলিন লম্বায় বাদককে ছাড়িয়ে যায়। ব্যান্ড-মাস্টারও আছেন, বয়স সাত —সব বাদক তাঁর হুকুমের প্রতীক্ষায় ছড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে।

বাগানে ঘুরে ঘুরে দেখছি। কেউ ছুটোছুটি করছে, রোদ পিঠ করে বসে ছবি দেখছে কেউ। মিষ্টি মিষ্টি শিশুকাকলী সমস্ত বাগানবাড়ি জুড়ে। বাচ্চাদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখছি। ছবি আঁকছে, নানা রঙের মাটি দিয়ে জিনিষপত্র গড়ছে, পুতুল গড়ছে। নিজেরাই এক একটা পুতুল—ঐ পুতুল ছেলেমেয়েদের আবার পুতুল আছে আলাদা। ওদের ছেলেমেয়ে। পুতুলের ঘর-বাড়ি, ঘুমিয়ে পড়েছে কয়েকটা পুতুল, খাচ্ছে কোন কোন পুতুল টেবিলে বসে। পুতুলের মালিকদেরও খাওয়া-শোওয়ার জায়গা দেখলাম। ...আমি এক

বিপদে পড়ে গেছি ইতিমধ্যে। চোখের চশমাটা খুলে একজনের চোখে একটু পরিয়ে দিয়েছি, আর যাবে কোথায়—যে যেদিকে আছে, ছুটে আসছে। ঘিরে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচুতে তোলে। একটু একটু সকলকে পরিয়ে দাও ঐ চশমা। মাঠের ওধারে এক খুকিকে পেরাম্বুলেটারে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে—সে-ও দেখি, তুলতুলে হাত বাড়িয়েছে। চশমা পরবে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন, ক'দিন আছ আর তোমরা? জবাব দিলাম, এক মাসের উপর তো হয়ে গেল—যা খাতির-যত্ন, মোটেই যাবার ইচ্ছে নেই। ভাবছি, জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দিয়ে যাবো তোমাদের দেশে। বক্তৃতার মধ্যেও সেই ভয় দেখালাম, জাতির গোড়া থেকে তোমরা গড়তে শুরু করেছ। আমরা তো যাচ্ছিই নে—চিঠি লিখে দিয়েছি, ছেলেপুলেদেরও যাতে পত্রপাঠ এখানে পাঠিয়ে দেয়। এখানে এসে থাকবে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হারবেন কেন—তিনি পাল্টা বললেন, বেশ তো, ভালই তো! স্বাস্থ্য ভাল এখানকার, তারা আরামে থাকবে। আর একটা চিঠি লিখে দিন ছেলেপুলের মায়েরাও যাতে চলে আসেন। হাসি-স্ফূর্তিতে এক-সঙ্গে বেশ থাকা যাবে।

ঐটুকু বাচ্চারাও মিষ্টি রিনরিনে গলায় বিদায়-সম্ভাষণ দিচ্ছে, হিন্দী-চীনী জিন্দাবাদ! বলছে, হোপিন ওয়ানশোয়ে!

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। কম্পাউন্ডের ভিতর ঘাসে-ঢাকা বিস্তৃত লন—তারই পাশে আমাদের গাড়িগুলো দাঁড়াল। এক দঙ্গল ছাত্র-ছাত্রী ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে গুলতানি করছিল, লাফ দিয়ে উঠে ঘিরে দাঁড়িয়ে এসে হাততালি দেয়। উ-উ-উ—আওয়াজ উঠল আকাশ থেকে। ঘাড় তুলে দেখি, তা সে আকাশই—তিনতলায় ছাতের আলসেয় ঝুঁকে পড়েছে কতকগুলো মেয়ে। মুখে মুখে আওয়াজ তুলেছে তাকাই আমরা যাতে ওদিকে। তাকিয়ে পড়তেই হাততালি। তার পরে মেয়েগুলো নিচে ছুটল। দুমদাম দুম-দাম—কংক্রিটের সদ্য-তৈরি সুপ্রকাণ্ড সিঁড়ি ভেঙে না পড়ে ললনাদলের পদদাপে। একদা এমনি কাণ্ড ঘটতে পারে—এই সব ভেবেই হয়তো লোহার জুতোয় মেয়েদের পা সরু করে রেখেছিলেন সেকালের দূরদর্শী মুরুব্বিরা।

এসে গাড়ি-বারাণ্ডায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সেকহ্যান্ডের জন্য ব্যাকুল।

বিদেশি হাতগুলো কায়দার মধ্যে পেয়ে—আপনাদের বলব কি—হাত ঝাঁকাচ্ছে আর দস্তুরমতো লম্ফ দিচ্ছে সেই তালে তালে। সে আমি কোনদিন ভুলব না। বাইশ-চব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যান্বিতা মেয়েগুলোর পা দুটো ভূমিতল থেকে অন্তত পক্ষে ইঞ্চি ছয়েক উঠে যাচ্ছে সেকহ্যান্ডের সময়টা। বুঝুন। একটা তুলনা মনে আসে—তেজি ঘোড়া কখনো স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; এরাও ঠিক তাই। চীনের কত জিনিষই ভুলে গেছি, কিন্তু সাংহাই মেডিকেল কলেজ এবং মেয়েগুলোর এই লাফঝাঁপ মিলে মিশে এক বস্তু হয়ে রয়েছে। কলেজের প্রায় আধাআধি ছাত্র মেয়ে।

অধ্যাপক-ডাক্তাররা এবং স্বয়ং অধ্যক্ষ এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়ে নানান বিভাগ দেখাচ্ছেন। জাপানিরা সাংহাই দখল করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ভেঙে-চুরে দেয়, অথবা পাচার করে। তারা বিদেয় হবার পর সব আবার নতুন হয়েছে।

শুধু মাত্র কলেজি পড়াশুনো নয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ছাত্রদের কাজ করতে হয়। এটা শিক্ষারই অঙ্গ—গ্রাজুয়েট হবার কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এক একটা দল হয়ে বেরিয়ে পড়ে ফ্যাক্টরি, কয়লার খনি ইত্যাদি নানা অঞ্চলে। ঐ সব জায়গার স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে তারা, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য হাতে-কলমে কাজ করে। স্বদেশের সঙ্গে এমনি ভাবে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। কোরিয়ায় পাঠানো হয়েছে এখানকার এক ডাক্তারি দল। দু-মাস অন্তর দলের লোক বদলাবদলি হয়; কতক ফিরে আসে, নতুন নতুন ছেলে-মেয়ে যায় তাদের জায়গায়।

আর এক ব্যবস্থা শুনলাম। আগের আমলের ডাক্তাররা কেবল শহরেই ভিড় করত—গ্রামের লোকের জল-পড়া ফুল-পড়ার উপর নির্ভর। এখন চারিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই এরা ডাক্তারি শিখছে—পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কাকে কোথায় পাঠানো হবে সমস্ত ছকে ফেলা আছে। রোগের চিকিৎসা বড় কথা নয়। রোগ যাতে মোটে না হয়, সেই উপায় করো—তবে বলি বাহাদুর। তার জন্যে বক্তৃতা করো, বেতারে বলো, স্বাস্থ্যের প্রদর্শনী খোলো এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে।

হোটেলের সামনে নানা বয়সের একপাল ছেলেমেয়ে। দরজা ও ফুটপাথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে। শতখানেক হবে গুণতিতে। কি ব্যাপার, সত্যাগ্রহ করেছে

—ঢুকতে দেবে না আমাদের? অটোগ্রাফ দিলে তবে পথ ছাড়া হবে। শ'-খানেক খাতা তলোয়ারের মতো উঁচিয়ে ধরেছে। তার মানে বিকাল অবধি নাম-সই চালিয়ে যাও অবিরাম। সে না হয় হত—কিন্তু সময় কোথা ভাই? দুটো সাতচল্লিশে হ্যাংচাউ রওনা—ইতিমধ্যে খাওয়াদাওয়া ও বোঁচকাবিড়ে বাঁধা আছে।

এতগুলি মানুষ আমরা—যে যাকে হাতের মাথায় পাচ্ছি, সই মেরে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু একজনের একটি মাত্র নাম নিয়ে খুশি নয়—সকলের নাম চাই প্রতিটি খাতায়। কর্তাদের এক ব্যক্তি ছুটে এসে তাড়াতুড়ি দিয়ে পথ খালি করে আমাদের হোটেলে ঢুকিয়ে নিলেন। আহা, বেচারারা দাঁড়িয়েছিল কখন আমরা ফিরে আসব সেই প্রতীক্ষায়! সময় ছিল না যে—তা হলে কি ওদের মুখ অন্ধকার হতে দিই!

আবার এক কাণ্ড। লিফট থেকে বেরিয়ে এগারো তলায় পা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে একটা মেয়ে যুক্তকর কপালে হাত ঠেকিয়ে বলছে, নমস্কার—কেমন আছেন? খাস বাংলা জবানে। নাম উ চিং-তাং (Woo Ching-tung)। আমার ছোট্ট খাতায় তার হাতের সই দেখতে দেখতে মনের পটে ফুটে উঠল থোপা-থোপা কালো চুলে-ঘেরা পদ্ম-রঙের কচি মুখখানা। চোখা নাক-চোখ—দক্ষিণ-চীনের কোন এক অঞ্চলে মেয়েটার বাড়ি। কলেজে পড়ে। বয়সে বড় কাঁচা বলে কেউ বিশেষ আমল দেয় না। উ তা বলে ঘাবড়াবার পাত্রী নয়, সর্বত্র আগ বাড়িয়ে পড়ে নিজেকে জাহির করে। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে একদিন তো স্পষ্টাস্পষ্টি বলে উঠল, আমিও ইন্টারপ্রেটার—আমায় কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করো না কেন তোমরা? সেই মেয়েটা হাসি ছড়াতে ছড়াতে আমাদের প্রশ্ন করছে, আছেন কেমন?

তাজ্জব হয়ে মুখে তাকাই। তারপর সে একলা কেবল নয়—এ দিক থেকে ওদিক থেকে আরও পাঁচ-সাতটা বেরুল। সকলের মুখে কুশল-প্রশ্ন, কেমন আছেন? নমস্কার!

ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে গিয়েছি—এর মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এতজনের কি হেতু এত উদ্বেগ, ভেবে পাইনে। এবং ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে বঙ্গভাষায় এবম্বিধ পরিপক্ক হয়ে উঠল কোন প্রক্রিয়ায়, তা-ও এক সমস্যার বিষয়।

বৈদ্যনাথের পায়ের সংবাদ নিতে কামরায় ঢুকলাম, তখন পরিষ্কার হয়ে

গেল। নিষ্কর্মা শুয়ে রয়েছেন, ছেলেমেয়েরা তখন বৈদ্যনাথকে গিয়ে ধরল, এক্ষুণি বাংলা শিখিয়ে দাও—

সে কি রে! এতই সোজা আমাদের ভাষা শেখা?

নাছোড়বান্দা ওরা। নেহাৎ পথে গোটা দুই-চার বাংলা কথা—তাক মাফিক ছেড়ে যাতে অবাক করে দেওয়া যায়। আচ্ছা, কেউ এসে দাঁড়ালে কি কায়দায় সম্ভাষণ করো তোমরা, কোন সব কথা বলো?

ঘন্টা তিনেকের প্রাণপণ চেষ্টায় নমস্কারের প্রণালীটা রপ্ত করেছে। এবং 'কেমন আছেন'—এই কুশল-প্রশ্ন। তারই সমবেত প্রয়োগ চলছে আমাদের উপর। যা ওরা চেয়েছিল—কুশল-প্রশ্নের ঠেলায় সত্যি সত্যি আমরা অবাক হয়ে গেছি।

(৪২)

চলুন হ্যাংচাউ। ২-৪৭এ গাড়ি। যাচ্ছি একটা দিনের তরে—কাল রাত দুপুরে আবার সাংহাই ফিরব। হাতে মাঝারি সাইজের ব্যাগ—তার মধ্যে এক দিনের মতন কাপড়চোপড় ও টুকিটাকি জিনিষ। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি —দলনেতা ব্যাগ বয়ে চলেছেন. আরে, আছ কে কোথায় সব? কাকস্য পরিবেদনা! খাতির করে কেউ ছুটে এসে বলে না, কি সর্বনাশ, দিয়ে দিন ওটা আমার হাতে। নেতা মশায় অতএব হাঁপাতে হাঁপাতে কামরায় ব্যাগ তুলে ফেললেন। সকলের এই দশা।

গাড়ি ছাড়ল। নিঃসীম ধানক্ষেত আর জলাভূমি ভেদ করে যাওয়ার সেই অপরাহ্নটি বড় মনে পড়ছে। চোখ বুজলেই ছবি দেখি। চলতি ট্রেনে বসে চারিদিক দেখতে দেখতে নানান কথা লিখে রেখেছিলাম; সেইগুলো তুলে দিচ্ছি। পড়তে পড়তে আপনারাও উঠে আসুন না আমাদের সঙ্গে সেই কামরায়।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছি। লাইনের গা অবধি চাষ করেছে—নানান রকমের শাকসব্জি। সড়াক-সড়াক করে খাল পার হলাম কতকগুলো। গাড়ি শহরতলির স্টেশনে এসে দাঁড়াল। সকলের একই ঢঙের পোশাক; তার মধ্যে দু-পাঁচটা অবশ্য এদিক-ওদিক আছে। প্রাচীন মানুষ ওরা; সাবেকি

পোশাক পরে বেড়াচ্ছে। আপদ গাউন, তার উপরে কোর্তা, মাথায় হাতলওয়ালা অদ্ভুত ধরনের টুপি; মুখে বিশ-ত্রিশ গাছি লম্বা দাড়িও দেখা যায় কারো কারো। গুণতিতে অবশ্য অতি সামান্য তারা। ফ্যাক্টরি অদূরে; কর্মিকদের ঘর—ঝাড়াপোঁছা তকতক করছে। বড় বড় প্যাকিংবাক্সে উল্টোদিকের প্লাটফরম বোঝাই—মুটেরা সেই সব বাক্স বের করে নিয়ে যাচ্ছে। মাথার টুপি ও পোশাকে কারো কারো তালি-মারা হলেও পরিচ্ছন্ন সকলেই। প্লাটফরমে এত লোকের উঠানামা, কিন্তু নোংরা-আবর্জনা দেখি নে। আজ সকালেই এই প্রসঙ্গ হচ্ছিল। একজনে বললেন, ছিমছাম থাকা এ জাতের অভ্যাস বটে—কিন্তু এত বেশি পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় সতর্কতা রাশিয়ার কাছ থেকে শিখেছে।

মুখোমুখি দুটো বেঞ্চি, মাঝে টেবিল। এ-বেঞ্চিতে দু-জন ও-বেঞ্চিতে দু-জন বসে। কামরার মাঝ বরাবর পথ চলে গেছে—সেই পথ ধরে ট্রেনের আগাপাস্তলা যথেচ্ছ বিচরণ করুন। বিনামূল্যে যত খুশি চা সেবন করুন। গরম জল পাত্রে পাত্রে দিয়ে গেল, পাশে একটা করে মোড়ক। দু-রকমের মোড়ক—সবুজ আর লাল। সবুজ চা হালকা, লাল চা কড়া—ইচ্ছে করুন যে রকম অভিরুচি। মোড়ক ছিঁড়ে চায়ের পাতা ক'টি পাত্রে ঢেলে দিন—ব্যস। লাউড-স্পীকার তো আছেই। একটা লোকসঙ্গীত ধরেছে, গাড়িসুদ্ধ মানুষ তাল দিচ্ছে। সুরে সুর মিলিয়ে গাইছেও কেউ কেউ।

থুংচাং নামে ছোট শহর পার হয়ে এলাম। আধেক-খাওয়া চা একটা পাত্রে ঢেলে নিয়ে আবার নতুন করে গরম জল দিয়ে গেল। দু-পাশে দিগন্ত অবধি পাকা ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে গ্রাম—খড় আর খোলায় ছাওয়া কুটির। খোড়ো চাল অবিকল বাংলা দেশের মতো; খোলার চাল চীনা পদ্ধতিক্রমে কিছু দুমড়ানো। খুব জল এদিকে—খাল আর ছোট ছোট নদীতে দুর্বার জলস্রোত। আর মাঠে মাঠে সতেজ সুপুষ্ট ফসল। আমাদের মেয়েরা সবেগে গান শুরু করে দিয়েছেন দোভাষি মেয়েগুলোর সঙ্গে। চীনা গান এঁরা শিখবেনই, আর ওরা শিখে নেবে হিন্দি গান।

জোলো হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। মুখে বলতে হল না—হয়তো বা একটু ভ্রূ কুঁচকেছি, ছোকরা তাড়াতাড়ি এসে কাচ ফেলে জানলা বন্ধ করল। ক্ষিতীশ গুণী মানুষ—কাঁহাতক মুখ বুজে থাকবে—সে-ও গিয়ে পড়েছে গানের আসরে। সব চেয়ে তাজ্জব করলেন রাঘবিয়া। পার্লামেন্টের মেম্বর ভদ্রলোক

—একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের। ভ্রমণের এই সর্বশেষ অধ্যায়ে আবিষ্কৃত হল, উঁচুদরের গায়ক তিনি। চমৎকার গলা—আর গান অতি যত্ন করেই শিখেছেন। বিদেশি অজ্ঞদের তাক লাগিয়ে দিয়ে কত কত এরণ্ড-গায়ক মহাদ্রুম বনে গেল, আর রাঘবিয়া এত ক্ষমতা ধরেন তার ভাঁজও কাউকে জানতে দেন নি।

সন্ধ্যা নামল, অন্ধকার হয়ে আসে চারিদিক। গ্রামের ধারে তিনটে খালের মোহানা। একটা নৌকো যাচ্ছে—একজন বোঠে বেয়ে চলেছে, আর একজন গলুয়ের উপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দেশের গাঙে কতদিন ঠিক এমনি ধারা দেখেছি! দাঁড়ানো লোকটার চীনা পোশাক—এই যা একটুখানি আলাদা।

এক স্টেশনে চার জন কামরায় এসে উঠল—পূর্ব-চীন ছাত্র-সমিতির (East-China Students' Society) এরা—অটোগ্রাফ চায় আমাদের। সই করবার পর হাততালি। কী এক মহৎ কাজ করে ফেললাম যেন! আমাদের কত-বড় সুহৃৎ ভাবে, সব জায়গায় সকল শ্রেণীর মধ্যে তার পরিচয়।

ঘোর হয়ে এলো। চব্বিশে অক্টোবর দিনটার অবসান হল দিগ্‌ব্যাপ্ত ধানক্ষেত ও দূরাস্তৃত খাল-বিলে ভরা অজানা মাঠের মধ্যে। চিরকালের মতো এই মাঠে সূর্যাস্ত দেখলাম, এই মাঠের মাথায় একটা-দুটো করে তারা ফোটা দেখলাম...

হ্যাংচাউ পৌঁছলাম ঠিক সাড়ে-আটটায়। স্টেশন আলোয় ফেস্টুনে সাজিয়েছে। বাজনা বাজছে। বিপুল জনতা দাঁড়িয়ে আছে অভ্যর্থনার জন্য। পরিচিত হচ্ছি বিশিষ্টদের সঙ্গে। বাঁ-হাতে ঝোলানো স্যুটকেশ, ডান হাতে পাওনিয়রদের দেওয়া ফুলের তোড়া। এত বড় ব্যাপার—তা কেউ এগিয়ে এলো না স্যুটকেশটা নিয়ে নিতে। সেটা নামিয়ে রেখে ডান হাতের ফুল বাঁ হাতে নিয়ে তবে শেকহ্যান্ড করছি। দপ-দপ করে আলো জ্বালিয়ে ফোটো নিচ্ছে বারম্বার।

শহরের ঘর-বাড়ি দোকান-পাট লোকজন দেখতে দেখতে লেকের ধারে এসে পড়লাম। সী-হু অর্থাৎ পশ্চিম হ্রদ। কিনারা ধরে যাচ্ছি। এমনই বেশ শীত—তার উপর লেকের জোলো হাওয়ায় হাড় অবধি কনকনিয়ে উঠল। সরকারি অতিথিশালায় উঠলাম। আগে হোটেল ছিল এখানে, বাড়িটার একদিক লেকের জলের মধ্যে থেকে গেঁথে তোলা। বিস্তর বড় বড় জায়গায় থেকে এসেছি

—কিন্তু এ বাড়ির যা আসবাবপত্তোর, লাখপতি-কোটিপতিরা ব্যবহার করলেই মানায় ভাল (চীনের কোটিপতির কথা বলছিনে)।

সময় বেশি নেই, এক্ষুণি ব্যাঙকুয়েটে ডাকবে। পয়লা রোজের ব্যাঙকুয়েট—বুঝতেই পারছেন—সে রাজসূয় কাণ্ড ভাবতে গেলে অন্তরাত্মায় কাঁপুনি ধরে যায়। তবু দু-মিনিট একটু ফাঁক কাটিয়ে লেকের বারাণ্ডায় বসে নিই। আবছা-আবছা পাহাড়, জলের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ। জোনাকির মতন অগুন্তি আলো লেকের জলে ছড়ানো। নৌকোয় আলো জ্বলছে; দ্বীপের আলো স্থির দাঁড়িয়ে আছে জলের উপরে ছায়া ফেলে।

ডাকাডাকিতে খানাঘরে এলাম। দরজায় শান্তি-কমিটির প্রেসিডেন্ট—এগিয়ে এসে তিনি হাত ধরলেন। উল্লসিত আর অতিমাত্রায় উত্তেজিত। বললেন, আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে আপনারা এসে পেঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে। আসুন. দেখুন এসে—

এক আজব ফুল ফুটেছে আজ। পোর্সিলেনের রঙিন টবে অনেক যুগ ধরে চারাটা তৈরি। এ ফুল বোঁটায় ফোটে না—ফোটে গাছের পাতার উপর। ফোটে ফুলের খেয়ালখুশি মাফিক, কোন নিয়মকানুনের ধার ধারে না। হয়তো ফুটল দশ-পনেরো বছর পরে, হয়তো বা দু-তিন বছরে। এই যেমন আজ ফুটেছে তিন বছর অন্তে। ফোটা অবস্থায় এখন অনেক কাল থাকবে। ফুলের নাম হল থাং। অথবা চোন ফুলও বলে। আকারে খুব বড়, অলপসলপ গন্ধও আছে। কিন্তু উত্তেজনার কারণ আলাদা। বরাবর দেখা যাচ্ছে, এগুলো ফোটবার পরেই দেশের কোন পরম ক্ষণ আসে। ১৯৪১ অব্দে ফুটেছিল, মুমূর্ষু চীনের সেই তখন থেকেই বিচিত্র জীবনোল্লাস। থাং ফুল ফুটিয়ে শান্তির দূত আপনাদের এই যে শুভ পদার্পণ—আমাদের বিশ্বাস, চীনের মাটি মানুষের রক্তে ধারাস্নাত হবে না আর কখনো।

ফুলের ছবি তোলা হল। আবার দলের ছবি তুলল ফুল মাঝখানে রেখে। তার পরে সেই ভোজ। ভোজ সেরে রাত দুপুরে আবার বারাণ্ডায় গিয়ে বসি। কনকনে শীত, ক্লান্তিতে চোখ ভেঙে আসছে—তবু যতক্ষণ পারা যায়। ওয়েস্ট-লেকের পাশে এমনি রাত্রি জীবনে তো আর আসবে না!

১। ওয়াং সাও-হো'র প্রতিমূর্তির সামনে

২। ওয়েস্ট-লেকের উপর—পাশে দোভাষী, সামনে ক্ষিতীশ

ভোরবেলা বাড়ি থেকে লেকের কিনারে নেমে এলাম। ক্ষিতীশ আছে; আর সঙ্গী হয়েছেন পাটনার শাণ্ডিল্য মশায়। মানুষ-জন বড় কেউ ওঠেনি এখনো। ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ ভাঙছে অতিথিশালা-বাড়িটার গায়ে। ঠিক সামনে লেকের পারে পাহাড়; উঁচু শিখরে গির্জার চূড়া; পাহাড়ের নিচে ঘরবাড়ি। শহর ওদিকেও আছে।

পাকা গাঁথনির সংকীর্ণ একটু বাঁধ মতন—লোক চলাচলের রাস্তা নয়—তার উপর দিয়ে যাচ্ছি। শাণ্ডিল্য বলেন, করছেন কি—পড়ে যাবেন যে!

এমন লেকে ডুবে মরেও সুখ আছে। আসুন না—আসবেন?

হাত ধরে তাঁকেও টানতে চাই বাঁধের উপর। কিন্তু রাজনীতিক মানুষ, বেকার কলমবাজ নন অধমের মতন—স্বাধীন-ভারতে বিস্তর প্রত্যাশা রাখেন, কোন দুঃখে তিনি ডুবে মরার ঝামেলায় পড়তে যাবেন? ভদ্রজনদের জন্য চওড়া পথ, সেই দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে তিনি চললেন।

ছোট ছোট নৌকো কূলের কাছে কাছি দিয়ে বাঁধা। আরো খানিক পরে চড়ন্দার এসে জুটবে, নৌকো করে কাজে-অকাজে মানুষ লেক ঘুরবে। ছ'টা নৌকো ছপ-ছপ করে এসে আমাদের বাড়ির গায়ে লাগল। একটা দরজা সেখানে—অতিথিশালার এই দরজা দিয়ে বেরিয়েই জল। নৌকোগুলো আমাদের জন্য; ব্রেকফাস্ট খেয়ে লেকে বেরুব। নৌকো বায় বেশির ভাগ মেয়ে। জল তুলে তারা কুলকুচো করছে, মুখ-হাত ধুচ্ছে। গল্পগুজব হচ্ছে এ-নৌকোয় ও-নৌকোয়। গলুয়ের লাগোয়া ছোট্ট এক এক কাঠের বাক্স; বাক্স থেকে বই বের করে নিয়ে এক মনে তারা পড়তে বসল। সব ক'টি নৌকোয় এক গতিক—অত ভোরবেলা ঘাটে যেন পাঠশালা বসে গেল। মানুষজন উঠে পড়লে আর হবে না—তার আগে যেটুকু লেখাপড়া শেখা হয়ে যায়।

একটা দিন শুধু এখানে—বিস্তর ঘোরাফেরা। সকাল সকাল তাই ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা। স্নানাদি সেরে আমি আবার বারাণ্ডায় বসলাম। এমন জায়গায় চার-দেয়ালে বন্দী হয়ে থাকে কোন মূর্খস্য মূর্খ? আমার খানা বাপু এইখানে পাঠিয়ে দাও।

ছয় নৌকোয় মিছিল করে লেকে চক্কোর দিচ্ছি। স্প্রিঙের গদিওয়ালা দুটো সোফা মুখোমুখি—দু-জন করে আরামে বসে পড়ুন। মাঝে টেবিল। এবং টেবিলের উপর, বুঝতেই পারছেন...ছবি দিয়েছি, ছবিতে দেখে নিনগে যান;

আমি কিছু বলব না। ফি নৌকোয় এক জন দোভাষি কিম্বা স্থানীয় মুরুব্বিদের কেউ। ক্যামেরাও যাচ্ছে গোটা দুই-তিন।

দোভাষির মধ্যে জুটেছে দুষ্টু মেয়েটা—উ চিং-তাং। এলেম দেখাবার জন্য সাংহাই থেকে এদ্দূর অবধি চলে এসেছে। কাল ভোজের বক্তৃতায় আগ বাড়িয়ে বাহাদুরি করতে গেল। বক্তৃতার মধ্যে একটা কথা ছিল 'রক্তস্নাত'; কথাটা দশ রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললাম, কিছুতে তার মাথায় ঢোকে না। ইংরেজি বিদ্যেয় আমরাও তো বিদ্যেসাগর—দেশে-ঘরে পারতপক্ষে ইংরেজি জবান ছাড়িনে গ্রামার-ভুলের আশঙ্কায়। এ রাজ্যে পরমানন্দে লক্ষ্য করছি, পিতার উপরে বহুতর পিতামহেরা আছেন। আর সবার সেরা হল ঐ—উ চিং-তাং। দেদার ইংরেজি ভুল করে, কিন্তু সে কারণে তিলেক পরিমাণ লজ্জা নেই। বরঞ্চ বীরত্বের ভাব—ইংরেজরা চীনকে বিস্তর জ্বালিয়েছে, জাতটার মাথায় মুগুর ঠুকছে যেন এই প্রণালীতে। সকলের আগে ভাগে, দেখ, পয়লা নৌকোটায় ভাল মানুষ হয়ে উঠে বসে দিব্যি পা দোলাচ্ছে। মানুষ কাছে পেলেই, নিজে না-ই বা বুঝল, ইংরেজিতে ধড়াধ্বড় বোঝাতে লেগে যাবে। অন্যমনস্ক হয়ে আমি উঠে পড়েছিলাম আর-কি ওর নৌকোয়, হঠাৎ দেখে পিছিয়ে এলাম। শেষ অবধি যেটায় উঠলাম, সেখানে আমি আর ক্ষিতীশ। আর দোভাষি পেলাম হ্যাংচাউরই মেয়ে—জানে-শোনে প্রচুর, বলেও খাসা।

লেকের জল আয়না হয়ে সূর্যালোকে ঝিকমিক করছে। পাহাড়, পাহাড়—পাহাড়ের ঘেরের মধ্যে এসে পড়লাম যে! এক পাশে একটুখানি ঐ বেরুবার ফাঁক দেখা যাচ্ছে। অপরূপ নিসর্গদৃশ্য, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। হলে হবে কি—আমার হাতে খাতা-কলম। এই দুই সর্বনেশে বস্তু জীবনের সকল উপভোগ মাটি করে দিল। শনির দৃষ্টির মতো অহরহ সঙ্গে ঘোরে। শ্মশানের বহ্নিদাহের পূর্বে যে গ্রহশান্তি হবে, এমত মনে হয় না।

তিন প্যাগোডায় চাঁদের ছায়া (Shadow of the Moon in Three Pagodas)—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই বিশাল নাম জায়গাটার। নামের মধ্যে কবিতা গুনগুনিয়ে ঘুরছে। চলুন, চলুন—। নৌকোয় নৌকোয় পাল্লা, কে যেতে পারে আগে! একবার বা পিছনে পড়ি, আগে মেরে উঠি আবার। কুমুদিনী মেহতা এবং আরো কে কে যেন গান গেয়ে উঠলেন ওপাশের নৌকো থেকে। গানে কলহাস্যে কথাগুঞ্জনে দাঁড়ের তাড়নায় নিস্তরঙ্গ হ্রদে আলোড়ন লেগেছে।

এদিক-ওদিক থেকে কত নৌকো কাছে এসে পড়ছে। নতুন মানুষদের

সঙ্গে ক্ষণিক চোখোচোখি...সাঁ-সাঁ করে জল কাটিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আবার তারা মিলিয়ে যায়। একটা পাথরের মরগার নিচে এসে পড়েছি। ফোটো তুলল সামনেটা নৌকোয় আটকে দিয়ে—হঠাৎ যাতে পালাতে না পারি। একটা রাস্তা লেক ভেদ করে সোজা গেছে ওদিককার পাহাড় অবধি। রাস্তার ধারে ধারে অজস্র স্থলপদ্ম—ফুলে ফুলে আলো হয়ে আছে। আবার ঐ ফোটো নিল—আমি লিখছি এই সময়ে। আহা, আহা—জলেও পদ্ম! পদ্মবনে এসে পড়েছি, ফুটে আছে একটা-দুটো—বেশির ভাগ ঝরে গেছে। ফুল ঝরে গিয়ে ডাঁটাগুলো শূলের মতন বেরিয়ে আছে। পদ্মপাতা ডুবিয়ে ডুবিয়ে নৌকো এগোচ্ছে।

প্যাগোডার গায়ে ঠকাস করে নৌকো ঠেকল। একটা এখানে, একটা ঐ, আর-একটা উই যে! মোট তিন। জলের উপরে হাত দুয়েক পরিমাণ গোলাকার মাথা তুলে আছে। যতটা উঁচু হয়ে জেগে আছে, কারুকার্যে ভরা। রাত্রিবেলা প্যাগোডার মাথায় আলো দেয়, জলের মধ্যে আলোর প্রতিবিম্ব পড়ে। তাই থেকে মিষ্টি নামটা—তিন প্যাগোডায় চাঁদের ছায়া। সুং-রাজাদের আমলের বিস্তর ভাল ভাল কবিতা আছে এর উপরে। মজা দেখুন—আমাদের এই নৌকোর গায়েও কাঠ খোদাই করে এক প্রাচীন কবিতা—'যেন এক পাতা ভেসে যাচ্ছে, নৌকোটাকে এমনি দেখাচ্ছে খালের উপরে।' আ মরি, মরি! মরবার পক্ষে অতিথিশালার ঘাটের তুলনায় এটা আরও মনোরম স্থান। আজকে যেন কি হয়েছে—লেকের উপর ভাসতে ভাসতেও সেই মরার কথা।

পাশের নৌকো থেকে কুমুদিনী বললেন, মরা-মরা করছেন—ডুবে মরার উপন্যাস লিখতে চান বুঝি?

আর একজন—পেরিনই বোধ হয়—বললেন, তবে তো অন্য কারও মরার দরকার। উনি নন। উনি উপন্যাস লিখবেন সেই মানুষটির মরণ নিয়ে।

অতএব হাঁকডাক শুরু হল, মরে গিয়ে উপন্যাসে কে চির-অমর হতে চান? উঠে দাঁড়ান—

দোভাষি হেসে বলল, জল এখানে মোটে এক মিটার—অর্থাৎ চল্লিশ ইঞ্চির কম। ঝাঁপিয়ে যদি পড়েন ডুবে মরার উপায় নেই, শেওলা আর কাদা মেখে ভূত হবেন শুধু। নিরর্থক খাটনি।

অতএব নিরস্ত হওয়া গেল।

প্যাগোডার সামনাসামনি জায়গাটা দ্বীপ। লম্বায় অনেকটা। গাছপালা-

গুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে লেকের জলে। একটা ঘন সবুজ নিরবচ্ছিন্ন শান্তি হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দ্বীপের উপরেও জল—জলের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পাথরের সেতু চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ঘর; যেখানেই মাটি পাওয়া গেছে, মন্দিরের ঢঙে ঘর তুলেছে, বেদি বানিয়েছে। এমনি ঘুরতে ঘুরতে দ্বীপের অন্য প্রান্তে এসে দেখি—বা রে, আমাদের ছয় নৌকো আগে-ভাগে পৌঁছে অপেক্ষা করছে।

কোণাকুণি পাড়ি মেরে উঠলাম এবারে এক বিলাস-প্রাসাদে। জল ছাড়া পথ নেই সে বাড়ি ঢোকবার। সমস্তটা জায়গা জুড়ে বাড়ি আর বাগান। জলের ভিতর থেকে বাড়ি গেঁথে তুলেছে। পুরানো অট্টালিকা, বনেদিয়ানার ছাপ সর্বত্র। শৌখিন আসবাবপত্র। শখ করে এমনি জায়গায় বাড়ি বানিয়ে এমন সজ্জায় সাজিয়ে যাঁরা বসবাস করতেন, কি দরের মানুষ তাঁরা আন্দাজ করুন। সাত শ' বছর আগেকার এক মস্ত কবি সু তুং-ফু; তাঁর কবিতায় এই অট্টালিকা পাওয়া যাচ্ছে —'চাঁদ উঠেছে, ফুরফুরে হাওয়ায় পোশাক উড়ছে ওয়েন তিয়েন-সিয়াঙের। এখানে যে গান, পিকিন তা মোটে ভাবতেই পারে না। শত্রু এসে পড়ল—তবু দেখ, ফুল ফুটে আছে আর নাচ চলেছে।'

সেই জায়গা। ওয়েন তিয়েন-সিয়াঙও হলেন কবি, প্রচারক, মস্ত বড় বীর। শত্রুরা মেরে ফেলল, তিনি কিছুতে আত্মসমর্পণ করলেন না।

পরবর্তী কালে লিউ নামে এক জাঁদরেল সরকারি লোক গ্রীষ্মাবাস বানালেন এখানে। পঁচিশ বছর আগেও তিনি ছিলেন। এখন কবর রয়েছে। মূল-কবর ঘিরে আরও এগারোটা কবর এগারো বউয়ের। মরে গিয়েও বধূকুল পরিবেষ্টনে উত্তম জমিয়ে আছেন। নতুন আমলে আইন খারাপ, একাধিক বউ নিয়ে ঘর করবার জো নেই। ঐতিহাসিক এই অট্টালিকা এখন রেলকর্মিকদের বিশ্রামপুরী। মহাকবি সু তুং-ফু'র নামে উৎসর্গ-করা। সেরা কর্মিক যারা —বেশি কাজ করছে আর খুব ভাল কাজ করেছে—এমনি ষাট জন করে এখানে থাকতে পায়। ভারি ইজ্জতের ব্যাপার বিশ্রামপুরীতে এসে থাকা। তাই তো দেখে এলাম, এক হাত পুরু গদির উপর কর্মিক মশায়রা গড়াচ্ছেন কিম্বা উবু হয়ে বসে তাস পিটছেন। শুধু তাস নয়, নানা রকমের খেলাধুলা, রেডিও গ্রামোফোন বই পত্র-পত্রিকা—মনোরঞ্জনের হরেক ব্যবস্থা। আমাদের দেখে হাততালি; এ-ঘরে ও-ঘরে উঠোনে-বাগানে যেখানে যাই, হাততালি সামনে-পিছে ঘিরে চলেছে। হাততালি আর অভিনন্দন তাড়িয়ে তুলল ফের আমাদের

নৌকোয়। জোরে জোরে বাও গো মা-লক্ষ্মীরা! জলের কিনারে কর্মিকরা কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরাও হাততালিতে প্রত্যভিনন্দন দিতে দিতে পিঠটান দিচ্ছি।

বিশ্রামপুরী থেকে এক অভিনেতা সঙ্গ নিয়েছেন। নৌকোর উপর তিনি অ্যাক্টো শুরু করলেন। আমাদের এঁরাই বা কম কিসে, ধরলেন গান। উটকো মানুষ যারা এদিক-ওদিক যাচ্ছিল, চুম্বকের টানে এসে আমাদের নৌকোর মিছিলে ভিড়ে যায়।

লেক-বিহার শেষ করে অবশেষে ডাঙায় উঠলাম। হ্যাংচাউয়ের আর এক প্রান্ত। এক বাগিচা—বাগিচার পুকুরে রঙিন মাছের বিপুল সংগ্রহ। মাছের খেলা দেখাতে এখানে নিয়ে এলো। উ চিং-তাঙের সর্বত্র ফড়ফড়ানি—ইংরেজিতে পরিচয় দিচ্ছে, মাছগুলো 'ওয়েল অরগানাইজড'। বলতে চেয়েছিল বোধ হয় 'ওয়েল অ্যারেনজড'। আর যাবে কোথা, অট্টহাসি চতুর্দিকে। সমস্তটা দিন এবং সাংহাইয়ের ফিরতি ট্রেনে গভীর রাত্রি অবধি, যে পারছে মেয়েটাকে ক্ষেপিয়ে মজা দেখছে।

কাল কি কাণ্ড করেছিল, সে বুঝি জানেন না? কার একটা শাড়ি চেয়ে নিয়ে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে সজ্জা করেছে। বলে, কেমন দেখাচ্ছে বলুন। দেখাচ্ছে সত্যি চমৎকার! ফুটফুটে রঙে খাসা মানিয়েছে, চোখ ফেরানো যায় না। হাঁটতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ে মরে আর কি! সেই যে সেকালে লোহার জুতো পরিয়ে রাখত, তারই দোসর। ট্রেনে উঠে এক নতুন ডাংপিঠেমি মাথায় উদয় হল, সিগারেট খাবে। খাবে ঠিক কল্কে-টানার কায়দায়। একজন কাকে দেখেছিল ঐভাবে টানতে, সেই থেকে মাথায় ঘুরছে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট খাড়া রেখে সোঁ-ও-ও-ও করে দিয়েছে মোক্ষম টান। চোখ লাল হয়ে কেশে ভিরমি লেগে পড়ে যাবার দাখিল। ঝিম হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তা বলে ছেড়ে দেবে—সামলে নিয়ে আবার টানছে। এবার মৃদু ভাবে, বেশ সইয়ে সইয়ে। কায়দাটা রপ্ত করে নিয়ে তবে সোয়াস্তি। এবারে কেমন জব্দ! ঐ মেয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে ভুল ইংরেজির বেকুবি এবং সেই বাবদে ক্ষেপানো শুরু হওয়ার পর থেকে।

জায়গাটা যেমন মনোরম, পুরানো কীর্তিরও তেমনি গোণাগুণতি নেই। এখানে-সেখানে বহু সাধক ও শহীদের স্মৃতি-নিদর্শন, প্রভু বুদ্ধের নামে উৎসৃষ্ট অসংখ্য গুহা ও মন্দির। ঘণ্টা কয়েক মাত্র হাতে, এর মধ্যে ক'টা

জায়গায় বা যাবো, আর কি-ই বা পরিচয় দেবো আপনাদের! দুই বুদ্ধ-মন্দিরের মাঝে শ্যাম গিরিচূড়া—সে-লাই (Tse Lai)। ভারতের রাজগির থেকে উড়তে উড়তে উনিই নাকি লেকের ধারের জায়গাটা পছন্দ হয়ে যাওয়ায় ঝুপ করে বসে পড়েন। 'হাস্যানন বিশাল-বুদ্ধ'—মস্ত এক পাহাড় খোদাই করে বুদ্ধ-মূর্তি বানিয়েছে, হাসিতে ঝলমল মুখখানা। এক পাহাড়ে কাছাকাছি তিন মন্দির—মন্দিরের নাম বাংলা করলে দাঁড়াচ্ছে—ঊর্ধ ভারত-মন্দির, মধ্য ভারত-মন্দির আর নিম্ন ভারত-মন্দির। আর একটা মন্দিরের নাম হল—ছয় দিকের মন্দির। ছ'টা দিক হল—উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম, ঊর্ধ-অধঃ। পৃথিবীর তাবৎ অঞ্চল থেকে ভক্তেরা বুদ্ধের উপাসনায় সমবেত হবেন, তদর্থে মন্দিরের এই নাম।

একটু এগিয়ে রাস্তার উপরে বাস। অমিতাভ বুদ্ধ-মন্দিরে এবার। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিস্তর মন্দির; উঠোন এবং পুজা-অর্চনার ঘরও অনেক; ধর্মশাস্ত্র ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে ঠাসা লাইব্রেরি। শ্রমণদের বাসা এক দিকে—দিব্যি খোলামেলা। বুড়োরা দিনরাত শাস্ত্রচর্চা নিয়ে আছেন। জোয়ান যুবাদের এ সব তো আছেই, তার উপরে বাড়তি কাজ—চারি পাশের জায়গা-জমিতে ফলমূল শাকসবজি ও নানারকম ফসল ফলানো। নতুন-চীনের সংকল্প, এক ফোঁটাও পতিত জায়গা থাকতে দেবে না—সে কর্মে সাধুরাও কোমর বেঁধেছেন।

বহু মূর্তি—সোনার পাতে মোড়া বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও দিকপালেরা। মুখ্য-মন্দির অতি প্রকাণ্ড; রকমারি রঙিন চিত্রে ছাত ভরতি। ভিতরে মধ্যমূর্তির মাথা ঐ অমন উঁচু ছাত অবধি গিয়ে উঠেছে। কপালে উজ্জ্বল বৃহৎ মুক্তা, বুকে স্বস্তিক। সামনে ধূপাধার—তার সাইজও বুদ্ধমূর্তির অনুপাতে। ধূপের ছাইয়ে অত বড় পাত্র কানায় কানায় ভরতি।

পিছনে আর এক মন্দির। তিনটি বৃহৎ মূর্তি পাশাপাশি—তিন মূর্তিরই বুকে স্বস্তিক। মধ্যমূতির হাতে অর্ধচক্র—সেই দিকে বুদ্ধ নিবদ্ধদৃষ্টি। জগতের যাবতীয় ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য তিনি অবলোকন করছেন এমনি ভাবে। এই মূর্তিদের ঘিরে চতুর্দিকে আরও চুরাশী মূর্তি—ভারত থেকে গিয়ে হাজির হয়েছেন নাকি। পুজার বিস্তর হাঙ্গামা, অনেক রকম তোড়-জোড় করতে হয়। মন্দিরের বাইরে দোকানপাট পুজার উপকরণ বিক্রির জন্য। আমাদের তীর্থস্থানে যে রকম দেখতে পান।

একটা ছাত ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে, নতুন আমলে সেটা মেরামত হয়েছে। এখনো টুকিটাকি কাজকর্ম চলেছে, দেয়াল-ছবিতে নতুন করে রং ধরাচ্ছে। ষোল শ' বছর আগে এ সব তৈরি। পাশের মন্দিরে স্থাপয়িতার মূর্তি। মন্দির তৈরির কাঠ আসত বহু দূর থেকে। আসত নাকি মাটির নিচে পাতালপুরীর পথে। এক কুয়োর তলায় পৌঁছে সেখান থেকে সমস্ত কাঠ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ভুঁয়ের উপরে উঠে আসত। মন্দির শেষ হয়ে এলে মানা করে দেওয়া হল, আর কাঠ লাগবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমদানি বন্ধ। কাঠ আসতে আসতে বন্ধ হয়ে গেল পাতালে; একটা কাঠ কুয়োর তলা অবধি চলে এসেছিল—সেইখানে আটকে রইল। তার পরে খেয়াল হল—আরে সর্বনাশ, সব চেয়ে বড় কড়িকাঠটাই তো লাগানো হয়নি। আর উপায় নেই। কুয়োর তলার কাঠ কোন রকমে উপরে তোলা গেল না। তখন জোড়াতালি দিয়ে মূল-কড়িকাঠ বানানো হল। চোখেও দেখলাম তাই। উৎকৃষ্ট কাঠ দিয়ে মন্দিরের অন্য সকল কাজকর্ম—কিন্তু আসল কাঠখানায় তালি দেওয়া। সেই কুয়ো রয়েছে মন্দিরের চত্বরে—দড়িতে আলো ঝুলিয়ে তার ভিতরে নামিয়ে দিল। অন্ধকার তলদেশে দেখতে পেলাম বটে প্রকাণ্ড কাঠের কুঁদোর অগ্রভাগ। একটু কারুকর্মও আছে সেই কাঠের উপর।

বাসায় ফিরে দেখি, খাওয়ার ঘণ্টাখানেক দেরি। সময়ের অপব্যয় করি কেন—সিল্কের দোকানে কিছু কেনাকাটা করা যাক। হ্যাংচাউ নানা জাতীয় শিল্প-কর্মের জায়গা; এখানকার রেশমি ব্রোকেডের ভারি নাম। সবাই চললাম: সওদা হল প্রচুর।

নাকে-মুখে দুটো গুঁজে এবার এক্‌জিবিশনে। যে জায়গায় যাচ্ছি, এক্‌জিবিশন আছেই। সেই অঞ্চলে কি কি বস্তু তৈরি হয়, কি তার দাম, কোন কোন বিষয়ের নতুন কি চেষ্টাচরিত্র চলছে—এক নজরে মালুম হবে। মানুষও ছোটে মেলা দেখবার মতো। ধরতে পারে না, কায়দা করে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের। সর্বত্র যেন শিক্ষার ফাঁদ পেতে রেখেছে; না শিখে যাবে কোথা বাছাধন!

পাটচাষের বিপুল উদ্যোগ। একটা লম্বা ঘরে কলকব্জা বসিয়ে গাঁইটবাঁধা এবং চট ও থলে তৈয়ারি দেখানো হচ্ছে। তেমনি দেখাচ্ছে সিল্কের উপর

ছবি-বুনানি ও ব্রোকেড-তৈরি। কাগজের কল, সিগারেটের কল—আরও বিস্তর ভারী ভারী কলকব্জার নমুনা রেখে দিয়েছে।

একজিবিশন থেকে মিউজিয়াম। ভারি এক মজার জিনিস এখানে। পুরানো এক পাত্র—ওরা বলল, হাজার খানেক বছর বয়স—পাত্রের নিচে খোদাই করা আছে চারটে মাছ, মাছের মুখ থেকে ফোয়ারার মতন জলধারা উঠছে। পাত্রটা জলে ভরতি করে আংটা দুটো ঘষতে লাগল। ঘষতে ঘষতে শুনি, শিরশির করে আওয়াজ উঠছে জলে। তারপর সত্যি সত্যি ফোয়ারার ধারায় জল উঁচু হয়ে উঠতে লাগল পাত্রের নিচে ঠিক যেমনটা আঁকা রয়েছে। হ্যাংচাউ-মিউজিয়ামের এই আশ্চর্য বস্তুটা অতি অবশ্য দেখে আসবেন।

হ্রদের ঠিক উপরে পাহাড়ের গায়ে বাগিচা। ঝরণা আছে সেখানে, কুঞ্জ-বন, রং-বেরঙের মাছ, নানা রকম গাছপালা। টিলার উপরে বসবার জায়গা—বসে বসে হ্রদ-শোভা অবলোকন করুন। হ্রদটা দু-ভাগ করে মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে—সীমন্তিনীর কালো চুলে সিঁথিপাটির মতন। আর এদিকে ওদিকে ছড়ানো অগুন্তি পাহাড় ও দ্বীপের টুকরো।

মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো ঘিরে দাঁড়ায় আমাদের। সম্বর্ধনা করছে, আর ঐ সঙ্গে মাও-তুচি অর্থাৎ চেয়ারম্যান মাও'র চিরজীবন কামনা। ভাষা না বুঝি—এটা বুঝতে পারি, ওদের বুক কানায় কানায় ভরে আছে মাও'র প্রতি ভালবাসায়। কারণে অকারণে মাও'র বন্দনা গায়।

বিদায়বেলা শান্তি-কমিটির এক কর্তাব্যক্তি বললেন, রসুন—ক'টি জিনিস নিয়ে যেতে হবে,—আমাদের সামান্য স্মরণ-চিহ্ন। হ্যাংচাউয়ের হাতের কাজের জুড়ি নেই। তারই একগাদা করে দিয়েছে প্রতি জনকে। হাতির দাঁতের মূর্তি, চন্দনকাঠের পাখা, চিত্রবিচিত্র ছাতা, রুমাল—আরও কত কি, এতদিন বাদে ফর্দ দিতে পারব না। বিদায়-বক্তৃতায় বললাম, ভাষার কারিগর বটে আমি, কিন্তু অন্তর ভরে গেছে। ধন্যবাদ দেবো, সে ভাষা আজকে খুঁজে পাচ্ছি নে...

বাড়িয়ে বলা নয়, সত্যি সেই অবস্থা। স্টেশনে যাচ্ছি, পদে পদে ভাল-বাসার বাঁধন ছিঁড়ে এগোচ্ছি যেন। এক দঙ্গল চলল স্টেশন অবধি। সাড়ে-সাতটায় হাংচাউ ছেড়ে ট্রেন রাত-দুটোয় সাংহাই এসে দাঁড়াল। ঘুমোবার অধিক সময় নেই, ন'টার আগে এরোড্রোমে হাজির হব। এখান থেকে ক্যান্টন।

আসবার সময় ক্যান্টনে একটা রাত শুধু ছিলাম—ফিরতি মুখে এবারে কিছু দেখে-শুনে যাবো।

(৪৪)

বিদায় সাংহাই!

এরোড্রোমে প্লেনের ভিতরে বসে বসে দেখছি। তেপান্তরের মাঠ। লড়াইয়ের কাজে এত বড় করে বানিয়েছিল। এখন খানিকটা জায়গায় প্লেনের উঠানামা, বেশির ভাগ পোড়ো-জমি ও ঘাসবন হয়ে আছে। এই উঠানামার এলাকা বাড়ানো হচ্ছে, গ্যাংওয়ে লম্বা করা হচ্ছে, নতুন নতুন কোঠাবাড়ি উঠছে এদিকে-সেদিকে। কাচের জানলা দিয়ে অলস দৃষ্টি মেলে দেখছি।

নদী অদূরে। জল দেখতে পাইনে, কিন্তু মন্থরগতি পাল ভেসে চলেছে হাওয়ায়। গোটা দুই-তিন জাহাজের মাস্তুল স্থির দাঁড়িয়ে। কাশবন মাঠের প্রান্তে, হু-হু করে হাওয়া দিয়েছে—পলিতকেশ বুড়োর মতন কাশফুল মাথা দোলাচ্ছে। নাম-না-জানা গুল্মে অজস্র হলদে ফুল ফুটে আলো হয়ে আছে চারিদিক। রুমাল নাড়ছে হাস্যমুখ মেয়েরা ওধারে বারান্ডার উপর ভিড় করে। বারান্ডার নিচে পায়োনিয়র ছেলেমেয়ের দল। মুরুব্বিরা প্লেনে উঠবার সিঁড়ি অবধি এগিয়ে এসেছেন। রুমাল আর হাত নাড়ছে সকলে। আমরা যেমন করে কাউকে কাছে ডাকি, ওরা ঠিক তেমনি ভাবে হাত নেড়ে বিদায় দেয়। এঞ্জিন গর্জন করছে, বিদায়, বিদায়!

সুপ্রাচীন এক প্যাগোডার চূড়া, নামটা জেনে নিয়েছি—লং-ফা প্যাগোডা। আর ফ্যাক্টরির অসংখ্য চোঙা ধোঁয়া ছাড়ছে আকাশে। আমার পাশে বসে এক ভদ্রলোক শহর থেকে এরোড্রোম অবধি এলেন। অল্প-সল্প ইংরেজি জানেন, মনের দোর মুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি একবারে। দু-জনেই পরস্পরকে উত্তম রূপ বুঝি, এটা তিনি ধরে নিয়েছেন; অপার দুঃখ-রাতি কাটিয়ে উভয় জাতিরই সূর্যালোকের পথে যাত্রা। তাঁকেও ঐ দেখতে পাচ্ছি—দলের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। ছুটছে প্লেন গ্যাংওয়ের উপর, গর্জন ভয়ানক রকম বেড়েছে। উঠে পড়লাম আকাশে। খাল-নদী, বিশাল শহর, শহরের ঘরবাড়ি এক দিকে হেলে পড়েছে। শহর পিছনে ফেলে সাঁ করে বেরিয়ে এলাম।

সকালবেলা আজ কিংকং হোটেলের জানলা দিয়ে প্রসন্ন রোদ মেজেয় পড়েছিল। পেরিন লাফিয়ে উঠলেন, দেখ, দেখ—কি আশ্চর্য রোদ্দুর! সোনা কুড়িয়ে পেলে মানুষ অমন করে না। চলে যাবার ক্ষণে সাংহাইয়ের সূর্য প্রথম আমাদের মুখ দেখালেন; রোদ পোহাতে পোহাতে এসে প্লেনের খোপে ঢুকেছি। কিন্তু আকাশে উঠেই কোথায় সব রোদ মিলিয়ে গেল! মেঘ, মেঘ —মেঘের সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছি, মেঘ ছাড়া কিছু নেই কোন দিকে। জানলার কাচ কুয়াসায় আচ্ছন্ন। জানলার এধারেও দেখি জল ফুটেছে, ফোঁটা হয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। দেশের টানে—আপনাদের কাছে ফিরে আসবার জন্য, মেঘ ভেদ করে তীরবেগে ছুটছি। আচ্ছা, টুপ করে যদি ভূঁয়ে পড়ত প্লেন, এমন তো আকচার হচ্ছে—কাগজে এক ছত্র নামটা হয়তো দেখতে পেতেন, কিন্তু আমাদের মনের আকুতি একটুও পৌঁছত কি আপনাদের মনে?

২-৩৫-এ ক্যান্টন পৌঁছবার কথা। দুটো নাগাদ পাইলটের ঘর থেকে কবুল জবাব এলো—দেরি হবে, পৌঁছচ্ছি ৩-১৮ মিনিটে। বিষম এক মুখোড় বাতাসের সামনে পড়েছিলাম, বিস্তর হুটোপুটির পর পবনদেব পরাস্ত হয়েছেন। বাইরে এত কাণ্ড, ভিতরের আমরা কিচ্ছু জানিনে—আণ্ডা-আপেল মুখে ঠাসছি আর হাতে কলম চালাচ্ছি।

আবার উজ্জ্বল রোদে এসে পড়েছি, রোদের সমুদ্রে ঢেউ তুলে তুলে যেন উড়ছি। ভূমিতল স্পষ্ট হয়ে এলো। পাহাড়ের উপরে এখন—অগণ্য শিখর, ঝিকমিকে ঝরণাধারা। আরে, এসে গেলাম যে ক্যান্টনে! সেই আর একদিন এইখানে আমায় একলা ফেলে রেখে যাচ্ছিলেন, আজকে দলনেতা হয়ে সকলকে বহাল তবিয়তে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। এরই নাম মহৎ প্রতিশোধ!

নতুন জায়গায় পা ফেললে যেমন হয়ে আসছে—কচি কচি হাতের কুসুমগুচ্ছ, আর শত শত হাতের হাততালি। এবং নানান দিক থেকে ক্যামেরার ঝিলিক হানা। হোটেলে ঢুকবার মুখে পুনরায় এক দফা অভ্যর্থনা। সেই আই-চুন হোটেল—পাশে বয়ে চলেছে আনীল-সলিলা তরঙ্গময়ী পার্ল।

স্নান এবং বিশ্রামাদি হল। বাহাত্তর শহীদের সমাধিভূমি—যাবার সময় মোটে একটা রাত্রি ছিলাম, কোনখানে যাওয়া হয়নি। কুমুদিনী মেহতা, পেরিন এবং আরও কে কে যেন আমার কাছে জিজ্ঞাসা করতে এলেন। হ্যাঁ, সকলের আগে ঐ শহীদস্থানে ফুল দিয়ে তাঁদের প্রণাম করব। মেয়েরা বেরিয়ে পড়লেন; ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তৈরি করিয়ে আনলেন সাদাফুলের দেড়মানুষ সমান

স্তবক। পরম যত্নে এবং অতি সন্তর্পণে সেই বস্তু গাড়িতে তুলে নিয়ে দল-সুদ্ধ আমরা চললাম।

জায়গাটার নাম বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'হলদে ফুলের পাহাড়'। তাই বটে! মর্মরসৌধের চতুর্দিকে লক্ষ-কোটি তারার মধ্যে হলদে হলদে ফুল ফুটে আছে। ২৯শে মার্চ, ১৯১১—সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের গবর্নরের বাড়ি হানা দিল একশ সত্তর জন তরুণ বিপ্লবী। তার মধ্যে বাহাত্তর জনকে পাওয়া গেল—বাহাত্তরটি স্তূপীকৃত শবদেহ। বাকি তারা কোথায় গেল, কেউ জানে না। সেই বাহাত্তর বীরকে বয়ে নিয়ে এসে এইখানে মাটি দেওয়া হল। স্মৃতিসৌধ অনেক পরে হয়েছে১৯১৯ অব্দে—বেশির ভাগ খরচ দিয়েছিলেন প্রবাসী চীনারা।

সেই বিশাল পুষ্পোপহার-বহনের গৌরব আমাকেই দিলেন সকলে; ভারতীয় প্রতিনিধিদের তরফ থেকে আমি পুষ্পার্ঘ্য দিলাম। কয়েক জন সশস্ত্র সৈনিক দিনরাত্রি এখানে পাহারা দেয়। আমাদের দেখে এদিক-ওদিক থেকে বাড়তি সৈন্য অনেক এসে জুটল। সাধারণ মানুষও বিস্তর দাঁড়িয়ে গেছে। দোভাষি বললেন, বলুন আপনি কিছু; ওরা শুনতে চাচ্ছে। পেরিনও বলছেন, বলুন, বলুন। কিন্তু কী এদের সম্বন্ধে এখন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলব! এত বয়স অবধি নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে বেঁচে রয়েছি—তাতে যেন আজকে ছোট হয়ে যাচ্ছি এদের সামনে; লজ্জা লাগছে। এরাও তো বেঁচে থাকতে পারত! কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের শতেক লাঞ্ছনা হজম করে বাঁচতে তারা চাইল না। আমি যে জানতাম এমনি কত জনকে, কত তাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছি! কথার বেসাতি করে তো জীবন কাটল,—কিন্তু এমন কথা কোথায় আজ পাই, যা দিয়ে এদের স্তুতি-গান গাঁথা যায়।

না, বক্তৃতা নয়; শুধু গান। এই দিনান্তবেলা সুরে সুরে ক্ষিতীশ এদের বন্দনা করবে। সে কোন নতুন গান নয়—ঠিক এই গানই আরও কতবার শুনেছি। কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্যে গানের কথা আজকে পাগল করে তুলল। আর বাংলায় গান যখন, আমারই বুঝিয়ে দেবার দায়। কিন্তু এ কি করছি—গানের মধ্যে নেই, তেমনি কত কি বলে চলেছি আকুল কণ্ঠে। বক্তৃতা বলবেন না একে, আমার মর্মছেঁড়া অশ্রুজল। বন্ধু, চোখে না-ই দেখে থাকি, চিনি আমি তোমাদের সকলকে। ভাল করে চিনি। আমাদেরও কত ছেলেমেয়ে গেছে এমনি! তারা আর তোমরা এক জাতের। এক তোমাদের ধর্ম, একটি মন।

মানুষের মুক্তির জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, যে দেশ এবং যে কালেরই হোন—তাঁদের নামে এই কুসুমাঞ্জলি। কুসুম দিলাম ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রীতিলতা, ভগৎসিংদেরও। আমার স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আজ এই সন্ধ্যালোকে সকলকে আমি পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি...

শহরের ভিতর ঘোরাঘুরি করতে করতে এলাম—কৃষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রে। চাষীদের একেবারে আপন জায়গা। ১৯২৬ অব্দে মাও সে-তুং শিক্ষণ-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন কৃষক-আন্দোলনে কৃষকদের গড়ে তোলবার জন্য। তিনিই ছিলেন পরিচালক। আজকের প্রধান মন্ত্রী চাউ এন-লাই ছিলেন এক মাস্টার এখানকার; কো মো-জো এক কর্মী। গাছের তলায় একটুখানি চাতাল মতন—এইখানে গভীর রাত্রি অবধি বসে মাও চাষীদের নিয়ে বৈঠক করতেন। রাত্রিবেলা কেন্দ্রের কাজকর্ম এখন বন্ধ হয়ে গেছে, ঘরবাড়িগুলোই শুধু দেখা হল।

হোটেলে ফিরতে না ফিরতে ব্যাঙ্কুয়েটে নিয়ে বসাল। দলনেতার বসতে হয় হলের মাঝখানটায় সকলের বড় টেবিলে সর্বদৃষ্টির সামনে। একটেরে বসে আত্মরক্ষা করব, সে জো নেই। টেবিলের উপরে থরে থরে রাক্ষুসে আয়োজন। এ-ও কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা—খাওয়া বলবেন না একে, নিতান্তই চাখা। চাখার কাজ শেষ হয়ে গেলে তখনই আসল খাবার পদের পর পদ আসতে থাকবে। চীনে আমাদের দিন শেষ হয়ে এলো, আয়োজন তাই হিমালয়স্পর্ধী হয়ে উঠেছে। যাকে বলে শেষ মার।

ডক্টর কিচলু ভোরবেলা ট্রেনে এসে পড়ছেন। এলে তো বেঁচে যাই। আমার এই আবুহোসেনি বাদশাহির ভার-বোঝা নামিয়ে বাঁচি। একটা দিন আগে যদি আসতেন, এই বিষম ভোজ থেকেও রক্ষা পেয়ে যেতাম। শীতের জায়গা, তবু—হলপ করে বলছি—আলোয়ানের নিচে সর্বদেহ ঘেমে উঠেছে। মুখ শুকনো করে বলি, শরীর ভাল লাগছে না। রাত্তিরবেলাটা নিরম্বু উপোস দেবো ভেবেছিলাম—

মুরুব্বিরা শশব্যস্তে শুধান, অ্যাঁ, সে কি? অসুখ-বিসুখ করল বুঝি? কি রকমটা হচ্ছে বলুন তো?

সর্বনাশ, এ কোন দিকে চলেছি! চাটু থেকে উনুনের আগুনে। সেই

পিকিনের মতন ডাক্তার-নার্সের জিম্মায় যদি ঠেলে দেয়! মিনিটে মিনিটে ওষুধ খাওয়াতে লেগে যায় শিয়রে নার্স মোতায়েন রেখে! সুরটা যেন সেই ধরনের। তার চেয়ে চোখ-কান বুজে যদ্দুর পারি চালিয়ে যাই। এখন তো গলাধঃকরণ করে নিই, তার পরে কায় ক্লেশে ঘর অবধি গিয়ে যে কাণ্ড হবার হোক গে।

কি হয়েছে আপনার ?

এক গাল হেসে তাড়াতাড়ি সামলে নিই, হবে আবার কি! বড্ড বেশি খাওয়া হচ্ছে, এ বেলাটা একটু বিশ্রাম নেবার তালে ছিলাম। যাকগে—কম-কম খাবো। এই আরজি জানিয়ে রাখছি আগে-ভাগে।

ওঁরা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছেন। ষোল আনা যে বিশ্বাস করেছেন, তা নয়। কিন্তু আমার অত উৎসাহের উপর কি আর বলবেন! নিরামিষ ব্যাঙের-ছাতা গোটা দুই-তিন একসঙ্গে মুখে পুরে কপ-কপ করে চিবিয়ে অটুট স্বাস্থ্যের প্রমাণ দিয়ে দিই।

এর পরে সর্বোত্তম তরকারিটা এলো—হাঙরের পাখনার ডালনা। সাবু খেয়ে থাকেন তো জ্বরজারি হলে? রং অবিকল অমনি, এবং বস্তুটা ওর চেয়েও আঠা-আঠা।

কম করে দেবেন—

শান্তি-কমিটির সভাপতি আমার পাশে, বড় পাত্র থেকে তিনি চামচে কেটে কেটে দিচ্ছেন। বিগলিত কণ্ঠে ভদ্রলোক বললেন, মুখে ঠেকিয়েই দেখুন না। তার পরে বলবেন।

এক নাগাড় তারিপ শুনে শুনে দুর্বুদ্ধির বশে প্রায় পুরো চামচে গলায় ঢেলে দিয়েছি। আর যাবে কোথায়! যে আশঙ্কা করেছিলাম, তাই বুঝি এই ভোজের টেবিলে ঘটে যায়! অন্নপ্রাশনের দিনে প্রথম-খাওয়া অন্নগ্রাস অবধি ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

অসহায় ভাবটা মুখে চোখে প্রকট হয়ে থাকবে। চতুর মেয়ে কুমুদিনী হলের নির্বিঘ্ন দূরপ্রান্ত থেকে খুক-খুক করে চাপা হাসি হাসছেন। হেন অবস্থায় ধৈর্য থাকে না। ঠেলেঠুলে এই বিপাকে ফেলে দিয়ে এখন আপনারা মজা দেখছেন। এই বটে কলির ধর্ম!

আজকে আমার শেষ-সম্ভাষণ চীনদেশে এই চীনা বন্ধুদের মধ্যে। কিচলু এসে পড়লে কে আর ঝামেলায় যাচ্ছে! আছিও মোটে আর কালকের দিনটা।

বললাম সেই কথাই।—এক মাসের বেশি হয়ে গেল, এই ক্যান্টনে এমনি এক রাত্রে ভয়ে ভয়ে পা ফেলেছিলাম। সেদিন ছিলাম নিতান্ত পরদেশি। তার পরে আত্মীয় করে নিলেন আপনারা। আজকে আমি পুরোপুরি আপনাদের একজন। আমাদের দলের সকলেই তাই। চলে যাবো, তাই দেখুন চোখে জল ভরে আসছে, কথা জুটছে না মুখে—

বড্ড ভারি হয়ে যাচ্ছে, তাই কিঞ্চিৎ হাসিয়েরসিয়ে দিই।—যেতে মন চায় না আপনাদের ছেড়ে। ভেবেছিলাম যাবো না আর—পাকাপাকি থেকে যাবো। তাই কি হতে দেবেন? এমন খাওয়াচ্ছেন যে পাকস্থলী বিদ্রোহ করে বসেছে। সেই জন্যেই তো থাকা চলল না।

প্রায় পেশাদার বক্তা হয়ে উঠেছি, বিদেশ-বিভূঁয়ে এদের বোকাশোকা পেয়ে মজাসে আগডম-বাগডম চালাচ্ছি। তা বলে কামারের বাড়ি সুচ চুরি চলে না। আপনাদের কাছে হলে—ওরে বাবা, হাততালি দিতেন না, একখানা হাত বক্তার গলদেশে স্থাপন করতেন, আর এক হাতে পথ দেখাতেন। ক্ষিতীশ ভারি খুশি। বলে, আচ্ছা জমিয়েছেন দাদা! এবং আরো খুশি ভোজ অন্তে যখন এক গাদা উপহারসামগ্রী এসে পড়ল। ক্যান্টন ভালবাসে তোমাদের—ভাগ্যবশে এই যাদের কাছাকাছি পেয়েছি, তাদেরই শুধু নয়, ভারতের সকল নরনারীকে। এবং আজ বলে নয়, হাজার হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন ভালবাসা। ছয়-বটগাছের প্যাগোডা দেখে এসো কাল—ঐ এক জায়গা থেকেই পুরানো সম্পর্কটা ঠাহর হবে।

(৪৫)

একদা ছিল সাত বটগাছ। একটা মরে গিয়ে এখন ছ'টা আছে। ডালপালা-মেলানো, ছায়াময়—দূর থেকেই নজরে আসছে। শ্রমণরা রাস্তা অবধি ছুটে এলেন, আসুন—আসুন—এ তো আপনাদেরই জায়গা। এই যত বটগাছ—সমস্ত ভারত থেকে এনে পোঁতা। পবিত্র জ্ঞানে পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে আমরা পালন করে আসছি।

এক হাজার শ্রমণের বসতি এই প্যাগোডায়। ৫৩৫ থেকে ৫৪৫—দশ বছর লেগেছিল প্যাগোডা ও ঘরবাড়ি তৈরি করতে। সতের তলা স্তম্ভ; বাইরে

থেকে দেখবেন কিন্তু সাত তলা। স্তম্ভের খানিকটা অবধি উঠে নেমে এলাম হাঁপাতে হাঁপাতে। চূড়ায় ওঠা হল না।

সেই পুরাকালে কাঞ্চিয়ান (আসল নামটা কি, পণ্ডিতেরা বলুন। কাঞ্চন? অথবা কাঞ্চীপুরবাসী? ওদের মুখে মুখে কাঞ্চিয়ান নাম দাঁড়িয়ে গেছে। অবোধ্য হওয়ায় বানান করতে বললাম দোভাষিকে। সে ইংরেজি বানান দিল —Kunchin) নামে এক ভারতীয় এসেছিলেন ধর্মপ্রচার করতে। নানান তরফের শত্রুতা, প্রাণ সংশয় হয়ে উঠল তাঁর। শেষটা তিনি নারী-বেশ নিলেন; নারীর সজ্জায় থাকতেন অহোরাত্রি, ঐ বেশে ধর্মকথা বলতেন। সেই নারীরূপের প্রতিমূর্তি রয়েছে এখানে। পুরুষমূর্তিও আছেন নাকি অন্যত্র। আর আছে ওয়াং-নাং রাজার তাম্রমূর্তি—যাঁর আমল থেকে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার।

প্যাগোডার আসবার আগে সকালবেলা আজ একা-একা বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিঞ্চিৎ বকুনি খেলাম সেই অপরাধে।—অমন ধারা দুঃসাহস কদাপি দেখাতে যাবেন না, দোহাই! হেসে হেসে তখন আমি পিকিনের গল্প করি। মরিশন স্ট্রীটের বাজার চুঁড়ে বেড়ানো; ভাষা না জেনেও পথের জনতার সঙ্গে দহরম-মহরম; চন্দ্রালোকে তিয়েন-আন-মেনের সামনে সেই আহা-মরি নৃত্য! ও'রা বলেন, পিকিনে যত্র-তত্র ঘোরাঘুরি করুন গে, সাংহাইতেও আপত্তি করব না; কিন্তু এখানে—জানেন, গেল-বছর ভারতের বন্ধুরা ক্যান্টনে পা দিলেন, আর সেই রাতে বিপদের সাইরেন বাজল। আজকে অবিশ্যি ক্যান্টন অবধি এসে চিয়াং কাইশেকের বোমা মারবার তাগত নেই। তাহলেও চেলা-চামুণ্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমাদের কোন রকম শারীরিক হানি ঘটানো বিচিত্র নয় চীন-ভারতের বন্ধুত্বে চিড় খাওয়াবার মতলবে। তাই এত সামাল, সামাল!

যাকগে। কিছু তো হয়নি—আছি বহাল-তবিয়তে, তবে আর কথা কি! প্যাগোডা দেখা শেষ করে পিপলস স্টেডিয়ামের দোর-গোড়ায় মোটরগুলো এসে থামল। এখনো কাজ চলছে, লোক খাটছে। আগে ভিক্ষা করে খেতো এই সব লোক—এক ক্যান্টনেই ছিল তিন হাজার ভিক্ষুক। বৃত্তিটা বে-আইনি হয়ে যাবার পর সক্ষম সমর্থগুলোকে বেছে নিয়ে এমনি নানান কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। ১৯৫০ অব্দে পাঁচ মাসের ভিতর তড়িঘড়ি এই স্টেডিয়াম বানিয়ে

১লা অক্টোবরের জাতীয় উৎসব করল। ত্রিশ হাজার বসবার জায়গা, আরও ষাট হাজার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তিন দিকে পাহাড়—এটাও ছিল পাহাড়-মতো জায়গা। মাঝের মাটি-পাথর খুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমান চৌরস করেছে। চতুর্দিকের উঁচু অংশে কেটে কেটে ধাপ বানানো; সিমিন্টের পলস্তারা ধাপের উপর। ঐ হল গ্যালারি। চালাকি করে কত সস্তায় কিস্তিমাত করেছে, দেখুন।

পাশে পাঁচতলা বাড়ি—পিপলস মিউজিয়াম। ঐ যে বললাম—যেখানে পা ফেলবেন, মিউজিয়াম-এক্জিবিশান আছেই। সোভিয়েট দেশেও এমনি দেখে এলাম। শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষা! না শিখে যাবেন কোথা? যত রকমে পারো মানুষের চোখ-কান ফুটিয়ে দাও, তারাই তারপরে দুনিয়ার হালচাল বুঝে নেবে। ঘুরে ঘুরে দেখছি। চারুকলা, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের নানা সামগ্রী। বিস্তর ছবি—১৯১১ থেকে ১৯৪৯, বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় ছবিতে এঁকে দিয়েছে। একটা অতি-পুরানো জিনিস—হাতির দাঁতের উপর ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরের লেখা। জোরালো ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসেও সে-লেখা পড়া মুশকিল।

সন্তরণাগার। আগে পোড়ো-জমি ছিল, হাল-আমলে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে তুলেছে। ক্যান্টনে এলে এটা দেখতেই হবে। এখনো কাজ চলছে। বাইরের দিকে লম্বা খাল কাটা হচ্ছে, নৌকো বাইবে দাঁড় টেনে টেনে। সে খালের উপরে পুল হচ্ছে আবার। দেখুন দেখুন, রাক্ষুসে ব্যাং একটা পাথরে তৈরি; তিনটে বিশাল সারস তিন দিকে। এই চার মুখে জলের ফোয়ারা। সাঁতারের সর্ব রকম বন্দোবস্ত। উজ্জ্বল আলো। স্টেডিয়াম বানিয়েছে—সেখানে বসে লোকজন সাঁতারের প্রতিযোগিতা দেখে। অমনি যে টুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা হবে না। বাথরুম আছে, সাবান ঘষে আগে ভাল করে নেয়ে-ধুয়ে নেবেন; পরিচ্ছন্ন সাঁতারের পোশাক পরবেন, তবে নামতে দেবে।

আর চব্বিশ ঘণ্টাও নেই চীন-ভূমিতে। চীন দেখা সাঙ্গ হয়ে এলো। স্পেশ্যাল-ট্রেনে আমাদের সীমান্ত পৌঁছে দেবে। রাত বারোটায় যাত্রা। সান-ইয়েৎ-সেন স্মৃতি-ভবন তবে তো এই বেলার মধ্যেই সেরে নিতে হয়।

১৯২১-৩১ অব্দে তৈরি। পাহাড়ের নিচে অষ্টকোণ বিরাট সৌধ—পুরো-পুরি চীনা পদ্ধতির। লাল দেয়াল, কাঠের কাজ; ছাতটা নীল টালির। হলে

সাড়ে পাঁচ হাজার চেয়ার, দেয়াল-ভরা খাসা খাসা ফ্রেস্কো ছবি। একটা থাম নেই এত বড় হলের ভিতর। স্টেজের অংশটা ভেঙে ১৯৫০ অব্দে নতুন ভাবে তৈরি। ডাক্তার সানের বিশাল মূর্তি প্রান্তদেশে। এই অঞ্চলের শান্তি-সম্মেলন হবে এখানে—তাই মাও-র ছবি দিয়েছে, পাঁচ তারার পতাকা আর রকমারি রঙিন আলোর সজ্জা করেছে।

পিছনে পাহাড়ের উপরে স্মৃতিস্তম্ভ। জাপানিরা বোমা মেরে জখম করেছিল, মেরামত হয়ে গেছে। আর হলের প্রবেশ-মুখে সান ইয়াৎ-সেনের নিজের হাতের অক্ষরে খোদাই করা আছে— তিয়েন সিয়া উই কুং—আকাশের নিচে যত মানুষ আছে সকলে এক।

সেই কত দিন আগে ক্যান্টন-স্টেশনে ফুটফুটে এক পায়োনিয়র মেয়ে নতুন আগন্তুকের হাত ধরে পথ দেখিয়ে এনেছিল! ওয়াই মিংঞা—নামটা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছিলাম, ওয়াই মিংঞা। আজকে শেষ দিন সেই ক্যান্টনে।

ওঁরা বলেন, পায়োনিয়র-ঘাঁটিতে একবার যাওয়া তো উচিত!

নিশ্চয়, নিশ্চয়! সব শহরে এমনিতরো ঘাঁটি আছে, একটাও দেখার ফুরসৎ হয়নি। তা ভালই হল। যাচ্ছি ওয়াই মিংঞাদের ওখানে। কি বিপদেই ফেলেছিল মেয়েটা! হাত কিছুতে ছাড়বে না—মোটরে উঠে দরজা দিতে পারি নে। এক হাতে ফুলের তোড়া, আর এক হাত তার ফুলের হাত দিয়ে বেঁধে রেখেছে। ছাড়িয়ে নেওয়া সোজা! আজকে যদি—কপালের কথা কি বলা যায়?—ওয়াই মিংঞাকে আজকে যদি পেয়ে যাই ওখানে! চিনতে কি পারব আলো-ঝলমল স্টেশনের বিপুল জনতার মধ্যে রূপের রঙের উল্লাসের দীপ্তির মাঝখানে মিনিট কয়েকের দেখা আমার ক্ষুদ্র বান্ধবীকে? সকলের থেকে আলাদা করে নিতে পারব?

পায়োনিয়র-ঘাঁটিতে ওয়াই-মিংঞাকে পেলাম না, কিন্তু তাতে কি! আর অন্তত পঞ্চাশটা রয়েছে অবিকল সেই মেয়ে। বিদেশি মানুষ, কালো চেহারা—তা বলে এতটুকু ভড়কে যায় না কোনটি। যেন সকালে-বিকালে দেখা হচ্ছে, হামেশাই এসে গল্পগুজব করি—আজকেও এসেছি। অচেনা নেই, এক নজর একটুখানি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখাও নয়। গিয়ে দাঁড়াতেই চক্ষের পলকে

ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল আমাদের। গুণতিতে আমরা কম, তারা অনেক বেশি। তাই তিনটি চারটির এজমালি সম্পত্তি হয়ে পড়লাম আমরা প্রতি জন। ভাগের মা গঙ্গা পান না, কিন্তু ভাগ-করা এই বুড়ো বুড়ো ছেলেগুলোকে হুল্লোড় করে এ-গঙ্গায় ও-গঙ্গায় নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাদের পায়োনিয়রদের ঐশ্বর্যের অবধি নেই—এবাড়ি ওবাড়ি এঘরে-ওঘরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ ধরল ডান-হাত তো ও এসে ধরে বাঁ-হাত। এ সোনালি মাছ দেখাবে তো ও টেনে নিয়ে দেখাবে লাল পাতাবাহার।

সান ফুন-লিন নামে অতি-ছোট্ট মেয়ে—আমি পড়েছি তার দখলে। আরও তিন-চারটে ভাগীদার আছে, কিন্তু সানের দোর্দণ্ড প্রতাপে তারা আমল পাচ্ছে না। লোকে যেমন ছাতা কি ঘটি-বাটি কিম্বা গামছাখানা খুশি মতন হাতে নিয়ে ঘোরে, আমাকেও তেমনি এদিক-ওদিক যথা ইচ্ছা হাত ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একটা ছেলে—তারও ভাগের আমি—বোধ করি, একেবারে বেদখল হয়ে যাচ্ছি বলেই আস্তে আস্তে আমার পিছন ঘেঁসে দাঁড়াল; সান অমনি মিলিটারি কায়দায় গটমট করে ছেলেটা ও আমার মাঝখানে গুঁজে দিল নিজেকে। গতিক বুঝে বেচারি আপোষে আরও খানিক পিছিয়ে গেল; ও-মেয়ের সঙ্গে লড়াইয়ের তাগত নেই। সান ফড়ফড় করে একগাদা কি বলে গেল আমার মুখের দিকে চেয়ে। মূর্খ মানুষ—আমি কি বুঝব তার কথা, বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে নাকি? যা মেজাজ এই দেখলাম—বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। বিপন্ন হয়ে দোভাষিকে বললাম, শিগগির মানে বলে দাও, ভুবন রসাতলে গেল—দেখছ না মুখভাব? মহা-প্রলয় নির্ঘাৎ এসে পড়ল, আর রক্ষে নেই। কি বলছে বুঝিয়ে দাও শিগগির।

দোভাষির সঙ্গে গোণা-গুণতি এই তো কয়েকটা কথা—তাতেও চটে গেছে। নিয়ে বের করল সেখান থেকে; দোভাষির কাছ থেকে নিরাপদ দূরে নিয়ে গেল। বটেই তো! সে যখন কর্ত্রী, যত কিছু বলাকওয়া একমাত্র তারই সঙ্গে। তার আদেশ বিনা অন্য লোকের কাছে মুখ খুললে সহ্য করবে কেন?

মিউজিয়ামে নিয়ে হাজির করল। মিউজিয়াম তো কতই দেখলেন, এ-মিউজিয়াম একেবারে আলাদা। ছেলেপুলেদের নিজ হাতে বানানো। আমরা বড়রা কি পারি ওদের সঙ্গে? বলুন। দলের পর দল বড় হয়ে বেরিয়ে যায়,

নতুন নতুন ছেলেমেয়ে আসে—মিউজিয়ামের সঞ্চয় বেড়েই চলেছে সকলের যত্নে ভালবাসায়। এ-আলমারির সামনে নিয়ে দাঁড় করাচ্ছে, ও-টেবিলের কাছে ঝুঁকে দেখাচ্ছে। বকবক করে তাবৎ বস্তুর পরিচয় দিচ্ছে, অনুমান করি।

দোভাষি দূর থেকে হাসি-হাসি চোখে অবস্থা তাকিয়ে দেখে,—কিন্তু তার ক্ষমতা কি, আমাদের এলাকার মধ্যে এসে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেয়! সানের মা-বাবা যখন অক্লেশে তার কথা বোঝে, ভাইবোন ও অন্য সব লোকে বুঝতে পারে, আমাদের বেলা দোভাষির বোঝাতে হবে কি জন্যে? তবু একটুকু সন্দেহ হয়ে থাকবে—মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সাড় নিচ্ছে, বুঝতে কোন প্রকার অসুবিধা হচ্ছে কি না। আরে, 'না' বলবার কি তাগত আছে, পরমোৎসাহে ঘাড় নেড়ে যাচ্ছি—অর্থাৎ, হে কন্যা মনসাঠাকরুন, তোমার কমাদাঁড়ি-হীন তাবৎ চীনা বকবকানি জলের মতন বুঝে যাচ্ছি; ফোঁস কোরো না, দোহাই! শ্রোতার বুদ্ধিমত্তার পরম খুশি হয়ে সান কথার তোড় আরও বাড়িয়ে দেয়।

দেয়ালে-দেয়ালে ছবি। ইজেলের উপর ছবি—আধেক-আঁকা, পুরো-আঁকা সব ছবি। ছবির গাদা বের করে মেলে ধরে দেখাচ্ছে। ছবি-আঁকে—তার বাবদে কত রং, কত সরঞ্জাম! অভিনয় করে, তার জন্যে সাজ-পোশাকের বাহার কত! রেলগাড়ি-এরোপ্লেন বানায়, টুকরো টুকরো লোহা-সাজিয়ে ক্রেন তৈরি করে। আরও কত রকম কারিগরি! ঐশ্বর্য অনন্ত। কত পুতুল, কত রকম-বেরকমের খেলা!...এসো না, খেলবে একটু আমাদের সঙ্গে। এক আছে গাড়ি-গাড়ি খেলা—দৌড়তে হবে এঞ্জিন হয়ে।—আরে দূর, দৌড়-ঝাঁপের খেলা ভদ্রলোকে খেলে বুঝি! চেয়ারে বসে বসে যা খেলা যায়! কানা-মাছির বুড়ি হয়ে বসি—ছোঁও দেখি চোখ বুজে কেমন পারো! তা ছুঁয়েই তো দিল প্রায় সকলে। হেরে গেলাম। হেরে গিয়ে তখন জোর করে কোলের উপরে তুলে নিই। তোমরা শুধু মাত্র ছুঁয়েছ, আমি এই জাপটে ধরেছি বুকে। শেষ অবধি জিত আমারই, কি বলো? চলো, আর কোথায় যাওয়া যায়, অন্য কি দেখবার আছে?

ছোট হলঘর। ঐ যে অভিনয়ের কথা শুনলেন, তার স্টেজ হল এখানে। থিয়েটার ছাড়া সভাও হয়ে থাকে। স্টেজটুকু বাদ দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট চেয়ারে বাকি ঘর বোঝাই। সেই চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বসলাম। দেখাচ্ছে আমাদের কত ছোট। কেউ ফোটো তুলে রাখেনি যে! তা হলে আপনাদের হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতাম কেমন করে বয়স ভাঁড়িয়ে ছোট্ট এইটুকু হওয়া যায়।

ভেবেছিলাম চেয়ার ভেঙে পড়বে। তা নয়, দিব্যি শক্ত। কিম্বা হতে পারে, মাথা থেকে জ্ঞানবুদ্ধির আবর্জনা নেমে গিয়ে আমরাই ওজনে হালকা হয়ে গেছি। চেয়ার কেন তবে ভাঙবে?

সে তো হল, বক্তৃতা শুনতে চাই যে একটু। যেইমাত্র বলা, বালখিল্য এক বক্তা গটমট করে স্টেজের উপরে উঠে গেল। একটু দৃকপাত নেই। ভাবখানা হল এ আর শক্তটা কি—হলে এসে বসে পড়েছ, শোনাতেই হবে যা-হোক কিছু। মরীয়া হয়ে দোভাষিকে কাছে টানলাম। বক্তার চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখছি—কথার মানে না বুঝলে পুরো মজা পাওয়া যাবে না।

'বিদেশি বন্ধুরা, তোমাদের পেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে। দেশে ফিরে ভারতের ছেলেমেয়েদের কাছে বোলো আমাদের কথা। তাদের সঙ্গে ভাব করতে চাই...'

আমরা হলেও এর চেয়ে বেশি কি বলতাম? বক্তৃতার পরে আবার এক আবদার—গান শুনব তোমাদের। তাতে ডরায় বুঝি! সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি তানসেন আঁ-আঁ করে তান ধরল। গান হয়ে গেল তো—এবারে কি? নাচ। মস্ত বড় এক ঘরে নিয়ে দাঁড় করাল। ঘুরে ঘুরে নাচছে বাচ্চারা। আনন্দের মেলা। নাচছে, লাফালাফি করছে। এক ধারে দাঁড়িয়ে দেখছি। সান উসখুস করছে। লোলুপ চোখে একবার নাচিয়ে-দলের দিকে তাকায়, তার পরে একবার আমার দিকে।

তা যাও না, তুমিও নেচে এসো একটু—

এক পা করে এগোয় আর মুখ ফিরিয়ে দেখে আমাকে। হাত নেড়ে খুব স্ফূর্তি দিচ্ছি, যাও—যাও না—

লোভ কতক্ষণ আর সামলানো যায়! ঝাঁপিয়ে পড়ল দলের মধ্যে, চক্ষের পলকে বেমালুম মিশে গেল।

কিন্তু এক পাক হয়েছে কি না হয়েছে—ছুটে এসে চিলের মতন ছোঁ মেরে আবার হাত ধরে। নাচলেই হল, ইতিমধ্যে অপর কেউ দখল করে বসে যদি! আর, সত্যিই তো—কয়েকটা ছেলেমেয়ে সন্দেহজনক ভাবে আমাদের আশেপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নাচের পা কি ওঠে এ অবস্থায়? বলুন!

কষ্ট হল। আহা, সবাই স্ফূর্তি করছে—ও বেচারা পারছে না মনের ধুকপুকানির জন্য। এগিয়ে তখন নাচের একেবারে গায়ে গায়ে দাঁড়াই। এই রইলাম নজরের সামনে। মন খুলে নাচোগে—ভাবনা নেই।

তবু জমে না। নিয়ে চলল এবার মাছ আর শেওলা-ঝাঁঝি দেখাবার তরে। কাচের বাক্সে সারি সারি রেখে দিয়েছে। বলে, একটা একটা করে সমস্ত দেখবে। সবগুলোই। (দোভাষি শুনিয়ে দিল হুকুমটা) বাস রে, রাত্রে যে চলে যাবো, সময় কোথা অত ? তা কে জানে—দেখতেই হবে। না দেখে ছুটি নেই।

ঘোর হয়ে এলো। এবারে ইতি। একটুকু মন্তব্য দিতে হবে যে কি রকম দেখলে। সেটা হয়ে গেল তো অটোগ্রাফ। গাড়ি ঘিরে ফেলেছে। এক এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দেয়—নাম লেখো, আমরা খাতায় সেঁটে রাখব। সাদা কাগজে সই করিয়ে নিচ্ছ, হ্যান্ডনোট লিখে নেবে না তো বাপু ঐ নাম-সইর উপরে ? যে, চাহিবা মাত্র দিবার অঙ্গীকারে আমি শ্রীঅমুকচন্দ্র অত্র তারিখে শ্রীমতী সান ফুন-লিন দেব্যার নিকট হইতে চলিত সিক্কার এক কোটি ইয়ুয়ান ধার করিয়া লইলাম—

পাঁচ-দশটায় সই হতে না হতে গাড়ি ভিড় কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাত বারোটায় রওনা, সমস্ত নয়-ছয় হয়ে আছে. কখন যে কি হবে—চলুন. চলুন!

(৪৫)

আই-চুন হোটেলের করিডরে সকলের মালপত্র এসে জমেছে। সর্বনাশ! চীনের সীমানা অবধি এরা না হয় বয়ে দিল—তারপরে ? প্লেনে পুরে এই পর্বত দেশে নিয়ে তুলতে হবে তো!

ভোজে ডাকছে। না, আজকে আর যাবো না। কিচলু এসে তাঁর ভার-বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছেন—আমি আর কে এখন ? এ কয় দিন দায়ে পড়ে ধকল সয়েছি, নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচি রে বাবা! সামান্য কিছু খাবার ঘরে পাঠিয়ে দাও, বসে বসে আমি লিখব। চীনের মাটির উপর শেষ কলম ধরা।

লিখছি। একার জন্য একটি ঘর—কতক্ষণ ধরে লিখে চললাম, হুঁশ নেই। ক্ষিতীশের ঘর পার্লনদীর ঠিক উপরে; ক্লান্ত হয়ে এক সময় তার জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নদী দেখছি। কাশ্মীরে গিয়ে হাউস-বোটে ছিলাম. এ নদীতে বিস্তর তেমনি বোট। কিনারায় বেঁধে বেঁধে রয়েছে। বোট স্পষ্ট নজরে আসে না, বোটের উপরের মিটমিটে লণ্ঠনগুলো শুধু। সন্ধ্যার মুখে চাঁদ

দেখেছিলাম, সে চাঁদ কোন বড়-বাড়ির আড়ালে চলে গেছে। মাঝে মাঝে স্টিমারের বাঁশি—সার্চলাইটে সাদা হয়ে যাচ্ছে মাঝনদীর জলতরঙ্গ। নৌকোও চলাচল করছে—নৌকো নয়, ভাসমান আলোর কণিকা। আট তলার ঘর থেকে দেখছি, রহস্যাচ্ছন্ন অন্ধকারে জলের উপর দিয়ে অগণিত তারা ভেসে চলেছে।

ঘরে ফিরে আবার ডায়েরি খুলে বসেছি, দরজায় ঘা পড়ল।

এসো, এসো ভাই—

ইয়ং—পিকিন দোভাষিদলের সর্দার আমাদের সেই ইয়ং। ডক্টর কিচলুর সঙ্গে ভোরবেলা ট্রেনে এসে পেঁছেছে। আবার তাকে দেখব, ভাবতে পারি নি। কী ভাল যে লাগল পুরানো মানুষ কাছে পেয়ে!

ইয়ং বলে, কিছুই তো খেলেন না! তা শুয়ে পড়ুন এবারে, কত আর লিখবেন?

বারোটায় রওনা—তাই ভাবছিলাম, লিখেই কাটিয়ে দিই সময়টুকু। খাতা-কলম পকেটে পুরে গাড়িতে উঠব।

ইয়ং জেদ ধরল, না—গাড়িতে ঘুম হয় কি না হয়—ঘুমিয়ে নিন এই ঘণ্টা দুই। আমরা জেগে রয়েছি, ঠিক সময়ে তুলে নিয়ে যাবো।

আলো নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ইয়ং চলে গেল। এবং রাতদুপুরে ডেকে তুলে মোটরে চাপাল। শহরের ঘরবাড়ি তখন দুয়োর-জানলা এঁটে ঘুমুচ্ছে। রাস্তার আলোগুলো শুধু অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এমনি নিশিরাত্রে আর একদিন চৌরঙ্গি থেকে দমদম-এরোড্রোমের দিকে ছুটেছিলাম,—কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি তখন।

বড় বড় বাড়ির ছায়ায় রহস্যময় জনশূন্য এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে ঘুরে স্টেশনে এলাম। আরে মশায়, শহরের রাস্তায় লোক থাকবে কি—সবাই তো দেখছি স্টেশনে! সাধারণ গাড়ি এখন নেই, আমাদের স্পেশ্যাল ট্রেনটা শুধু। শীতার্ত রাত্রে এত মানুষ বিদায় দিতে এসেছে। একদিন এই স্টেশন থেকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, বিদায়-দিনেও ঠিক তেমনি সুবিপুল জনতা।

ঝকমকে স্পেশ্যাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়িতে পৌনে একটা। সেই অগণ্য মানুষের হাতে হাত দিয়ে আমরা কামরায় উঠে পড়লাম। প্রতি খোপে দু'জনের জায়গা। ব্যবস্থায় তিল পরিমাণ খুঁত নেই। ছেলেমেয়েরা কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে—উই একেবারে ইঞ্জিন অবধি। বেশির ভাগ মেয়ে—

সব কাজে মেয়েরাই বেশি আগুয়ান। প্রথম ঘণ্টা পড়ল, আর চক্ষের পলকে প্রতিটি প্রাণী গাড়ি থেকে হাত দেড়েক দূরে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে হাত বাড়াচ্ছে, শেষবারের ছোঁওয়া ছুঁয়ে নেবে। ট্রেন ছাড়বার মুখে ভিড়ের দরুন দুর্ঘটনা না ঘটে—সেজন্য এই ব্যবস্থা।

ঠিক একটায় গাড়ি ছাড়ল। শত শত কণ্ঠে স্টেশন মন্দ্রিত হচ্ছে—হিন্দী-চীনী ভাই ভাই! আর—হোপিন ওয়ানশোয়ে, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক! এত ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে গাড়িও যেন এগুতে পারে না—যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে। কামরার আলো এক একবার আনন্দে-ঢলঢল মুখের উপর ঝিলিক হেনে হেনে যাচ্ছে। সে মুখ বলছে—শান্তি...শান্তি...শান্তি—নিখিল ধরিত্রী শান্তিময় হোক!

প্লাটফরম শেষ হল, শেষ হয়ে গেল চকিত-দেখা মুখের পর মুখ। অন্ধকার। জানলায় বসে আছি বাইরে চেয়ে। ফুল দিয়ে গেছে—সবুজ আলোয় কামরা-ভরা সুগন্ধ। মাঠ নদী পাহাড় আবছা-আবছা নজরে আসছে। দেখে দেখে দেখে—তার পরে এক সময় শুয়ে পড়লাম। ঘরমুখো ছুটছি, কিন্তু ঘরে ফেরার আনন্দ কই?

শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম। তোলপাড় করে তীরগতিতে ট্রেন ছুটেছে। সুবিস্তীর্ণ এক জলাভূমির কিনারা ঘেঁসে ছুটছি। করিডরে বেরিয়ে এসে দেখি উল্টো দিকটায় পাহাড়। ঝরণার জলধারা তারার আলোয় চিকচিক করছে। জানলা ধরে এক তরুণ ছেলে দাঁড়িয়ে। আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম, ইসারা করে সে অন্য দিকে যেতে বলল। নিজে এলো পিছু পিছু—বাথরুমের দরজা এসে খুলে দিল। দেখছি, একা সে নয়—দোভাষি ছেলে-মেয়ে অনেকেই পাহারা দিচ্ছে দশ-বিশ হাত অন্তর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ক্যান্টন থেকে এই এলাকাটা ভাল নয়, চিয়াং-এর চরের আনাগোনা আছে বলে সন্দেহ। ট্রেনের কামরায় কামরায় বিদেশি মানুষগুলো বিভোর হয়ে ঘুম দিচ্ছে, ওদের চোখে সারা রাত্রির মধ্যে পলক পড়ল না।

সেন-চুনে এসে গাড়ি থেমে দাঁড়াল। তখনো চোখ বুঁজে পড়ে আছি। ক্ষিতীশ ডাকল, উঠে আসুন। চা খেয়ে চাঙ্গা হওয়া যাক। ডাইনিং-কারে চা সাজিয়ে বসে আছে।

কামরা থেকে নেমে পড়লাম। মুখ-আঁধারি তখনো। শীতও খুব—ওভারকোট ইত্যাদি গায়ে চড়িয়েও কাঁপুনি যায় না। কতটুকু সময়ই বা আর নতুন-চীনের মাটিতে! ডাইনিং-কারে গিয়ে বসেছি। আহা, ছেলে-মেয়েগুলো রাত জেগেছে—প্রভাত-কুসুমের মতো স্নিগ্ধ মুখে এখন আবার হাতে হাতে চা এগিয়ে দিচ্ছে। কালো পাজামা সাদা সার্ট ও কালো কোর্তায় কি অপরূপ দেখাচ্ছে! এমন আতিথ্য এত সহৃদয়তা কোথায় পাবো দুনিয়ার ভিতর!

ভোরের আলো ফুটছে ক্রমশ, ঝোপে-ঝাড়ে পাখি ডাকছে। দূর পাহাড়ের উপর ছবির মতো ঘরবাড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সীমান্ত পাহারাদার আর রেল-কর্মীরা থাকে ঐ সব বাড়িতে। এক দল জাতীয় সৈন্য নেমে এলো উপর-পাহাড় থেকে। স্টেশনে বইয়ের টেবিলগুলো খালি; বই আলমারিতে বন্ধ। কাল যাত্রীদের পড়াশুনো হয়ে যাবার পর যত্ন করে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে; পড়বার লোক এত সকালে এখনো এসে জমেনি।

ক্রমে জেগে উঠল চারি দিক। বেরুবার ভিসা দিতে বড় দেরি করছে—সেটা হল ওপারে বৃটিশ-এলাকার ব্যাপার। তা হোক, আমাদের তাড়া নেই। ভালই তো করছে—সীমান্ত-স্টেশনে আরও খানিকটা ওদের সঙ্গে জমিয়ে বসার সময় পাওয়া গেল। আর ক'গজই বা নতুন-চীন—খাল দেখা যাচ্ছে, পুরো খালটাও নয়, খালের মাঝ বরাবর গিয়েই শেষ।

অবশেষে ভিসা এসে গেল। চলি ভাই। পুলের উপরে উঠেছি। ছোট-খাট এক মিছিল—আমরা যাচ্ছি, ওরা আসে পিছনে-পিছনে। পা আর চলে না, চোখ ছল-ছল করছে সকলের। ঘরে চলেছি, না ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি—গতিক দেখে কেউ বুঝবেন না। কুমুদিনী মেহতা আমার পাশে; ধরা-গলায় তিনি বললেন, প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার দিনে ঠিক এমনি অবস্থা হয়—কি বলো বোস? ভুলে গেছেন, তাঁর মতন স্ত্রী-জাতীয় নই আমি। পুরুষরা শ্বশুরবাড়ি যায় ড্যাং-ড্যাং করে—চোখ মুছবে তারা কোন্ দুঃখে? এই সব বলে আবহাওয়া একটু হালকা করতে চাই। কিন্তু জমে না, হাসল না কেউ। কাঁটা-তারের বেড়ার মুখে এসে গিয়েছি। কাস্টমসের লোকগুলো অভিবাদন করে পথ ছেড়ে দিল; বোঁচকা-বুঁচকিতে হাতটাও ছোঁয়ায় না। আরে বাপু, তামাম মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোমার দেশ থেকে—দেখ হে, নয়ন তুলে চেয়ে দেখ একবার! নয়ন তুলল বটে বলাবলির পর—হাসিমুখে আর একবার নমস্কার করল।

পুলের আধখানা অবধি এদের যাওয়ার এক্তিয়ার। সেই অবধি এসে দাঁড়িয়েছি। মেয়েরা হাত জড়িয়ে ধরছে এক এক করে। ছেলেরা বুকের মধ্যে লুফে নিচ্ছে। ছেড়ে দেবে না, কিছুতে ছাড়বে না। এই একবার হয়ে গেল তো আবার। গান ধরল ক্ষিতীশ। সকলের মুখে গান। বন্ধু, তোমাদের ছেড়ে যেতে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে—ঘুরে-ফিরে এই এক গানের কথা। গান আর কোথায়—তানকর্তব গিয়ে এখন তো কান্নায় দাঁড়িয়েছে। পরশু রাতের সেই যে বক্তৃতা—এসেছিলাম বিদেশি হয়ে, চলে যাবার মুখে অশ্রুতে কণ্ঠরোধ হচ্ছে—আর সেটা সাহিত্যিকের অতিশয়োক্তি রইল না। তাকিয়ে দেখুন, চোখে-চোখে জল। এই নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাসা করব—তবে তো নিজের চোখ দুটোও শুকনো রাখতে হয়। সেটা বড় মুশকিল।

পুল পার হয়ে ভিন্ন পারের মাটি ছুঁয়েছি। আর ওদের আসবার জো নেই। দূরত্ব নগণ্য, কিন্তু ব্যবধান অতি-দুস্তর। এখানে আর এক জগৎ। গান চলছে দু-দিক দিয়ে অবিশ্রান্ত। হাত ছেড়ে দিয়ে এসেছি—গানে আমাদের এক করে রেখেছে। হাওয়ায় ভেসে গানের সুর এপার-ওপার করছে—তাতে পাশপোর্ট-ভিসা লাগে না। আরও এগিয়ে গেলাম। চেহারাগুলো অদৃশ্য—শুধু ঐ গান। গানও শেষে বন্ধ হয়ে গেল।

লাউ-হু স্টেশনের প্লাটফরমে এসেছি। ওদিককার কিছুই আর নজরে আসে না। হঠাৎ দেখা যায়, ঢিবি মতন একটা জায়গায় ওরা উঠে পড়েছে—রুমাল নাড়ছে সেখান থেকে। আমাদের ক'জন স্টেশনের ঘরে গিয়ে বসেছিলেন, খবর পেয়ে হুড়মুড় করে বেরুলেন। দু-দিক দিয়ে উড়ছে রুমাল। উড়ন্ত শান্তির পারাবত পাখা নাড়ছে এপারে-ওপারে। প্রশান্ত হিমপ্রভাতে, দেখ দেখ, কত পাখির নিঃশব্দ কাকলী!

ওয়েটিংরুমে ঢুকেই, কী সর্বনাশ, বিদ্যুতের শক খেলাম যেন। এক তরুণী কোথায় যাবে, গাড়ির অপেক্ষা করছে। পোশাক-আশাক নিরতিশয় স্বল্প। অন্যমনস্ক মানুষের তবু যদি নজর এড়িয়ে যায়, সেই কয় টুকরো কাপড়ে রামধনুর মতো রঙের বাহার। ছাত্রেরা পাঠ্য-বইয়ের দরকারি জায়গায় জায়গায় লাল-নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে রাখে, মেয়েটার উপরেও তেমনি যেন রঙিন ঢেরা কাটা। একটা ইংরেজি বইয়ের নাম মনে এলো হঠাৎ—ম্যান-ইটার অব কুমায়ুন,

কুমায়ুনের মানুষখেগো বাঘ। কিন্তু কোথায় কুমায়ুন পর্বত আর কোথায় বা—উঁহু, ডোরাকাটা বাঘের সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল আছে। এ-ও এক চীনা মেয়ে—কিন্তু এতদিন ধরে চীন ঘুরলাম, একটা মেয়েরও এমন বেশরম বদরুচি পোশাক দেখতে পাইনি।

ওয়েটিংরুমে হল না তো প্লাটফরমের শেষ দিকে গাছতলার এক বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। সিগারেট ধরিয়েছি। কালেভদ্রে কদাচিৎ ধোঁয়া খাই। দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট আপনি পুড়ছে। উদাস দৃষ্টি মেলে বসে আছি। আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতে মালুম হল, পুড়তে পুড়তে গোড়ায় এসে ঠেকেছে। পোড়া-সিগারেটের টুকরো নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। তাই তো, কোথায় ফেলি? কোথায়, কোথায়? ফেলবার জায়গা পাইনে তো—

সহযাত্রীর নজরে পড়েছে। বললেন, হংকঙের এলাকা—যেখানে খুশি ফেলে দাও। বিলকুল ডাস্টবিন—

যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠি। নতুন-চীন পার হয়ে এসেছি—অবাধ-স্বাধীনতা! পোড়া-সিগারেট প্লাটফরমের উপর ফেলে জুতোর তলায় পিষে দিলাম।

শেষ

মনোজ বসুর বই

উপন্যাস

এক বিহঙ্গী—২য় সং। 'ঘরোয়া পরিবেশে সহজ স্বাভাবিক জীবনের প্রকাশ "এক বিহঙ্গী।" লেখকের লিরিক-ধর্মী মন অতি-পরিচিত পরিবেশে এক বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। যে জগতের সন্ধান পাইবার জন্য বর্তমানকালের অসংখ্য তরুণ-তরুণী ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে। সংলাপের মিষ্টতা ও ভাষার আশ্চর্য সংযম পাঠককে অতি দ্রুত সম্মুখ পানে টানিয়া লইয়া যায়।'—যুগান্তর। দাম চার টাকা।

সৈনিক—৬ষ্ঠ সং। 'বলিষ্ঠ আশাবাদ, নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম গভীর অনুরাগ 'সৈনিক' উপন্যাসখানিকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে অনন্য-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।'—যুগান্তর। দাম সাড়ে তিন টাকা।

ওগো বধূ সুন্দরী—৩য় সং। স্নিগ্ধ-মধুর প্রেমের উপন্যাস। আগাগোড়া দুই রঙে ছাপা। বিচিত্র প্রচ্ছদপট। উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিসম্মত বই। দাম দুই টাকা বারো আনা।

বকুল—৩য় সং। 'কুশলী কলমের গুণে ছোট-বড় প্রত্যেকটি চরিত্র মনে স্থায়ী ছায়া রেখে যায়। মিষ্টিমধুর উপন্যাস রচনায় মনোজ বসু খ্যাতিমান। শুধু খ্যাতিমান নয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বীও। "বকুল" তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।'—সত্যযুগ। দাম দুই টাকা।

নবীন যাত্রা—৩য় সং। 'লক্ষ্মণ-যাত্রার স্বল্প পরিসরকে নবীন যাত্রার আদিগন্ত পরিসরে রূপান্তরিত করা—এ শুধু মনোজ বসুর লেখনীতেই সম্ভব।'—দেশ। দাম তিন টাকা।

ভুলি নাই—২৫শ সং। পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। পাইকা অক্ষরে বিচিত্র সজ্জায় রজত-জয়ন্তী সংস্করণ বেরুল। দাম দুই টাকা।

বাঁশের কেল্লা—৪র্থ সং।—'The novel unfolds the epic-story of India's struggle for freedom which during the hundred and fifty years of British rule shook out of their peaceful slumber the quiet little villages all over the country..The author of BHULINAI has added one more feather to his cap'—Hindusthan Standard. দাম দুই টাকা বারো আনা।

আগস্ট, ১৯৪২—৩য় সং। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় সুবৃহৎ উপন্যাস। **'In this volume Manoj Basu has told a few of the human stories which the flame, smoke and blood had engulfed at the time, and which he has knit together in an integrated whole.'—Hindusthan Standard, দাম চার টাকা।**

জলজঙ্গল—২য় সং। 'বাদা অঞ্চলের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপূর্ব জীবন-যাপন পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া উপন্যাসের গল্পাংশ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাদাবনের অধিবাসী-সুলভ প্রেম ও প্রতিহিংসা, দয়া ও দৌরাত্ম্য, উপকার ও উপদ্রব-প্রবণ বিপরীত-মুখী ঘটনাসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে কাহিনী এমন জমিয়া উঠিয়াছে যে বিস্ময় ও ব্যাকুলতার আবেগে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শেষ অবধি পড়িয়া যাইতে হয়। সমাপ্তিতে পৌঁছাইবার পূর্বে মধ্যপথে কোথাও থামিয়া দাঁড়াইবার ছেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।'—আনন্দবাজার। দাম চার টাকা।

শত্রুপক্ষের মেয়ে—৪র্থ সং। 'Sj Monoj Bose has a striking manner of reproducing atmosphere—of bringing to the readers' mind the vast alluvial streches, the mighty rivers in spate, fearless spirits in the passion for fight and the ways of human heart that beat the same through different ages and times'—Amrita Bazar. দাম সাড়ে তিন টাকা।

যুগান্তর—২য় সং। 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসের কিশোর-সংস্করণ। রসসমৃদ্ধ অপরূপ পরিবেশ। ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেবার সর্বাংশে উপযোগী। দাম দুই টাকা।

সবুজ চিঠি (প্রকাশিতব্য)

গল্প

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প—৩য় সং। একখানা বইয়ের ভিতর দিয়েই মনোজ বসুর সৃষ্টির সমগ্র রূপটি প্রস্ফুটনের চেষ্টা হয়েছে। দাম পাঁচ টাকা।

দিল্লি অনেক দূর—'স্বাধীনতার জন্য একদা যে দিল্লি চলো—ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছিল ভারতের পূর্ব দেশ হইতে দেশপ্রেমিক ফৌজের নেতার মুখে, সে ধ্বনি আজ থামিয়া গিয়াছে বটে—কিন্তু দিল্লি এখনো দূরেই আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গল্পগুলির উপর এক নূতন আলোকপাত হইয়াছে। কিন্তু মনোজবাবু দুর্দান্ত আশাবাদী লেখক, তাই তাঁহার গল্পগুলি শেষ পর্যন্ত মনে সকল নৈরাশ্যের মধ্যেও একটা জীবনের ধ্বনি বাজাইয়া তোলে, মন আনন্দে ভরিয়া যায়।'—যুগান্তর। দাম দুই টাকা।

দুঃখ-নিশার শেষে—৩য় সং। 'বর্তমান গল্পসংগ্রহে মনোজ বসুর আধুনিক দৃষ্টির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল'—শনিবারের চিঠি। দাম দুই টাকা।

উলু—২য় সং। 'অভিভূত-করা ট্রাজেডি গল্প।...মনোজ বাবুর গল্পের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের কাছে বইখানি অবশ্যই অভ্যর্থনা পাইবে'—যুগান্তর। দাম দুই টাকা চারি আনা।

একদা নিশীথ কালে—শোভন সচিত্র ৪র্থ সংস্করণ। 'হালকা লেখাতেও মনোজ বসুর ক্ষমতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইবেন।'—শনিবারের চিঠি। দাম দুই টাকা।

কাচের আকাশ—'পড়তে পড়তে মনে হয় কে যেন সামনে বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, বড় মিষ্টি। লিখতে অনেকে পারেন, কিন্তু মনোজবাবুর মত এমন সহজে মনকে ছোঁবার ক্ষমতা বোধ হয় কম লেখকেরই আছে'—দেশ। দাম দুই টাকা।

দেবী কিশোরী—২য় সং। বনমর্মর যুগের অবিস্মরণীয় বই। নানা গোলযোগে এই বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ দশ বৎসরাধিক কাল ছাপা সম্ভব হয় নি। দাম দুই টাকা।

পৃথিবী কাদের? ৩য় সং। 'It is a departure in the fiction-literature of the province'—Amrita Bazar. দাম দেড় টাকা।

নরবাধ ৪র্থ সং। 'বাংলা সাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহা বলিয়া রাখিতে চাই যে এ গ্রন্থের ঐ দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আর যাহাই লিখুন বা না লিখুন, কেবল ঐ দুইটির জন্য (আরেকটির নাম 'নরবাঁধ') বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের চত্বরে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আসন অতি অল্প কয়েকজনই দাবী করিতে পারেন'—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, বঙ্গদর্শন। দাম দুই টাকা।

বনমর্মর—৪র্থ সং। 'যে retrospect, চিন্তার গভীরতা এবং মনের বেদনা-বোধ থাকিলে লেখা চিরন্তনের পর্যায়ে গিয়া পেঁছায়, তাহা মনোজ বসুর আছে'—পরিচয়। দাম আড়াই টাকা।

খদ্যোত—২য় সং। 'ছোট গল্প বলিতে যাহা বোঝায়, এগুলি ঠিক তাহাই। ছোট এবং গল্প দুই-ই। প্লটের চমৎকার বিস্ময়। রস ঘনীভূত। দীপ্তি হীরকের, খদ্যোতের মিটিমিটি নহে।'—যুগান্তর। দাম দুই টাকা

কুঙ্কুম—খদ্যোতের মতো অতি-ছোট গল্পের সংকলন। দাম দুই টাকা।

কিংশুক—খদ্যোত ও কুঙ্কুমের মতো অতি-ছোট গল্পের সংকলন। দাম দুই টাকা।

নাটক

নূতন প্রভাত—৫ম সং। 'এই প্রকার সমস্যা লইয়া ও এই ভাবের সত্যদিদৃক্ষা ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাংলায় পড়ি নাই'—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দাম দুই টাকা।

রাখিবন্ধন—'বিদেশী শাসকের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার জাতীয় প্রতিরোধের কণ্ঠরুদ্ধ করিবার জন্য দেশীয় তাঁবেদারদের সহায়তায় শাসকগোষ্ঠির বর্বর অত্যাচার এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিঃশব্দ দুঃখবরণ ও মর্মচেরা আত্মদানের কাহিনীকে মূলত উপজীব্য করিয়া এই নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে।'—যুগান্তর। দাম দেড় টাকা।

প্লাবন ৪র্থ সং। 'নাটকের সংবেদনশীলতা ও লিপিচাতুর্য রসপিপাসুদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে'—যুগান্তর। দাম দেড় টাকা।

বিপর্যয়—'কোন নাটকের প্রথম পর্যায়ে উন্নীত হইবার জন্য যে গুণ থাকা দরকার, আলোচ্য নাটকে তাহার সব কিছুই আছে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গতি হইয়াছে দ্রুততর, ডায়ালোগ জোরালো ও স্বচ্ছন্দ-গতি। বিষয়বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে'—আনন্দবাজার। দাম দুই টাকা।

শেষলগ্ন (প্রকাশিতব্য)

ভ্রমণ-কথা

চীন দেখে এলাম (১ম পর্ব) সম্পর্কে—

Amrita Bazar Patrika—Sri Monoj Basu is almost a household name in Bengali and his position both as a story-writer and a novelist is in the front rank. . . . Being a story-teller himself, Sri Basu has unfolded the story of New China in a brilliant manner, as a result of which this delightful travel-book reads almost like a novel. . . . The main trend of his approach is humane as well as national. He has written what he has seen, and has given complete pen-picture of whatever appeared striking to him. The lucidity and richness of his language take the reader for a moment to that ancient land of culture and glory. The travel-talk has reached the perfection of beautiful belles-letters . . . "Chin Dekhey Elam" is a truthful representation of New China blended with humour and gossip. Undoubtedly, this book will remove misconception and misgivings on New China and shall further strengthen the cultural bond between the two great nations. With this book Sri Basu has proved that he is quite an adept in skillfully presenting abstract subjects in plain and simple manner. . .

চীন দেখে এলাম (১ম পর্ব)—দাম তিনটাকা।

চীন দেখে এলাম (২য় পর্ব)—দাম তিন টাকা আট আনা।